প্রথম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক

মনোরঞ্জন মজুমদার

আনন্দধারা প্রকাশন

৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলিকাতা—১২

মুদ্রক

ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস

১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট

কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কণ

অর্ধেন্দু দত্ত

প্রচ্ছদপট : স্কুলের ছেলেমেয়েরা ডন ব্রাডম্যানকে অটোগ্রাফের জন্য ঘিরে ধরেছে

আনন্দবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক
ও ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি
শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার
মহাশয়ের করকমলে

বেরী সর্বাধিকারী—ক্রিকেট জগতে একটি অতি পরিচিত নাম। তাঁর লেখা আমার দেখা ক্রিকেট, শুধু তরুণদের জন্যই নয়, সর্ববয়সের সকলের জন্যই। শ্রীসর্বাধিকারীর বহু অভিজ্ঞতায় ভাস্বর এই বই, বাংলা ভাষায় সম্ভবত ক্রিকেটের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক।

প্রকাশক

সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ক্রিকেট খেলা ফুটবল, টেনিস ইত্যাদির কাছেও ঘেঁসতে পারে না। তবু ওয়াকিবহাল মহলের মতে "রাজার খেলা" না হলেও ক্রিকেট "খেলার রাজা"। "রাজার খেলা" বলতে একটা কথা মনে পড়ে। বহুদিন আগে আমাদেরই এই বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট মাঠ ইডেন গার্ডেনস-এ আর্থার গিলিগ্যানের অধিনায়কত্বে এম সি সি-র খেলা দেখতে গেছি। লাঞ্চ বা মধ্যাহ্ন ভোজন হল, তার পর আবার টী বা চা-পর্ব। পাশের এক ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন: "যে সে খেলা নয় তো, এ রাজার খেলা, বিলেতে লর্ডস-রা মাত্র খেলতে পায়, এ দেশে রাজা-মহারাজা। তা একটু চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় হবে বই কি?"

তখন ভারতীয় ক্রিকেটে পাতিয়ালা, নবনগর, কাশ্মীর, কোচবিহার, নাটোরের রাজা-মহারাজার অবদান প্রচুর। আর শ্বেতাঙ্গ হলেই তো লর্ড বা লাট-বেলাট! ভদ্রলোকের কথা অনেকেই হজম করলেন। কিন্তু তখনই আমি দাঁড়িয়ে গেছি ক্রিকেটের "পোকা", বিশ্ববিখ্যাত লর্ডস মাঠ যে একজন সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহী টমাস লর্ডস-এর নামে নামকরণ সেকথা বোঝাবে কে? লর্ডস মাঠ যে কোনও নীলরক্ত খাস লর্ড-এর নামানুকরণে এ-কথা আজও অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে-কথা আপাতত থাক।

রাজার খেলা না হলেও, ক্রিকেট খেলায় একটা আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সভ্য-ভব্য পোষাক-পরিচ্ছদ, একটা যেন বেশ আমিরি হাল-চাল। লাঞ্চ-টী ব্যতিরেকেও ঘন-ঘন তৃষ্ণার বারি, সময় যেন অফুরন্ত আদবকায়দার ছড়াছড়ি—সবকিছুই যেন "নবাবী" আমলের, আপাতদৃষ্টিতে ঢিমে-তেতালে।

এ কারণেই, বোধ হয়, ক্রিকেট খেলা আজও সীমাবদ্ধ মাত্র কয়েকটি দেশে, একাধিক কারণে যে-সব দেশ ক্রিকেট খেলার "জননী" ইংলণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল বা আজও রয়েছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ক্রিকেট খেলাকে বাতিল করা ন্যায় বা অন্যায় সে বিতর্কে নামবার কোনও প্রয়োজন নেই। মাত্র একটি কথা বলব। দেশের বা বিদেশের ক্ল্যাসিক্যাল বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত তেমন জনপ্রিয়

নয় বলেই ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অমূল্য সম্পদ, রূপ-রস-গুণ মিথ্যা হয়ে যায় না—অনাদর বা অল্পাদরের যথার্থ কারণ সমঝদারের "শিক্ষার" অভাব, যে-শিক্ষার জন্যও একান্ত আবশ্যক অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিমত্তা এবং অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্য্য, এক কথায় "সাধনা" যা ব্যতিরেকে সত্যকারের রসগ্রহণ অসম্ভব। কথাগুলি ক্রিকেটেও প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে পুস্তকের প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক না হতে পারে, ভিতরে কিন্তু অপূর্ব রত্নসম্ভার, মাত্র "সিংহদ্বারে" প্রবেশ-সাপেক্ষ!

কথাটা অল্পবিস্তর সব খেলাতেই খাটে। খেলা মাত্রেই—যাকে বলা হয় "বল-গেম"—প্রয়োজন স্বাস্থ্য, শারীরিক ও মানসিক তৎপরতা, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, আর আজকের জগতে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও অনুশীলন। সব খেলাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসে থাকেন, খেলার মাধুর্য খেলার অনিশ্চয়তায় যা সৃষ্টি করে উত্তেজনা, উদ্দীপনা। তবু ক্রিকেটের রোম্যান্স বা রমন্যাস, নাটকীয় মুহূর্তগুলির পিছনে আছে ক্রিকেট খেলার "গ্লোরিয়াস আনসার্টেন্টি", বাঙ্গলা অনুবাদে "গৌরবময় অনিশ্চয়তা"-য় যার সঠিক অর্থ বোধগম্য হয় না। স্বনামধন্য স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের কথায় বলি: "টেনিস খেলায় পরের পর মার ফস্কে গেলেও সামলে নেবার বহু সুযোগ থাকে খেলোয়াড়ের, গলফ্ খেলাতেও তাই, কিন্তু ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানের একবার, একটিমাত্র ভুলই হয় চরম!"

এমনটি দেখেছি বহুবার। চূড়ান্ত নিদর্শন যা আজও চোখের সামনে ভাসে, তা ব্র্যাডম্যান-সংক্রান্তই। ১৯৪৮ সনে লণ্ডনের মাঠে ব্র্যাডম্যানের গৌরবময়, চাঞ্চল্যময় ঐতিহাসিক ক্রিকেট-জীবনের শেষ টেস্ট খেলা। অভাবনীয় সম্বর্ধনা পেলেন, ব্যাট হাতে ব্র্যাডম্যান আসরে নামলেন, ইংলণ্ডের লেগ-ব্রেক বোলার হলিস-এর কয়েকটি বল আটকালেন, সেই "ক্ষণিকের ভুল", একটি মাত্রও রান না করে ফিরতে হল বিশ্বক্রিকেটের বিপ্লবকারী ব্যাটসম্যান ব্র্যাডম্যানকে! "গ্লোরিয়াস আনসার্টেন্টি অব ক্রিকেট"।

এটা হল ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত, দলগত বিপর্যয়ের উদাহরণ ক্রিকেট-ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। বাঙ্গলা দেশের প্রাক্তন গবর্ণর স্বর্গত স্যর স্ট্যানলী জ্যাকসনের মুখে কথাটি শোনা। জ্যাকসন নিজে ছিলেন বিরাট ক্রিকেটার, ইংলণ্ডের ক্যাপটেন, পরে এম সি সি-র প্রেসিডেণ্ট। ১৯০২ সনে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা ওভাল মাঠে, ইংলণ্ডের অবস্থা শোচনীয়, জয়লাভের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬৩ রান দরকার। সে আশা সুদূর পরাহত. ইতিমধ্যেই

ভিজে উইকেটে, যাতে স্পিন বেশ ধরছে, মাত্র ৪৮ রানে ইংলণ্ডের পাঁচ-পাঁচটি উইকেট পড়ে গেছে।

এমন সঙ্গীন অবস্থায় মাঠে নামলেন গিলবার্ট জেসপ, "মারনেওয়ালা" ব্যাটসম্যান। "ভরাডুবি" মনে-প্রাণে জেনে মনোভাব তাঁর "এস্পার না হয় ওস্পার"। শুরুতে দু'একটি "চান্স" দিলেন, অষ্ট্রেলিয়ার ফিল্ডসম্যানরা ধরতে পারলেন না। তার পর রাণের "বান ডাকালেন" জেসপ, মোট করলেন ১০৪, তার মধ্যে ১০০ রান মাত্র একঘণ্টা পনের মিনিটে; মুমূর্ষু ইংলণ্ড দলের মুখে দেখা গেল হাসির ঝিলিক, আর মাত্র পনের রান বাকী, তার পর "কিল্লা ফতে"!

সকলের অলক্ষ্যে, বোধ করি, ভাগ্যদেবী হেসেছিলেন, তাঁর নির্মম খেলার তখনও যে অনেক দেরী। মাত্র পনের রান বাকী, এমন সময় "বীরশ্রেষ্ঠ" জেসপের পতন! শেষ জুটী, ইয়র্কশায়ারের প্রখ্যাত "ন্যাটা" বোলারদ্বয়, রোডস্ ও হার্স্ট। কী হয়, কী হয়! এক এক রান নিয়ে বহুবাঞ্ছিত পনেরটি রান হল, লণ্ডন তথা ইংলণ্ডের আকাশ-বাতাস ভরে গেল ইংলণ্ডের জয়ধ্বনিতে। সেদিন মধ্যাহ্নের ফকির হল রাজা, আর রাজা হল ফকির! চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ!

এমন নজীর বহু কিন্তু উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন নেই কারণ এই আশা-নিরাশা ক্রিকেট খেলার নিত্য সহচর। ১৯৫৮ সন, ডিসেম্বর মাস, কাণপুরের টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের চা-পর্বে মাত্র দু'উইকেটে ১৮০ রানের ওপর। ভারতের আশা তখন আকাশচুম্বী, অন্তত ৪০০ রান আটকায় কে? আটকালেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের "দৈত্য"-সম ফাস্ট বোলার ওয়েস্‌লী হল্‌ সংহারমূর্তি ধারণ করে, চা-পর্বের ঠিক পরেই। সর্বসাকুল্যে ভারতের হল মাত্র ২২২ রান!

সবিস্তারে দু'একটি উদাহরণ মাত্র দিলাম—একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে—ক্রিকেটের বিরুদ্ধে খেলা হিসাবে অভিযোগ নাকি এ-খেলায় উত্তেজনা নেই, উদ্দীপনা নেই, "এ্যাকশন" বা উদ্দাম গতির অভাব। অবশ্য "এ্যাকশন"-এ ভাঁটা পড়েছিল সম্প্রতি, এখনও পড়ে থাকে, কিন্তু সেটা সাময়িক "ব্যাধি" যার "আরোগ্যের" জন্য আজ সারা ক্রিকেট জগৎ সচেষ্ট। কিন্তু মূলত ক্রিকেট খেলা রমন্যাসের পর্যায় পড়ে, যার অভাবনীয় উত্থান-পতন, ঘন-ঘন নাটকীয় পরিস্থিতি, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না নিয়ে

এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছে এর তুলনামাত্র অন্য খেলার বিষয়ে পাওয়া যায় না।

ক্রিকেট খেলার অন্যান্য গুণের মধ্যে দাবী করা হয় খেলার মাধ্যমে চরিত্র-গঠন, খেলোয়াড়ী মনোভাবের প্রবর্তন। ভদ্রোচিত আচার-ব্যবহার, শালীনতা ক্রিকেট খেলার অঙ্গ-বিশেষ। ইংরাজী ভাষায় একটি কথা বহু প্রচলিত। যে-কথায় দাবী করা হয় ওয়াটারলুর যুদ্ধক্ষেত্রে ওয়েলিংটন নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেন সত্য, কিন্তু সে সাফল্যের পিছনে ছিল ইংলণ্ডের বিখ্যাত "পাবলিক"-স্কুল ইটন-এর খেলার মাঠ অর্থাৎ যে সৈন্যসামন্তের শৌর্য-বীর্যে ওয়েলিংটন-এর জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল সুদূর ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল ইটন-হ্যারো স্কুলের খেলার মাধ্যমে কৈশোরে "ক্যারেকটার" বা চারিত্রিক দৃঢ়তা ও "ডিসিপ্লিন" বা নিয়মানুবর্তিতার ফলে।

কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও কথাটি মূলত সত্য। ক্রিকেট খেলার বহুগুণের জন্যই খেলাটি ইংরাজদের "ন্যশনল গেম" বা জাতীয় খেলা। ইংরাজদের প্রাত্যহিক জীবনে ক্রিকেটের প্রভাব নানা ভাবে প্রকাশ পায়। এ-খেলা ঘিরে অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টির কথা আগেই বলেছি। লণ্ডনের প্রখ্যাত "টাইমস" পত্রিকার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব-সম্পন্ন সম্পাদকীয় মন্তব্যেও ক্রিকেট খেলার বিশিষ্ট "ফ্রেজ" ব্যবহার হয় প্রায়ই, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ডব্লিউ জি গ্রেসের আসন কায়েম।

মাঠে-ঘাটে-পথে, সামান্য কাফি-খানায় বা বৃটিশ পার্লামেণ্টে লঘু-গুরু বিষয়ে ক্রিকেট-সম্পর্কীয় এক-আধটি কথা বা "ফ্রেজ"-এ ইংরাজদের কাছে গুরুতর বিষয় হয় জলের মত স্বচ্ছ যা হাজার কথাতেও না হতে পারে। ক্রিকেট খেলার "সোশ্যাল" বা সামাজিক দিক সর্বজনবিদিত যেটা সম্ভব হয় খেলাটি সময় সাপেক্ষ বলে। দিনের পর দিন একসঙ্গে খেলা, খাওয়া-দাওয়া, মাঝে-মাঝে সান্ধ্য উৎসব, এ-সবই "শত্রু-মিত্র" নির্বিশেষে খেলোয়াড়ে-খেলোয়াড়ে বন্ধুত্ব স্বভাবতই গাঢ় করে। যে সুযোগ সাধারণত অন্য খেলায় বিশেষ পাওয়া যায় না। ইংরাজের জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

অভিনব খেলা ক্রিকেট, জন্ম তার ইংলণ্ডে। কখন কোথায় বা কী ভাবে এ-খেলার প্রথম প্রবর্তন হয় সে ইতিহাস এই বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। তবু ক্রিকেট-খেলার এই "রোমাণ্টিক" পরিবেশের উপলব্ধি করতে হলে গোড়ার

দু'একটি কথা সাহায্য করতে পারে। ক্রিকেটের "আদি যুগে" ১৩০০ সনে ইংলণ্ডে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে, রাজপুত্র এডওয়ার্ডের ওয়েস্টমিনিস্টারে ১০ই মার্চে নাকি ক্রিকেট খেলার জন্য পোষাক-পরিচ্ছদের বাবদে ১০০ শিলিং খরচ হয়েছিল। ১৬১৫ সনে কৈশোরে নাকি ক্রমওয়েল ক্রিকেট খেলেছিলেন, তা নিয়ে উত্তরকালে তাঁকে এ ব্যাপারে অনেক টিটকারি সহ্য করতে হয়।

১৭০০ সনে "ক্ল্যাপহ্যাম কমন" মাঠে "ইস্টার মনডে"-তে বাজী ধরে এক ক্রিকেট খেলা হয়। ক্রিকেট ম্যাচের প্রথম বর্ণনা হয় ১৭০৫ সনে লাতিন ভাষায় কবিতায়, কবি ইটন ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র উইলিয়াম গোল্ডউইন, তখন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের কিংস কলেজে। ১৭৪৪ সনে প্রথম ক্রিকেটের আইন-কানুন হয়, কিন্তু গোল্ডউইনের ১৭০৬ সনে লণ্ডনে প্রকাশিত কবিতার বর্ণনায় সেই আইনকানুনের প্রায় হুবহু মিল পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বড় বড় বাজী রেখে ক্রিকেট খেলার অনেক নজীর আছে। দলের পৃষ্ঠপোষক সাধারণত হতেন ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও ধনকুবের যেমন আর্ল-অব-উইনচিলসী, ডিউক অব ডরসেট, স্যার হোর‍্যাসম্যান। এমন সব দলের মধ্যে খেলার বাজীর পরিমাণ হত ৫০০ বা ১০০০ গিনি, আজকের বাজারে যার মূল্য দশ বা বিশ হাজার পাউণ্ড। স্যাকভিল পরিবারের কর্তা ছিলেন ডিউক অব ডরসেট। বিরাট প্রাসাদ তাঁর, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ক্রিকেট খেলার মাঠ কেণ্ট কাউন্টির সেভেনওকস্-এ ভাইন গ্রাউণ্ডের কাছে।

১৭১৯ সনে প্রথম কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচ কেণ্ট বনাম লণ্ডন; ১৭৩৭ সনে আমেরিকায় জর্জিয়া শহরে প্রথম ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠান; ১৭৫১ সন নাগাদ হ্যাম্পশায়ারে বিখ্যাত হ্যাম্বলডন ক্লাবের জন্ম; ১৭৭৫ সনে প্রথম সেঞ্চুরী যেটার গৌরব (সিনিয়র) জন স্মল-এর নামের সঙ্গে জড়িত; ১৭৮৭ সনে লণ্ডনের ডরসেট স্কোয়ারে টমাস লর্ড-এর প্রথম মাঠ, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আজকের বিশ্ববিখ্যাত 'মেরিলীবোন ক্রিকেট ক্লাবের' প্রতিষ্ঠা, পরের বছরেই এম সি সি-র প্রথম সংশোধিত ক্রিকেটের আইন প্রকাশন, ১৮১৪ সনে তৃতীয় ও শেষবারের মতো লর্ডস মাঠের সেণ্ট জনস উড-এ আজকের আড্ডায় কায়েম হয়ে বসা—এমন কত রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আশ্চর্য মনে হতে পারে কিন্তু ১৭৯২ সনে কলকাতায় ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের জন্ম, এবং সে[illegible]ছরেই প্রথম লর্ডস মাঠে এম সি সি-র প্রথম খেলা।

তেমনই বিস্ময়কর এই তথ্য দু'টি যে সর্ব প্রথম ইংরেজ ক্রিকেট দল সফরে বেরোয় অস্ট্রেলিয়াতে নয়— আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং ক্যানাডায়। এ সফর হয় ১৮৫৯ সনে, ন'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৬৮ সনে ইংলণ্ডে সফরে আসে অস্ট্রেলিয়া থেকে একদল, শ্বেতাঙ্গের দল নয়, আদিবাসীর!

তখন ক্রিকেটের 'মধ্যযুগ' বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে কিন্তু খেলার রূপের বহু পরিবর্তন হয়েছে, "আণ্ডারহ্যাণ্ড" থেকে বোলিং হয়েছে "ওভারহ্যাণ্ড", অবশ্য বহু বিতর্কের পর। খেলার সরঞ্জামে, পোষাকে আরও বহু বিষয়ে দেখা গেছে অনেক পার্থক্য। ১৮৭৩ সনে ইংলণ্ডে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রবর্তন, শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইংলণ্ড সফর ১৮৭৮ সনে, দু'বছর পরে ইংলণ্ডে প্রথম ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা।

তার দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৮৮২ সনে ইংলণ্ডের পরাজয় হল অস্ট্রেলিয়ার হাতে, সুপ্রসিদ্ধ ওভাল মাঠে। "স্পোর্টিং টাইমস" পত্রিকা রসিকতা করে বিশ্ববাসীকে "শোক সংবাদ" জানাল। যথা ইংলিশ ক্রিকেটের "মৃত্যু" হয়েছে। "শবদাহের" পর "এ্যাসেজ" বা "চিতাভস্ম" অস্ট্রেলিয়াতে পাঠান হবে। এ্যাসেজ-এর সত্যই কোনও অস্তিত্ব নেই, লোকপরম্পরায় মাত্র একটি প্রচলিত কাহিনী। ১৮৮৪-৮৫ সনে অস্ট্রেলিয়াতে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পাঁচটি টেস্ট খেলার প্রবর্তন হয়। সেদিন থেকেই বলা যেতে পারে ক্রিকেটের আধুনিক যুগের আরম্ভ।

ইংলণ্ডের ক্রিকেটে কিছু পরেই এল তাদের "স্বর্ণযুগ"। একচ্ছত্র অধিপতি ডঃ ডব্লিউ জি গ্রেস। দশাসই পুরুষ, বিরাট দাড়ি, অপূর্ব কৃতিত্ব তাঁর, যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল ক্রিকেটের ইতিহাসে। যুগান্তকারী ব্যাটসম্যান শুধু নয় "বিজ্ঞান-সম্মত" ক্রিকেট-খেলায় তিনিই যে প্রথম পথপ্রদর্শক একথা সর্ববাদিসম্মত। গ্রেসের সমসাময়িক বা কিছু পরেই ইংলণ্ডের আকাশে উদয় হয়েছিলেন রঞ্জি, শ্রুশবারী, ফ্রাই, জ্যাকসন, রিচার্ডসন, লকউড, জেসপ, ওয়ারনার, ম্যাকলারেন, উইলিয়াম গান, ফস্টার (আর ই), রোডস, সিডনী বার্ণস, হার্স্ট, হেওয়ার্ড প্রমুখ বহু রথী-মহারথী। অস্ট্রেলিয়ার তরফেও স্পফোর্থ (ডেমন), নোবল, ক্লেম হিল, ট্রাম্পার, আর্নেস্ট জোনস প্রভৃতি বিরাট ক্রিকেটার, খেলার রূপ যেন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন।

ক্রিকেট খেলার স্থূল, অমার্জিত আদিম ছাপ মুছে গেল, "সিঙ্গল উইকেট" অর্থাৎ একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের বাজী রেখে [illegible]—যা ঘিরে হত প্রচণ্ড

জুয়াখেলা—এ-সমস্ত একপ্রকার উঠেই গেল। স্কুল-কলেজ, কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটকে সমাদরে গ্রহণ করা হয়েছিল, শুধু খেলা হিসাবে নয়, সমগ্র জাতির বিশিষ্ট সম্পদ জ্ঞানে, যার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। ক্রিকেট খেলার এখন মার্জিত রূপ, কিছু বা আভিজাত্যের ছাপ যেটা সযত্নে আজও বজায় রাখা হয়েছে। ক্রিকেট খেলা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হল ইংলণ্ড তথা বৃটেনের জাতীয় ক্রীড়ার আসনে।

বিশ্বে ক্রিকেট খেলার প্রচার সীমাবদ্ধ। বৃটেনের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বা তাদের সৈন্য ও নৌবাহিনী যথা, ক্রিকেট তথা। অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা ও নিউজীল্যাণ্ডের মতো বৃটেনের উপনিবেশে এর প্রচার স্বাভাবিক। শুরুতে বৃটেনের সঙ্গে এই দেশগুলির বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না, আজও হয়তো যৎসামান্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয় সাধারণত বৃটিশ সৈন্য বা নৌবাহিনীর নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা দেখে। ভারতে কলকাতার কথা স্বতন্ত্র, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তখন রাজত্ব ; তাই সুদূর অতীতে ১৭৯২ সনে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। ক্রিকেট "সোশ্যাল" বা সামাজিক খেলা, কলকাতার সামাজিক জীবন তখন যেন এক "ক্ষুদে" লণ্ডনের প্রতিচ্ছবি।

যা হোক, কথায় বলে— বলা হত অন্তত সেযুগে—বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনও অস্তমিত হয় না। সাম্রাজ্য তখন বিস্তৃত—ক্যানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার সংলগ্ন বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপরাজি, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, মালয়, সিঙ্গাপুর, ভারত, বর্মা, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, এবং আফ্রিকার অন্যান্য কয়েকটি অংশে। সুতরাং এ-কথাও প্রচলিত হয়েছিল 'দি সান নেভার সেটস অন ক্রিকেট'— "ক্রিকেট-রাজ্য" থেকে সূর্যদেব কোন সময়েই বিদায় নেন না। কথাটা সত্য।

টেস্ট খেলার আসরে ইংলণ্ডের সঙ্গে স্থান পেয়েছিল শুরুতেই অষ্ট্রেলিয়া, তার পরে সাউথ আফ্রিকা। ১৯২৬ সনে সে-সম্মান পায় ভারত, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও নিউজীল্যাণ্ড। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্তি হয় ১৯৫২ সনে। মোট সাতটি দেশের টেস্ট খেলার অধিকার। তার মধ্যে ১৯৫১ সনে বর্ণ বৈষম্যের কারণে সাউথ আফ্রিকা টেস্ট-খেলা ছাড়তে বাধ্য হয়, কারণ ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র কমন-ওয়েলথের দেশগুলিই [illegible] হবার যোগ্য। সুতরাং আপাতত টেস্ট খেলার

অধিকার সাউথ আফ্রিকার নেই। তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের আইনকানুন বদলে নেবার চেষ্টা চলছে মাত্র।

বিংশ শতাব্দীর ক্রিকেটের রূপ আরও মার্জিত। টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার খেলায় রেষারেষি সকলেরই জানা, মাঝে মাঝে কিন্তু সাউথ আফ্রিকাও উঁকি ঝুঁকি মারে। ১৯১২ সনে ইংলণ্ডে এই তিনটি দেশ নিয়ে ট্রায়াঙ্গুলার টুর্নামেণ্টও হয়, কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট প্রতিভা অস্বীকার্য সকল সময়েই, কিন্তু হাতেকলমে তার প্রমাণ হল দ্বিতীয় যুদ্ধের পর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নবাগত পাকিস্তানের শুরুতে কৃতিত্ব প্রশংসার্হ, কিন্তু সে সাফল্য হল ক্ষণস্থায়ী। ভারতের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, সম্ভাবনা প্রচুর কিন্তু সেই অনুপাতে সাফল্য তেমন চমকপ্রদ নয়। নিউজীল্যাণ্ড যাকে বলে চলনসই, সীমাবদ্ধ ক্রিকেট জগতে কোনও দিনই তেমন দাগ কাটতে পারে নি।

বিংশ শতাব্দীর ক্রিকেটে প্রথম মনে পড়ে ইংলণ্ডের (স্যর) জ্যাক হবসের কথা। ব্যাটিং-এর শাস্ত্রে এমন "পারফেক্ট" বা নিখুঁত ব্যাটসম্যানের দর্শন আজও মেলেনি, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯) পূর্বাহ্নে হবসের আবির্ভাব। সমসাময়িক মহারথীদের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাকার্টনী, সাউথ আফ্রিকার ফকনার। এ ব্যতিরেকে সারা ক্রিকেট জগতে অবশ্য আরও কিছু বিরাট খেলোয়াড়, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৯৩০ সন পর্যন্ত, হবসের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতা কারও নেই বললে অত্যুক্তি হবে না।

যুগান্তকারীদের মধ্যে ক্রিকেটের আকাশে (পরে স্যর) ডন ব্র্যাডম্যানের উদয় ক্রিকেটের রমন্যাস নয় রোমহর্ষণের পর্যায় পড়ে। অষ্ট্রেলিয়ার একটি ছোট্ট গ্রামে তাঁর জন্ম, নাম বাওরাল। কৈশোরেই ব্যাটিং-এ বহু অদ্ভুত কীর্তি। নতুন "অসামান্য প্রতিভার" কাহিনী প্রায়ই ফলাও করে কাগজে বেরোয়। সমালোচকরা চট করে "ভিড়তে" নারাজ, বেশ ভাল করে দেখে-শুনে তবে তো মন্তব্য! এক-আধবার দেখে-শুনে একজন উপহাস করে ব্র্যাডম্যানের নামকরণ করলেন "বাওরাল বয়", অর্থাৎ গেঁয়ো ছেলে। স্বনামখ্যাত ইংলণ্ডের বোলার মরিস টেট বললেন: "ছোকরা 'ক্রস-ব্যাটে' খেলে, ইংলণ্ডের উইকেটে ও আবহাওয়ায় বলে বলে স্টাম্প ছিটকে যাবে।" কেউ বা বললেন ব্র্যাডম্যানের একটি বই দু'টি ষ্ট্রোক নেই। এ-সব জল্পনা-কল্পনা ১৯[illegible]২৯ সনে।

তার অব্যবহিত পরেই ব্র্যাডম্যান প্রথম ইংলণ্ডে আসেন, সেঞ্চুরী নয় ডবল, ট্রিপল সেঞ্চুরী। ক্রিকেট জগতে বন্যা বইল ভয়, বিস্ময় ও আনন্দের। বোলারদের হল হৃৎকম্প, অনেকের দেখা দিল অনিদ্রা-রোগ। এ কেমন 'ক্রস-ব্যাট', এ কেমন ব্যাটসম্যান যার (তথাকথিত) একটি মাত্র স্ট্রোক তবু আউট হয় না, যেন "মৃত্যুহীন", "অমর"! শুধু তাই নয়, এ কেমন ব্যাটসম্যান যে দিনের পর দিন অসংখ্য রান করেই সন্তুষ্ট নয়, সে-রানের গতিবেগ হওয়া চাই ঝড়ের বেগে, প্রখ্যাত বোলারদের নাম ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে। সে অপূর্ব ব্যাটসম্যান সেই গেঁয়ো ছেলে—"বাওরাল বয়"—অধুনা স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান!

১৯৩০ সনে ইংলণ্ডের প্রথম সফরেই ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং পড়ে অবিশ্বাস্যের পর্যায়। তিনি সত্যই মানুষ, না মানুষের বেশে রান করার একটি যন্ত্রবিশেষ? ফাঁপরে পড়লেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন। একাই যে ব্যাটসম্যান একটি দলের মোট রান করে, তাকে কোনও ভাবে শৃঙ্খলিত না করতে পারলে মান-ইজ্জত সব ভেসে যায়। ফলে ১৯৩২-৩৩ সনে এম সি সি-র অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় হল "বডিলাইন" বোলিং-এর উৎপত্তি। লেগ-স্টাম্পের ওপর সজোরে শর্টপিচ্ বল, লেগের দিকে বেশী ফিল্ডসম্যান, ব্যাটসম্যানের সামান্য ভুল হলে নয় সাংঘাতিক জখমের ভয়, আর কোনও মতে জান-প্রাণ বাঁচাতে গেলে আউট! স্বভাবতই প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয় হয়, শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সনে নতুন আইন করে মারাত্মক বডিলাইন বোলিং-এর অবসানের চেষ্টা হল। লক্ষ্য করার বস্তু, মাত্র ব্র্যাডম্যানকে কিছুটা আয়ত্তে আনার জন্যই এই বডিলাইন; পরে তার প্রতিষেধক হিসাবে ক্রিকেটের সেই নতুন আইন। এই দু'টিই ব্র্যাডম্যানের অচিন্ত্যনীয় অবিশ্বাস্য প্রতিভার স্বীকৃতি।

ব্র্যাডম্যানের সমসাময়িক বহু দেশের বহু খেলোয়াড়ই অসাধারণ। ইংলণ্ডের হ্যামণ্ড, সাটক্লিফ, লারউড, উলী, ভেরিটি, হাটন (পরে স্যর লেনার্ড হাটন) কম্পটন, ওয়াশব্রুক, এলেক বেডসার; অস্ট্রেলিয়াতে উডফুল, পন্সফোর্ড, ম্যাকেব, গ্রিমেট, ওরাইলী, ব্রাউন, বার্নস, লিণ্ডওয়াল, মিলার, বিল জনস্টন, নীল হার্ভে; নিউজীল্যাণ্ডের বার্ট সাটক্লিফ, ডনেলী। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হেডলী কনস্টানটাইন। ভারতের নাইডু, অমরসিং, অমরনাথ, নিসার, মার্চেণ্ট, মানকাদ। কিন্তু শুধু ব্র্যাডম্যানের যুগেই নয়, ক্রিকেটের ইতিহাসে স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান সকলের ঊর্ধ্বে, বোধ করি একমাত্র ডঃ ডব্লিউ জি গ্রেস ছাড়া।

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটারদের নাম করতেই মনে আসে ইংলণ্ডের মে, কাউড্রী, স্টেথাম, ট্রুম্যান, লক, লেকার; অষ্ট্রেলিয়ার ও'নীল, ডেভিডসন, বেনো, ম্যাকডোনাল্ড; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, স্টলমায়ার, রামাধীন, ভ্যালেনটাইন, হল্, গিলক্রিস্ট, সোবার্স, কানহাই; পাকিস্তানের ফজল মামুদ, হানিফ মহম্মদ, সৈয়দ আমেদ; নিউজীল্যাণ্ডের জন রীড, হ্যারি কেভ; ভারতের কনট্রাক্টর, উমরিগড়, সুভাষ গুপ্তে, আব্বাস আলি বেগ।

খেলোয়াড় ছেড়ে এখন খেলার কথায় আসা যাক। গত ত্রিশ বছরে ক্রিকেট ও ক্রিকেটের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে বহু পরিবর্তন হয়েছে। আইনের কথা বেশী টানব না; অতি-প্রাসঙ্গিক ছাড়া। ক্রিকেট খেলা বিশেষ টেস্ট—আজ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেট তৈরী, বৃষ্টিতে ভেজা উইকেটের দরুণ খেলা যাতে না বন্ধ থাকে তার জন্য উইকেট "কভার" বা আচ্ছাদনের আইন-অনুযায়ী আজকের ব্যবস্থা—এই দু'টির পিছনেই অন্তত একটি বিশেষ কারণ, পাঁচ বা ছ'দিন ব্যাপী খেলা যেন চলে, দর্শক সমাগম হয় প্রতিদিন, যাতে আয় হয় বেশী।

ঢাকঢোল বাজিয়ে আড়ম্বর করে পূজা, দক্ষিণা মোটা না হলে চলবে কেন? ভাল উইকেট বা "কভারের" প্রবর্তনের জন্য অবশ্য এইটাই একমাত্র কারণ নয়। নিষ্প্রাণ উইকেটে নিষ্প্রাণ ব্যাটিং, "ডিফেনসিভ" বা আত্মরক্ষামূলক বোলিং ড্র-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দর্শকের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, দর্শনীর অঙ্ক বেশ কমে গেছে। টেস্ট ক্রিকেট তত না হলেও অন্যান্য খেলায় এই সব কারণে যে দর্শকদের আকর্ষণ কমে গেছে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটে প্রায় হাহাকার, এম সি সি ক্রিকেট খেলা সজীব করতে বদ্ধপরিকর। নানা পরীক্ষামূলক আইন ইংলণ্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে চালু হয়েছে; ক্ষেত্র বিশেষে তার কিছুটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। যেমন, ৭৫ গজের বেশী বাউণ্ডারী হবে না, লেগ-সাইডে স্কোয়ার-লেগ আম্পায়ারের পিছনে ফিল্ডসম্যানের সংখ্যা বেঁধে দিয়ে। শেষোক্ত নির্দেশ "ডিফেনসিভ" বা আত্মরক্ষামূলক বোলিং-এর প্রতিষেধক হিসাবে।

বোলারদের যুক্তি এই যে ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটে তাদের সাফল্য-মণ্ডিত হবার আশা অল্প, সুতরাং লেগস্টাম্পে বল রেখে রান আটকানো ছাড়া তাঁদের গতি নেই; বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যান আজ বিশেষ সক্রিয় নন, তবু তাদের

পাল্টা জবাব হচ্ছে—বোলার রান-বাঁচানোর জন্যে ফিল্ড সাজিয়ে লেগ-সাইডে বল করলে, জেনেশুনে হাঁড়িকাটে গলা বাড়িয়ে দেবার কোনও অর্থ হয় না। অর্থাৎ শম্বুকগতিতে রানের জন্য তাঁরাই কেবল দায়ী নয়। সুতরাং এই "ডেডলক", অচল অবস্থা, ব্যাটসম্যানে-বোলারে; সেই অচল অবস্থা সচল করার জন্য এম-সি সি-র এই আপ্রাণ চেষ্টা।

এ ব্যাধি সংক্রামক ভাবে দেখা দিয়েছে সারা ক্রিকেট জগতে। ক্রিকেট সংজ্ঞায় "ব্যাধির" মাত্র কয়েকটি কারণ দেখিয়েছি। তাছাড়া আছে ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য স্বার্থপরতা বা দেশে-দেশে অস্বাস্থ্যকর একটা রেষারেষি, ঝুটো জাতীয় সম্মান, "প্রেস্টিজের" ওপর যার ভিত্তি। 'ঝুটো' কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি; ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ক্রিকেট খেলায় হারলেই ইংলণ্ড পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমন মনোভাব সুস্থ নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। অথচ ভারত ও পাকিস্তানের পর পর ১২টি টেস্ট খেলা ড্র, অমীমাংসিত হয়েছে। দু'দল-দু'দেশেরই যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ: "হারিব না কভু!"

ভারত এবং পাকিস্তানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছি তার কারণ ক্রিকেটের বিচিত্র ইতিহাসেও এমন বিস্ময়কর রেকর্ডের নজীর নেই—যে বিস্ময়ের সঙ্গে মিশিয়ে আছে গভীর লজ্জা। কিন্তু এ মনোভাব ভারত ও পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন না কোন সময়ে প্রায় সব দেশই এ-দোষে অল্পবিস্তর দুষ্ট; ঠগ বাছতে গেলে হবে গাঁ উজাড়। মাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়া এই অভিযোগ থেকে হয়তো কিছুটা রেহাই পেতে পারে। কিন্তু সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৯৫৩ সনে ত্রিনিদাদের রাজধানীতে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম দিন। টস্ জিতে ভারতের ব্যাটিং, শুরু থেকেই দেখলাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক স্টলমায়ার ডিফেন্সিভ ফিল্ড সাজিয়েছেন! এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলাম লণ্ডনে প্রকাশিত বহুপ্রচলিত "প্লেফেয়ার ক্রিকেট এ্যানুয়্যাল"-এ। আমার সেই মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ক্রিকেটের এই হালচালের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ১৯৫৬ সনে ইয়ান জনসনের অধিনায়কত্বে অষ্ট্রেলিয়ার খেলাতেও আক্রমণাত্মক ভাবের নিদর্শন বিশেষ দেখা যায় নি।

অধুনা স্যর লেনার্ড হাটনের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষামূলক মনোভাব তো প্রায় প্রবাদের পর্যায় পড়ে! ১৯৫১ সনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের

প্রখ্যাত ক্রিকেটার লীয়ারি কনস্টানটাইন দিল্লিতে এক ক্রিকেট সম্মেলনে ভারতের তরুণ খেলোয়াড়দের উপদেশ দেন: "তোমরা হাটনের 'ট্র্যাডিশন' অনুকরণ করবে না, ওরেলের পদানুসরণ কর।" ক্রিকেট সংজ্ঞায়, লাখ কথার এক কথা।

মাত্র দু' একটি ছোট্ট উদাহরণ দেব। ১৯৫২ সনে, ইংলণ্ড ভারতকে প্রথম তিনটি টেস্ট খেলায় বেশ ভাল ভাবে হারিয়েছে। চতুর্থ ও শেষ টেস্ট ওভাল মাঠে, ইংলণ্ডের প্রথম ব্যাটিং, আকাশে মেঘ কিন্তু উইকেট ব্যাটসম্যানের সম্পূর্ণ সহায়ে। এমতাবস্থায় মানকাদ পর পর ১৩টি "মেডেন" ওভার বল করলেন, হাটন একটিও রান করতে পারলেন না। লাঞ্চ বা মধ্যাহ্নভোজের আগে দু'ঘণ্টায় ইংলণ্ডের পঞ্চাশ রানের কিছু বেশী।

এর অর্থ আজও বোধগম্য হয়নি, যেমন হয়নি ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্যাপটেন ওয়ালটার হ্যামণ্ডের সেই বছরই হাটন-সংক্রান্ত আর একটি ব্যাপার। লর্ডসের টেস্ট যার নামকরণ হয়েছিল "মানকাদের টেস্ট"—মানকাদ যেবার একাই একশ—ব্যাটিং-এ ৭২ ও ১৮৪, তাছাড়া বোলিং-এ ৫টি উইকেট নিয়ে। মানকাদের বিস্ময়কর কৃতিত্ব সত্ত্বেও চারদিনের শেষে ইংলণ্ডের জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা, অবশ্য একটু মেরে খেললেই। খেলা কিন্তু গড়াল সামান্য ক্ষণের জন্য পঞ্চম দিনে। হ্যামণ্ড বললেন: "তোমরা কিচ্ছু না। শুনেছি তোমাদের নাকি এমন গান আছে যা গাইলেই বৃষ্টি হয়, তোমাদের মধ্যে একজনও সে গান জানলে লেন (হাটন) ঠেলা বুঝত!" তানসেনের "দীপক" রাগ-ই হ্যামণ্ডের ঠাট্টার পিছনে শ্লেষ ছিল—হাটন উপলক্ষ্য করে!

ইংলণ্ড তথাকথিত গ্রীষ্মকালেও বৃষ্টির দেশ, আকাশ ভেঙ্গে পড়লে ইংলণ্ড দল নিশ্চিত জয়লাভে বঞ্চিত হত। কিন্তু দলগত এত বড় স্বার্থের খাতিরেও সামান্য ঝুঁকি হাটন নেন নি। এই হচ্ছে "হাটন-ট্র্যাডিশন"। অধিনায়ক হিসাবে এ "ট্র্যাডিশন"-এর চরম দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের ১৯৫৩ সনে নটিংহাম টেস্টে এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায়, যেদিন হাটনের নির্দেশে ট্রেভর বেলী নির্লজ্জ তথাকথিত "লেগ-থিয়োরী" বোলিং করে—অর্থাৎ লেগ-ষ্টাম্পের দুহাত বাইরে বল দিয়ে—ইংলণ্ডকে নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাঁচান, ইংলণ্ডের সম্মান (?) বজায় রাখেন!

একাধিক কারণে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর, বিশেষ করে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে, ক্রিকেট খেলার মূলমন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে যেন যেন-তেন-প্রকারেণ

"আত্মরক্ষা"। সব কিছুই যেন নিষ্প্রাণ—ব্যাটিং, বোলিং এবং নেতৃত্ব। খেলায় "এ্যাকশন"-এর অভাবের অভিযোগ বহুক্ষেত্রে সত্য; বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক "অফিশিয়াল" সরকারী টেস্ট দেখেছি আজ পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তর, শেষের দিকে নিজেই প্রকাশ্য ভাবে নালিশ করেছি যে আজকের টেস্ট খেলার পরিবেশে খেলা দেখেই শিরদাঁড়ায় ব্যথা ধরে যায়! কারণ—আমার জরা নয়, ক্রিকেট খেলার স্বেচ্ছায় বরণ করা জড়তা।

ফলে দর্শকের জোয়ারে ভাঁটা লেগেছে। অন্তত ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় দর্শকদের আজ "ফাঁকি" দেবার সুযোগও নেই, টেলিভিশন সেটের পর্দায় খেলার হাল-চাল যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর মাঠে আসা না আসার সিদ্ধান্ত। অবশ্য যথার্থ বন্ধু, অনুরাগী ক্রিকেটের কম নয়, যাঁরা বিপদে আপদে, সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। এই বীতরাগ নতুন "জেনারেশন"-এ প্রযোজ্য, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় যেখানে উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট খেলা জল-ভাতের সামিল, ভারতের মতো অন্যান্য দেশে যা এখনও "নভেল", নতুনের পর্যায় পড়ে। নতুনের আকর্ষণ সদাই, যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে না। তাই এমন দেশে আজও টেস্টের নামেই জনতার জোয়ার নয়, তুফান।

এম সি সি ক্রিকেটের এই স্বেচ্ছাকৃত জড়তার অবসান করার জন্য বহু আইন-কানুনের অদল-বদল করেছে, আরও বহু পরিবর্তন পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে। আইনের সাহায্যে কিছুটা কাজ হয়তো হয়, আমূল পরিবর্তন কিন্তু সম্ভব নয়। প্রচণ্ড মাথাধরা, দু'একটি এ্যাস্পিরিনে যাদুর মত কাজ হয়। কিন্তু সে মাথাধরা যদি হয় ক্রনিক, হরদম লেগেই আছে, তখন রোগের মূল কারণ নির্ণয় এবং তার যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হলে ব্যাধি হবে শুধু চিরস্থায়ী নয়, সংক্রামক। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথমে সুনাম ছিল তার আক্রমণাত্মক ভাব, তার মারের বহরের জন্য। ভারতের ব্যাটসম্যানদের যাদুকরের পর্যায় ফেলেছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট সমালোচক গোষ্ঠী।

সে অর্ঘ্যদান মাত্র স্বনামধন্য রঞ্জি, দলীপ, পতৌদিকে ঘিরে নয়, মিস্ত্রী ওয়ার্ডেন, ডঃ কাঙ্গা, ভিট্‌ল, শিবরাম, নাইডু, দেওধর, জয়, কোলা, নাজীর আলি, অমরসিং (বোলার), অমরনাথ, মুস্তাক আলী, মার্চেন্ট (যুদ্ধ-পূর্ব), মানকাদকে বেষ্টন করেও নয়। এই প্রশংসা করা হয়েছিল সাধারণ, অতি-সাধারণ, নাম-না-জানা ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে যারা মারবার বল কখনও ছাড়ত না, ভাল গুড-লেন্থ বলও "ঠ্যাঙ্গাবার" চেষ্টা করত। ১৯৪৬ সনে

ভারতের দ্বিতীয় উইকেটকীপার বি বি নিম্বালকার জোর বোলারের একটি নিখুঁত বল আরও জোরে দারুণ স্কোয়ার-কাট মারলেন, ইংলিশ প্রেস বক্সে হৈ হৈ পড়ে গেল। স্বনামধন্য সি বি ফ্রাই, আজীবন রঞ্জির অন্তরঙ্গ বন্ধু, বলে উঠলেন ঃ "আমি কী আবার সেই রঞ্জিকে ব্যাট হাতে দেখছি ?"

এ অর্ঘ্য, এ প্রশংসা কোনও বিশেষ ব্যাটসম্যানকে লক্ষ্য করে নয়, ভারতীয় ব্যাটিং-এর তদানীন্তন স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতিতে। আজ, মূলত হাটন-মার্চেন্ট-হাজারের "ট্র্যাডিশন"-এ ভারতীয় ক্রিকেটের জাতও গেল পেটও ভরল না, স্বতঃস্ফূর্ত জৌলুশ এই "ট্র্যাডিশন"-এর যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হল বটে, কিন্তু "ট্র্যাডিশন"-এর পিছনে বিরাট ব্যাটসম্যানদের অসামান্য কৃতিত্ব রপ্ত করা গেল না। অসামান্য প্রতিভার কারণেই তাঁরা নিজেদের ব্যাটিং নিশ্চয়তার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। দলে এমন দু'একজন ব্যাটসম্যানের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু জাতীয় আদর্শ হিসাবে জাতির ক্রিকেট খেলার পক্ষে হানিকর।

আগেই বলেছি ক্রিকেটের এই নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা দূর করার জন্য এম সি সি বিশেষ সচেষ্ট, আইনকানুন ও যথোপযুক্ত নির্দেশের মাধ্যমে। আমার কিন্তু বরাবরই দৃঢ় বিশ্বাস এই জড়তায় অবসান করার জন্য দুটি বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার, এবং সেইটিই মূল প্রতিষেধক। ধরাছোঁয়া যায় না তাকে, ইংরাজিতে যাকে বলা হয় "এ্যাটিটুড টু দি গেম", খেলার বিষয়ে খেলোয়াড়দের মনোভাব। ক্রিকেট খেলার খেলোয়াড়কে ক্রিকেটের কারিগর বলা যেতে পারে। কারিগর শিব গড়বে না বাঁদর গড়বে সেটা কারিগরের হাতে। দুর্গাপূজার প্রতিমার মুখে ফিল্মষ্টারের আদল থাকবে, না চিরপরিচিত দুর্গতিনাশিনীর দেবী-ভাব, সেটা বেশীর ভাগ কারিগরের হাতে। কিন্তু ক্রেতা তার পছন্দসই নেবেন। সেটা পরের কথা, দর্শকের কথা। কারিগর বলেছি, কিন্তু কারিগরের নেতা, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে ক্রিকেটের রূপ। তাই আজ রিচি বেনো ও ফ্র্যাঙ্ক ওরেল বিশ্ববরেণ্য। তাঁদের আক্রমণাত্মক মনোভাবেই ক্রিকেটের আকাশে আশার আলো দেখা দিয়েছে। মুমূর্ষু ক্রিকেট-খেলা যেন নবজীবন লাভ করেছে, যে জীবনের প্রাচুর্য ছিল ইংলণ্ডের ক্রিকেটের স্বর্ণযুগে, পরে ব্র্যাডম্যানের আবির্ভাবে। খেলা ছিল যখন খেলা, জীবন-মরণ সমস্যা নয়। এই "এ্যাটিটুড টু দি গেম"-ই ক্রিকেটের সোনার কাঠি—যে কাঠির পরশে হয় প্রাণসঞ্চার।

প্রতিষেধক হিসাবে দ্বিতীয় বস্তুটি "ন্যাচরল" উইকেটের প্রবর্তন, অর্থাৎ সাধারণ গ্রাস বা তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, যার উপর অত্যধিক রোলার চালিয়ে অন্যান্য কারদানি করে মাঠের "প্রাণ" টুকুও নিঃশেষে নিঙড়ে নেওয়া হয় না। অন্যথায়, নামে "টার্ফ" উইকেট, কার্যত "শান"-এর, বোলাররা যাতে কিছুমাত্র সাহায্য পায় না। একটি মাত্র উদাহরণ। যুদ্ধের সময় যখন বম্বের ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের "শান"-এর উইকেটে ছ'সাতশ রান ভাল ব্যাটিং দলের পক্ষে কিছুই নয়, মাদ্রাজের চেপক মাঠে যথার্থ গ্রাস উইকেটে তিনশ রাণ করতে সেই দলই হিমশিম খেত।

"ন্যাচরল" উইকেটে কখন অঘটন ঘটে বলা যায় না, সুতরাং সাধারণত ব্যাটসম্যানরা খেলার খেলা খেলতে বাধ্য হত ; বোলারদের উইকেট পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তাই "রান-আটকানোর" চেষ্টায় কালক্ষেপ না করে, রানের উৎস অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে যতশীঘ্র সম্ভব ঘায়েল করায় যত্নবান হত। ফলে, খেলায় ছিল উত্তেজনা, উদ্দীপনা, নাটকীয় মুহূর্তের প্রাচুর্য—তিন দিনের মধ্যেই টেস্ট খেলার প্রায়ই মিমাংসা হয়ে যেত। বৃষ্টিতে উইকেটের আচ্ছাদন ছিল নিষিদ্ধ, ভিজে উইকেটে ব্যাটিং ছিল শক্ত—অন্য আর একটি "আর্ট", যে "আর্ট" আজ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে চলেছে।

ক্রিকেট খেলার শিক্ষা সম্বন্ধে এই বই। তাই ক্রিকেট সম্বন্ধে অন্য কথা হয়তো মনে হতে পারে—ধান ভানতে শিবের গাজন। মোটেই না। যে কোনও শিক্ষার বস্তু সম্বন্ধে বিশদ ভাবে না হলেও, অন্তত মোটামুটি না জানা থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। ক্রিকেট "ডাইন্যামিক", প্রাণবন্ত খেলা যার "স্পিরিট", প্রকৃতি বা তাৎপর্যের সঠিক উপলব্ধি না হলে শিক্ষা বিকৃত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, চলতি কথায় ওস্তাদী গান—সে গানের ব্যাকরণ রপ্ত হলেই কেউ সুগায়ক হয় না। সুর, ভাব ও ভাষার সংমিশ্রণে সঙ্গীত, "গ্রামার" বা ব্যাকরণ তো অপরিহার্য মাত্র। সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য শ্রোতাদের আনন্দ দেওয়া, সঙ্গীত ব্যাকরণ-সর্বস্ব নয়।

তেমনই ক্রিকেটে "টেকনিক" বা খেলার সাধনপ্রণালী শিক্ষাব্যতিরেকে উঁচুদরের খেলোয়াড় হওয়ার আশা দুরাশা। শিক্ষা অর্থেই "কোচিং" নয় ; বিনা "কোচিং"-এও বিরাট খেলোয়াড় সারা বিশ্বে বেরিয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখে শেখা ; বাল্যে ও কৈশোরে অনুকরণের শক্তি আশ্চর্য কিন্তু সহজাত। অবশ্য ভাল খেলোয়াড় হতে হলে সামনে ভাল "মডেল" বা ছাঁচ

থাকা দরকার। তাই গ্রেসের যুগে খেলোয়াড়দের গ্রেসের ছাপ; হবসের যুগে হবসের। ভারতে, নাইডুর যুগে নাইডুর এবং মার্চেণ্টের যুগে মার্চেণ্টের। কোচিং-এর উপকারিতা প্রভূত, কিন্তু পাইকারী হিসাবে অত্যধিক কোচিং-এর কুফলও কম নয় সে-কথা স্বর্গত ডগলাস জার্ডিন, আর্থার মেলী, স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ক্রিকেটার উল্লেখ করেছেন।

ক্রিকেট খেলার মূল উদ্দেশ্য খেলোয়াড়দের ও দর্শকদের আনন্দ দেওয়া। আজকের যুগে, একাধিক কারণে সে-উদ্দেশ্য সাধন করা সব সময় সম্ভব নয়। দলের পরাজয়ের আশঙ্কা, নিজের বা দর্শকদের আনন্দদান করার জন্য কোনও ব্যাটসম্যান মারের খেলা খেলতে গিয়ে নিজের দলকে ভাসিয়ে দেবেন, এমন কথা নিতান্ত বাতুল ছাড়া কেউ বলবেন না। উইকেট ব্যাটসম্যানের সহায়ক, বোলিং কিছু দুর্ধর্ষ নয়, তবু ব্যাটসম্যান ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা শম্বুক গতি ব্যাটিং করে যাবেন, এমন পরিস্থিতি সমর্থনযোগ্য নয়। দুটিই ক্রিকেটের নীতি বিরুদ্ধ যার সম্যক বোধ হয় ইংরাজি বহু প্রচলিত বাক্যে: "ইট ইজনট ক্রিকেট!"

"টেকনিক" রপ্ত করতেই হবে। কিন্তু সর্বপ্রথম এবং সর্বসময়ে স্মরণ রাখতে হবে কয়েকটি কথা। ক্রিকেট ব্যাটের রূপ পরিবর্তন হয়েছে একাধিক-বার, কিন্তু ব্যাট প্রথম তৈরী হয়েছিল, আজও হয়, একটি মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে —বল মারবার বা "হিট" করার জন্য, ঠেকাবার বা "ব্লক" করার জন্য নয়। বলেরও সাইজ ইত্যাদি একাধিকবার বদলেছে, কিন্তু বোলারদের মনে রাখতে হবে সদা সর্বদা যে, বল তৈরী হয়েছে ব্যাট-কে—ব্যাটসম্যানকে—হারাবার জন্য। এক কথায় ব্যাট এবং বলের পাল্লা অর্থাৎ আক্রমণাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ক্রিকেটের আইনকর্তারা বরাবর চেষ্টা করেছেন ব্যাট এবং বলের সাইজের সতর্ক নিয়ন্ত্রণ, উইকেটেরও রূপ পরিবর্তন।

ক্রিকেট খেলার উপাদান—মাল মশলা—মজুত রয়েছে। খেলায় উত্তেজনা, উদ্দীপনা সৃষ্টি করার, আনন্দদানের খোরাক প্রচুর। আবার ওঠে কিন্তু সেই কারিগর, ক্রিকেটারেরই, কথা—তাদের "এ্যাটিটুড"-এর। কোনও বিশ্ব-বরেণ্য ক্রিকেটারের কথা নয়, আমাদেরই বাঙ্গলা দেশের একজন প্রাক্তন বিশিষ্ট ক্রিকেটার, প্রোফেসর শৈলজা রায়ের কথা—যা পরে স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, ওয়ালটার হ্যামণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, ডেনিস কম্পটনের মুখে শুনেছি। তখন কলেজে নেট প্র্যাকটিশ সাঙ্গ হয়েছে, স্বল্পভাষী প্রোফেসর রায় হঠাৎ বললেন: "দেখ,

যখন ব্যাটিং করতে যাবে তখন প্রতি বলেই চার (বাউণ্ডারী) মারবার চেষ্টা করবে, না পারলে অন্তত 'সিঙ্গল'। বোলারকে কখনও পাত্তা দেবে না, দিলেই ওরা টুঁটি চেপে ধরবে।"

সামান্য, সরল, সহজ বাঙ্গলা ভাষায় দু'চারটি কথা। এমন কথানুযায়ী কাজ সব সময়ে সম্ভব নয়, কিন্তু এই কথার ভিতরেই রয়েছে ক্রিকেট খেলার মূলমন্ত্রের বীজ—"ট্যাকটিকস", "স্ট্র্যাটেজি", অনেক কিছুই। মস্ত স্পিন-বোলার ছিলেন প্রোফেসর রায়, সি কে নাইডু তখন দুর্দান্ত "হিটার", কিন্তু অসামান্য আত্মবিশ্বাস তাঁর, নাইডুর ব্যাটের সামনে দু'হাত দূরে রাখলেন দুজন "সিলী পয়েণ্ট", তার মধ্যে আমি একজন। দিল্লির রোশানারা গ্রাউণ্ডে অল-ইণ্ডিয়া টুর্ণামেণ্ট খেলা, নাইডু হঠাৎ দুর্দান্ত জোরে "অফ্-ড্রাইভ" মারলেন, বলটা শাঁ করে আমার বাঁ হাঁটু ঘেঁসে চলে গেল।

শুনতে পেয়েছিলাম, দলেরই আর একজন প্রবীণ খেলোয়াড় প্রোফেসর রায়কে আমাকে একটু পিছিয়ে দাঁড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন। প্রোফেসর সংক্ষেপে বলেছিলেন: "না, ঠিক আছে, ওকে এখন সরালে কোনও দিনও ওই জায়গায় দাঁড়াবার সাহস হবে না, আর 'সি কে'-ও পেয়ে বসবে!" সেই ওভারেই, দু-একটি বল পরে, ব্যাক খেলতে গিয়ে একটি তড়িৎ-গতি "অফ্-ব্রেকে" নাইডু হলেন "লেগ-বিফোর-উইকেট", অসহায়ভাবে!

ক্রিকেট খেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে "সাইকলজী", মনস্তত্ব। মনোভাব সাহসী না হলে হবসের মতো "পারফেক্ট ব্যাটসম্যান"-ও হালে পাণি পেতেন না। চোখে দেখবার পর "মেসেজ" বা "খবর" ব্রেনে পৌছোয়, সেই ব্রেন যদি সাময়িক ভাবে—সাহসের অভাবে বা অন্যান্য কারণে—পঙ্গু হয়ে যায়, তাহলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলবে না। সাধন প্রণালী বা "টেকনিক" যতই নিখুঁত হোক, কোনও কাজে লাগবে না। এমন ব্যাটসম্যানও আছেন, যাঁদের সম্বন্ধে অনেক সময় মন্তব্য করা হয়: "হি ওয়াজ আউট ইন দি ড্রেসিং রুম!"—অর্থাৎ এমন "নার্ভাস", যে মাঠে নামার আগেই আউট হয়েছেন।

এটা অবশ্য চূড়ান্ত উদাহরণ। কিন্তু মোদ্দা কথা, ক্রিকেট খেলায় একান্ত প্রয়োজন আক্রমণাত্মক মনোভাব, সাহসে যার ভিত্তি। একটু ভাল বোলিং, বা উইকেট একটু খারাপ হলেই ব্যাট হবে স্থানুবৎ; ব্যাটসম্যান একটু বেশী মেরে খেললেই, বা বিরোধী দলের স্কোরবোর্ডে বেশী রান দেখলেই "ডিফেনসিভ বোলিং ও ফিল্ড-প্লেসিং"—যেটা আজকের জগতজোড়া রেওয়াজ—

সেটা সাধারণত ক্রিকেটের "স্পিরিট", বা প্রকৃতি ও মূল উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে।

তাই, আবার বলি, খেলার সাধন প্রণালী শিক্ষার আবশ্যকতার সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু ক্রিকেট খেলার "স্পিরিট", যার ভিত্তি আক্রমণাত্মক মনোভাবের উপর, সেই "স্পিরিট" সম্যক উপলব্ধি না হলে সব শিক্ষাই হবে বিকৃত, ভস্মে ঘি ঢালার সামিল। খেলায় সাফল্য মণ্ডিত হতে হলে অনেক কিছুর প্রয়োজন সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। মুখ্যত কিন্তু সেই "এ্যাটিটুড", সাহসী মনোভাব। শুধু টেস্ট বা অন্যান্য উচ্চাঙ্গের ক্রিকেটে নয়, সর্বত্র—মাঠে ময়দানে, পল্লীগ্রামে, ছোট শহরে, এমন কী অলি-গলিতেও—এক কথায় ক্রিকেটের ভূভারতে। এই উপলব্ধিই করবে ক্রিকেট খেলায় প্রাণসঞ্চার, করবে তাকে প্রাণবন্ত—উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা ও আনন্দের মেলা!

ক্রিকেটের পোষাক পরিচ্ছদ

বহু বছর আগে আমাদের এই ইডেন গার্ডেনে একজন বিখ্যাত ইংরাজ ক্রিকেটর তরুণ এক বাঙ্গালী খেলোয়াড়কে বলেছিলেন: "ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু বি এ গুড ক্রিকেটার, ফার্ষ্ট ট্রাই টু লুক লাইক ওয়ান।" অর্থাৎ ভাল ক্রিকেটার হতে গেলে প্রথমে অন্তত সাজপোষাকে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা কর।

কথাটা দামী। ক্রিকেট খেলার পোষাক পরিচ্ছদ যে ব্যয়সাপেক্ষ সে-কথা মানি। কিন্তু সাবধানে সেগুলি ব্যবহার করলে, নিয়মমতো ট্রাউসারস, শার্ট, আণ্ডারওয়ের, সাসপেন্সর, মোজা, রুমাল ইত্যাদি কাচিয়ে রাখলে, এবং বুট-জোড়াতে সময় মতো খড়ি দিয়ে রাখলে, সকলেরই পক্ষে সব খেলাতেই ফিট-ফাট, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে মাঠে নামা শক্ত নয়, সহজই হবে।

কথাটা দামী বলেছি, তার কারণ আছে। বেশী দিন নয়, ২৫-৩০ বছরের কথা, ধুতি-শার্ট পরে, পায়ে বুট এবং মাথায় সোলার হ্যাট বসিয়ে খেলা বাঙ্গলা দেশে একপ্রকার ফ্যাশন ছিল; বাঙ্গলার নামী-গুণী খেলোয়াড়রা সকলেই এই অদ্ভুত সাজে নামতেন। মাত্র সাহেব দল, ক্যালক্যাটা, বালীগঞ্জ ইত্যাদি ক্লাবের সঙ্গে খেলা হলে—বিশেষ করে ইডেন গার্ডেনে বা বালীগঞ্জ মাঠে—বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই ট্রউসারস ধার করতে বেরোতেন, ফিট করুক বা না করুক, কোনও মতে প্যাণ্ট গলিয়ে মাঠে নামতেন।

বুটের কথা বলেছি, তবু অনেকেই, এমন কি বোলাররাও খালি পায়ে খেলতেন। যে সে বোলার নন, স্বর্গত এস (হেবো) দত্তের মতো দুর্দান্ত বোলার, বুট পরে বল করতে কিন্তু তাঁর বিশেষ অসুবিধা হত! যতদূর মনে পড়ে, আমার অভিজ্ঞতায় সে যুগে মাত্র কোচবিহারের মণি দাসকেই ক্রিকেটের কেতা-দুরস্ত সাজে সব খেলাতে নামতে দেখেছি।

আমরা সবে ক্রিকেটে ঢুকেছি, শুরুতে তখনকার হাল-চাল মতই পোষাক পরতাম, কিন্তু বেশী দিন নয়। এই বাঙ্গালী-ক্রিকেট পোষাক নিয়ে একবার প্রচণ্ড বিতর্ক হয়, বোধ হয়, ১৯২৯ সনে। উপরোক্ত ইংরাজ ক্রিকেটারের মন্তব্যে নাকি বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক, এমন কি বাঙ্গালী জাতিকে অবমাননা করা হয়েছে—এমন ধুয়োও ধরা হয়! এ অভিযোগ, অভিযোগের সমর্থনে যুক্তি অবশ্য অর্থহীন।

সে-সময়ে সংবাদপত্রের চিঠি-পত্র বিভাগে এসব কথাই লিখেছিলাম। বিদ্যাসাগর কলেজের তখন দুর্দান্ত দল, আমি ক্যাপ্টেন, আগেই কেতা-দুরস্ত ক্রিকেটের পোষাক শুরু করেছিলাম। অনতিবিলম্বেই নির্দেশ দিয়েছিলাম ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রিত পোষাক না পরলে দলে নেওয়া হবে না, সে নির্দেশ কোনও প্রফেসার যদি আমার দলে থাকেন তাঁকেও মানতে হবে। প্রথম প্রথম কিছুটা প্রতিবাদের সুর শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সে-নির্দেশ একদিনের জন্যও রদ-বদল করা হয়নি। পরে সকলেই এ-বিধান সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছিলেন, অন্য কোনও কারণে নয়, খেলায় সুবিধার জন্য। বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেটে বিদ্যাসাগর কলেজ বহু বিষয়ে অগ্রণী, ক্রিকেট-নিয়ন্ত্রিত পোষাকের প্রবর্তনের ব্যাপারেও। তাই আজ আমিও বলি: "ইফ ইউ ওয়াণ্ট টু বি এ ক্রিকেটার ফার্ষ্ট ট্রাই টু লুক লাইক ওয়ান।"

ধাপে ধাপে খেলায় উন্নতি হলে পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন বাড়বে বই কমবে না। ক্রিকেটের একটা বড় ব্যাগ তখন হবে অপরিহার্য, যেটাতে থাকবে বাড়তি সাজ-পোষাক। বড় খেলায়, (তিন দিন ব্যাপী বা তারও বেশী) বাড়তি শার্ট, ট্রাউজারস, আণ্ডারওয়ের, মোজা, রুমাল, তোয়ালে বিশেষ দরকার। প্রচণ্ড গরমে খেলা, তখন একই দিনে একাধিকবার সমস্ত কিছুই বদলাবার প্রয়োজন হতে পারে এবং হয়। বাড়তি একজোড়া বুট হলে ভালই, যদি কোনও কারণে বুট ছিঁড়ে বা অন্য কারণে অচল হয়ে যায়। শীতের দিনে গরম সোয়েটার বা পুলোভার না হলে চলে না। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ায় তো বটেই,

ভারতে দিল্লি, কলকাতা ইত্যাদি ছোট বড় শহরেও। অবশ্য শীতকালে হাড়-কাঁপানো শীতে অনেক সময় একাধিক সোয়েটার ব্যবহার করতে হয়। ঐ কারণেই শীতে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজারস, শার্ট, গরম মোজা ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ব্লেজার, স্কার্ফ ও ক্যাপ আছে।

সাজ পোষাকের তালিকা দেখে মনে হবে ক্রিকেট খেলা রাজসিক ব্যাপার। ধারণা একেবারে ভুল নয়, এ-খেলা সত্যই ব্যয়সাপেক্ষ। ধারণাটা হবে ভুল যদি কেউ মনে করেন সাজের এই আধিক্য অকারণ, "শো-অফ" বা "চাল মারবার" জন্য। সাজপোষাকের প্রত্যেকটি দফার বিশেষ প্রয়োজনীতা। সোয়েটার বা পুলোভার পরা সুন্দরী রমণীকুলের অলঙ্কার নয়, শরীরে উত্তাপ, রক্ত চলাচল ঠিক রাখার জন্য। গা-হাত-পা "হিম" হয়ে গেলে খেলা অসম্ভব সে-কথা সহজেই বোধগম্য।

ভারতের বহু অংশে সেদিনও হরদম শোনা যেত—আজও মাঝে-মাঝে যায়—"দেখ দেখ 'চাল মেরে' আবার 'কাউন্টি' পরেছে!" কাউন্টি অর্থে ক্যাপ—ইংলণ্ডে, অস্ট্রেলিয়ায় বিশেষ বিশেষ কাউন্টি বা ষ্টেট বা প্রভিন্স-এর বিশেষ নিশানা-যুক্ত ক্যাপ। এই ক্যাপের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা, ব্যাটিং বা ফিল্ডিং এর জন্য, বল ভাল করে দেখতে সাহায্য করে বলে। ক্যাপের "বীক্" বা চোখের ওপরে লম্বা অংশটার তলায় সবুজ কাপড় দেওয়া থাকে, চোখ ঠাণ্ডা রাখার জন্য। এক কথায় "আই-শেড"-এর কাজ করে। সুতরাং ক্রিকেট খেলার প্রত্যেকটি সাজ পোষাকেব তাৎপর্য আছে। এবং খেলায় উন্নতি করতে হলে খেলার সাজের উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। ক্রিকেট খেলার এটা একটি বিশেষ অঙ্গ, অপরিহার্য।

ব্যাটসম্যানের সরঞ্জাম

ব্যাটসম্যানের খেলার সরঞ্জামের মধ্যে ব্যাট, প্যাড, থাই-প্যাড, গ্লাভস, বুট, মোজা, ট্রাউসারস, সোয়েটার, ক্যাপ, এ্যাবডমিন্যাল গার্ড। বড় ক্রিকেট ব্যাগে সব জিনিষ সহজেই ধরে। ট্রাউসারস, সোয়েটার-পুলোভার, ক্যাপের কথা আগেই বলেছি সুতরাং তার পুনরুল্লেখ করব না। মাত্র বলব দুর্দান্ত ঠাণ্ডা না পড়লে, হাতওয়ালা সোয়েটারের বদলে "স্লীভলেস", হাত-বিহীন সোয়েটার বাঞ্ছনীয়; তাতে শরীরের উত্তাপ ঠিক থাকে, কিন্তু লম্বা হাতের দরুন হাতের "মুভমেণ্ট", চালনার কোনও অসুবিধা হয় না।

থাই-প্যাড খুব ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় উঁচুস্তরের ক্রিকেটে, থাই-প্যাড স্পঞ্জ রাবারের তৈরী, উরুর উপর বাঁধা হয়, অবশ্য ট্রাউসারসের তলায়। ব্যবহারের উদ্দেশ্য জোর বল লাফালেও ব্যাটসম্যান ভয় পাবেন না। বলের লাইনে সাহসভরে খেলতে পারবেন, টেকনিকের ভুল হবে না। প্রথম শ্রেণীর প্রায় বেশীর ভাগ ব্যাটসম্যান থাই-প্যাড ব্যবহার করেন, বিশেষ ওপেনিং ব্যাটসম্যানদ্বয়, নতুন বল সাধারণত হঠাৎ লাফায় বলে। "বডিলাইনের" সময় "চেস্ট প্রোটেক্টর"-ও ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু নিত্যনৈমিত্তিক, সাধারণ খেলায় থাই-প্যাডের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

ভারতে সাধারণ ক্রিকেটে ব্যাট, প্যাড, গ্লাভস, প্রোটেক্টর ইত্যাদি খুব কম খেলোয়াড়ের থাকে, কিন্তু থাকলে ভাল হয়। এ সব ক্লাব, কলেজ, স্কুল ইত্যাদি জোগায়, খেলোয়াড়দের যার যখন দরকার সেই মতো ব্যবহার হয়, যাকে বলে বারোয়ারী ব্যাপার। কিন্তু ভাল ক্রিকেটার হতে হলে ক্রমশ এ-সব সরঞ্জাম নিজস্ব হওয়া অত্যাবশ্যক।

ব্যাট

স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের মতো "একমেবদ্বিতীয়ম্" ব্যাটসম্যানও বলেছেন, যে কোনও একটা ব্যাট তুলে নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার সুবিখ্যাত ব্যাটস-ম্যান ভিকটর ট্রাম্পার সহজাত কৃতিত্বের সঙ্গে চমকপ্রদ খেলা খেলতে পারতেন এ-কথা শুনে তিনি বিস্মিত। স্বীকার করেছেন, পছন্দসই নিজের ব্যাট না হলে তাঁর খেলতে বেশ অসুবিধা হত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এবং আরও অনেকের মতেই, আমিও সেই কথাই বলব। এই পরামর্শের পিছনে যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলা যেতে পারে।

বহু কোম্পানির ব্যাট বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমত কাঠের গুণে, এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতায় প্রস্তুত করার প্রণালীর বৈশিষ্ট্যে, জগতে ইংলণ্ডের তৈয়ারী ব্যাট যে শ্রেষ্ঠ সে কথা সর্ববাদিসম্মত। আজকের যুগে বিজ্ঞানের প্রসারে ভাল ব্যাট তৈরী করা সব দেশেই অবশ্য সম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত কাঠ পাওয়া না গেলে কী হবে? ইংলণ্ডে "উইলো" কাঠের বন সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে, যে "উইলো"-র সমকক্ষ অন্য দেশে শত চেষ্টায়ও পাওয়া দুষ্কর। তাই ব্যাটের ব্যাপারে ইংলণ্ডের এই প্রাধান্য। নটিংহামে বিখ্যাত "গান্ এ্যাণ্ড

মুর" কোম্পানির ফ্যাক্টরী দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম, ব্যাট প্রস্তুতির ব্যাপারে। "সীজন" করতে কী যত্ন নেওয়া হয়! এই কোম্পানিরই "অটোগ্রাফ" ব্যাট, নাম যার বিশ্ব-জোড়া।

ফুল-সাইজের ব্যাটের উচ্চতা ৩৫ ইঞ্চি, ব্লেড্ ২৩ ইঞ্চি, হ্যাণ্ডল ১২ ইঞ্চি, ব্লেড ৪½ ইঞ্চি চওড়া। ব্যাটের মধ্যে লং হ্যাণ্ডল, শর্ট হ্যাণ্ডল—দু'রকম। ব্লেডের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা সমানই থাকে, শর্ট হ্যাণ্ডল লং হ্যাণ্ডল থেকে প্রায় এক ইঞ্চি কম। হ্যাণ্ডলের কমবেশী করার উদ্দেশ্য, লম্বা ব্যাটসম্যান লং হ্যাণ্ডল ব্যবহার করবে তা না হলে কুজো হয়ে স্টান্স নিতে হয়; হ্যাণ্ডল শর্ট হলে বেঁটে বা মাঝারি ব্যাসম্যানদের ব্যাট ঠিক মতো ধরতে সুবিধা হবে।

কিন্তু লং হ্যাণ্ডল বা শর্ট হ্যাণ্ডলের পিছনে উদ্দেশ্য যাই হোক, এ সম্বন্ধে কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। ব্র্যাডম্যান ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা, শুরুতে লং হ্যাণ্ডল ব্যাট ব্যবহার করতেন, পরে কিন্তু শর্ট হ্যাণ্ডল, প্রায় আগাগোড়াই তাঁর চমকপ্রদ ক্রিকেট খেলার জীবনে। ব্র্যাডম্যানের থেকে বেশ লম্বা ব্যাটসম্যান শর্ট হ্যাণ্ডল, বহু বিখ্যাত "বেঁটে" ব্যাটসম্যান লং হ্যাণ্ডল সারা-জীবন ব্যবহার করে গেছেন। এখানে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা, যাকে বলে আপ-রুচি! কিশোরদের জন্য অবশ্য অন্য ছোট সাইজের ব্যাট; সাড়ে চারফুট লম্বা ছেলে প্রায় তিন ফুট উঁচু ব্যাট চালাবে কী করে? তাছাড়া ব্যাটের ওজনও একটা আছে।

নানা পরীক্ষার পর, এবং বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফলে প্রায় সকলেরই মত, ফুল-সাইজ ব্যাটের ওজন ২ পাউণ্ড ৪ আউন্স (এক সেরের কিছু বেশী) হলেই ভাল। তার থেকে ওজন কম হলে উইকেটের সামনের মার যথা ড্রাইভ তেমন জোর হয় না, যদিও হালকা ব্যাটে উইকেটের দু'পাশের মার—কাট এবং হুক—সহজ হয়। ওজন বেশী হলে সকলের পক্ষে স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে ব্যাট চালানোর সুবিধা হয় না, অস্বস্তিই হয়। এক্ষেত্রেও নিক্তির ওজনের কোনও নিয়ম নেই, ব্যাটের ওজন কিছুটা কম-বেশী হলে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে, যাঁরা আড়াই পাউণ্ডের উপর "গদা"-সম ব্যাট চালিয়ে বহু রেকর্ড করেছেন, যেমন অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ওপ্‌নিং ব্যাটসম্যান, বিল পনসফোর্ড। তাঁর ব্যাটের ওজন থাকত সাধারণত ২ পাউণ্ড ৮ থেকে ৯ আউন্স।

ব্যাট পছন্দ করার গূঢ় তত্ত্ব, তুলেই হাতে যেটা ভাল লাগে, তারপর

দোকানের ভিতরেই কাল্পনিক কাট, হুক, ড্রাইভ মারার "পরীক্ষা" করে। ব্লেডের গ্রেন সমান হতে পারে, নাও হতে পারে—তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। "গুঁড়ি" থাকলেই যে ব্যাট খারাপ হবে এমন কথা নয়, কিন্তু পারত-পক্ষে সে-রকম ব্লেড বাদ দেওয়াই বিধেয়। রাবার গ্রিপ আজ প্রায় সব ব্যাটেই চলতি, গ্রিপ যদি হাতে যুৎসই লাগে, ব্যাটের "ব্যালান্স" পছন্দসই হয়, ওজন ২ পাউণ্ড ৩।৪ আউন্সের কাছাকাছি, তাহলে চোখ বুজে সে ব্যাট কেনা যায়। তবে গ্রিপ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, মারের সময় রাবার গ্রিপ "স্লিপ" করলেই সমূহ বিপদ!

পছন্দসই ব্যাট কিনলেই শুধ্ হবে না, ব্যাটের যত্ন নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বড় বড় ব্যাটসম্যানদের আনকোরা ধবধবে সাদা ব্লেড-ওয়ালা ব্যাট নিয়ে খেলতে দেখা যায়, তাঁদের এক-আধটা নতুন ব্যাট ভাঙ্গলে কিছু যায় আসে না।

কারখানায় ব্যাটের "উইলো" "সীজন" করার কথা বলেছি। নতুন ব্যাট কিনে সযত্নে, অতি সাবধানে "সীজন" করা দরকার। আলতো এক কোট "র লিনসিড অয়েল" লাগিয়ে প্রথম প্রথম খুব আস্তে বল মারা। তার পরে শিরীষ কাগজ হালকা ভাবে ঘষে, আবার এক কোট তেল লাগিয়ে, কিছু জোরে বল (অবশ্য পুরোনো) মারা, ক্রমশ আরও জোরে। হপ্তাখানেক এই ব্যবস্থার পর ম্যাচে নতুন বলের বিরুদ্ধে নতুন-কেনা ব্যাট নিয়ে খেলা চলতে পারে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলেই এই সতর্ক বাণী। অনেকদিনের কথা, জে বি হবসের ফোর-এক্স ব্যাট সবে কিনেছি। "সীজন" করার তেমন সময় পাই নি, লাহোরে মহম্মদ নিসারের বিরুদ্ধে ব্যাট করছি। ১৯৩২ সনে সাফল্য মণ্ডিত ইংলণ্ড সফর থেকে নিসার সবে ফিরেছেন, দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিং। ওপনিং ব্যাটসম্যান আমি, নিসারকে বেশ ভালই খেলছি, মন বেশ প্রফুল্ল। লাঞ্চের সময় ব্যাটের চেহারা দেখে কিন্তু কান্না পেল। ব্লেডের তলা থেকে আট ইঞ্চি—সৌভাগ্যক্রমে ঠিক মধ্যখানে—বলের সাইজের কিছু ছোট দুটি গর্ত্ত। অর্থাৎ ঐ দু জায়গায় বেশ "দেবে" গেছে, বা "খোঁদল" হয়েছে। বল কানায় লাগলে অবশ্য ব্যাট নিঃসন্দেহে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যেত। পরে ভাল করে "সীজন" করে অনেকদিন খেলেছিলাম সেই ব্যাটে। তাই এই সতর্কবাণী।

ব্যাটের ছোটখাটো "জখম" হলে স্টিকিং প্ল্যাস্টারে বেঁধে নেওয়া যথেষ্ট। বড় গোছের হলে "বাইণ্ডিং" (কার দিয়ে) ছাড়া উপায় নেই। বারোয়ারী

ব্যাটে আগে থেকেই সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়, "আনাড়ীর" মার থেকে ব্যাট রক্ষা করতে। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত ব্যাটের কথা বলেছি। ব্যাট নির্বাচনের মূল কথা, হাতে যুৎসই লাগা, অন্যান্য প্রয়োজনের কথা তো বলেইছি।

প্যাড

ব্যাটের মতো, যদি একজোড়া ব্যাটিং প্যাড নিজের থাকে, তাহলে সবের ভাল। নাম করা ম্যানুফ্যাকচারারদের তৈরী সব প্যাডই উনিশ-বিশ তৈয়ারী হয়, খুঁত বিশেষ থাকে না। নিজস্ব প্যাডের প্রস্তাব করেছি তার কারণ ক্রিকেটের অন্য সাজ-পোষাকের মতো প্যাড যেন মনে হয় খেলোয়াড়ের অঙ্গ বিশেষ, যেমন জুতো বা মোজা। প্যাড পরার উদ্দেশ্য, বল লেগে পায়ের বা উরুর কোন অংশে চোট না লাগে ; তার জন্য আধুনিক যুগের প্যাড বেশ হাল্কা হলেও সাধারণত আঘাত লাগার কোনও ভয় নেই।

হালকা প্যাড পরে চলা-ফেরা-দৌড়ানোর কোনও অসুবিধা হয় না, যেটা কী ব্যাটিং-এর জন্য কী রান নেবার সময় বিশেষ প্রয়োজন। দেশ-বিদেশে অনেক সৈন্য দেখেছি, ভারী "এমুনিশ্যন" বুট পরেও আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। সেইরকম প্যাড, গ্লাভস, প্রোটেক্টর, বুট, ক্যাপ—ব্যাটসম্যানের শরীরের অংশ যখন মনে হবে—বোঝা নয়—তখনই ব্যাটসম্যান খেলায় সম্পূর্ণভাবে "কনসেনট্রেট" বা মনোনিবেশ করতে পারবেন। "কনসেনট্রেশন" ব্যতিরেকে ব্যাটিং অসম্ভব।

প্যাডের, ব্যাটের মতোই যত্ন নিতে হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই সোজা, "কুইক-হোয়াইট"-র কৃপায় প্যাডের দরুণ বিপদের আশঙ্কা একটি মাত্র কারণে। প্যাডের স্ট্র্যাপ সাধারণত বড় রাখা হয়, কারণ ম্যানুফ্যাকচাররা জ্যোতিষী নন যে আগেভাগেই জানবেন কোন প্যাড-জোড়া মোটা লোক কিনবেন, কোনটাই বা রোগা লোক। সুতরাং নিজের প্রয়োজন মতো স্ট্র্যাপের বাড়তি অংশ কেটে ফেলাই বিধেয়।

স্ট্র্যাপ বাইরে ঝুলে থাকলে, আম্পায়ারের ভুল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, বিশেষ করে লেগ-সাইডে। লেগ-স্টাম্পে অফ-ব্রেক বা ইন-সুইং বল, ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড লেগ-গ্লান্স করতে গেছেন, ব্যাটে-বলে সম্পর্ক নেই, বল সামান্য বেশী ব্রেক বা সুইং করেছে, প্যাডের স্ট্র্যাপে লেগে সামান্য একটা আওয়াজ, বোলার

উইকেট-কীপারের বিরাট এক চিৎকার, আম্পায়ারের অঙ্গুলি উর্ধ্বমুখী, অর্থাৎ "আউট"! গোড়ায় গলদ, সামান্য একটু অবহেলা, তারই জন্য ব্যাটসম্যানের এই শাস্তি। আম্পায়ারের কাজ শক্ত সব সময়েই; তবু এ-ধরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা সত্যই কঠিন!

ক্লাব-কলেজ-স্কুলের বারোয়ারী প্যাডে স্ট্র্যাপ কেটে ফেলা সম্ভব নয়। সুতরাং বাড়তি স্ট্র্যাপ গুটিয়ে প্যাডের ভিতরই গুঁজে রাখা যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গত, একটি কথা বলার প্রয়োজন। ক্রিকেট খেলার মাঠে নোংরা প্যাড পরে ব্যাটসম্যান বা উইকেট-কীপার নামছেন, আরও নোংরা স্ট্র্যাপ বাইরে ঝুলছে, জবড়জঙ্গ একটা ভাব—এমন দৃশ্য শুধু দৃষ্টিকটু নয়, খেলোয়াড়ের পক্ষেও বিশেষ হানিকর। অবশ্য দেশী প্যাড বিলাতীর মতো ভাল হতে পারে না, বহু ক্ষেত্রেই অত্যধিক ভারী। ভারী প্যাড হলেই চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে খেলার বিশেষ অসুবিধা, ভুলচুক বেশী হয়।

উইকেট-কীপারের প্যাড

ব্যাটসম্যানের প্যাড সম্বন্ধে আলোচনা হলেও, উইকেট-কীপারের প্যাডের সম্বন্ধে এখানেই বলি। উইকেট-কীপারের জন্য বিশেষ করে প্যাড তৈরী হত পৃথিবীর সর্বত্র, এখনও হয়। যেমন ভারী, তেমনই পুরু, পায়ে চাপালে হাঁটা ফেরা করাই দুরূহ। আমি নিজে উইকেট-কীপার ছিলাম, দু'একবার পরে এমন "জবুথবু" হয়ে পড়েছি যে, অনতিবিলম্বে সে প্যাড বাতিল করে দিতে হয়েছে। তাই ব্যাটিং প্যাড পরেই আজীবন উইকেট-কীপিং করেছি মহম্মদ নিসার, স্যুটে ব্যানার্জি, দেবরাজ পুরীর মতো ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে।

যে কোনও ভাল উইকেট-কীপার শতকরা নিরানব্বইটি বল হাতে অর্থাৎ গ্লাভস দিয়ে ধরেন—বা তাঁর ধরা উচিত। ক্বচিৎ কদাচিত এক-আধটা বেমক্কা বল পায়ে এসে লাগে যার জন্য একজোড়া ভারী প্যাড পরে "কিম্ভূত-কিমাকার" একটি জড়-বিশেষ হবার কোন অর্থ হয় না। পরে বহু টেস্ট উইকেট-কীপারকে দেখেছি ব্যাটিং প্যাড পরে স্টাম্পের পিছনে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধারণা উইকেট-কীপিং প্যাডের সত্যই কোনও দরকার নেই—এক কথায় এর ব্যবহার অবান্তর। শুধু

তাই নয় ভারী প্যাডে উইকেট-কীপারের ক্ষতিই হয়। যদি উইকেট-কীপারের জন্য প্যাড বানাতেই হয়, সেটা আরও পাতলা এবং হালকা হওয়া উচিত।

প্রোটেক্টর

শুধু ভারতে নয় অন্যান্য দেশে আজও প্রোটেক্টরকে এবডমিন্যাল "গার্ড" অথবা শুধু "বক্স" বলা হয়। ট্রাউসারসের তলায় জকস্ট্র্যাপের এ্যালুমিনিয়াম বা প্লাসটিকের তৈরী ছোট জিনিষটি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় সহজেই। প্রোটেক্টর ব্যবহার করলে তলপেটে বা তারও নীচে সাংঘাতিক আঘাত লাগার ভয় থাকে না। প্রোটেক্টরের ব্যবহার আজ বিস্তৃত। প্রায় সব শ্রেণীর খেলায় সব ব্যাটসম্যানই প্রোটেক্টর বিনা ব্যাট করতে নামেন না। আগে এই গার্ডের সঙ্গে দু'দিকে লম্বা স্ট্র্যাপ থাকত, এখনও বোধ হয় কিছু পরিমাণে তৈরী হয়—সেই স্ট্র্যাপ কোমরের পিছনে আটকে দেওয়া হত। এ-ব্যবস্থা আজ প্রায় অচল।

আঘাত লাগার ভয়ের কথা লিখেছি। আজ গার্ড বা বক্সের চল এত ব্যাপক যে আশ্চর্য মনে হতে পারে এই ভারতবর্ষে ২৫-৩০ বছর আগে গার্ডের অস্তিত্ব সম্বন্ধে খুব অল্প খেলোয়াড়ই জানতেন। আর জানতেন না বলেই গার্ড-এর অভাব বোধ করতেন না, ভয়ের প্রশ্নও উঠত না। আমাদের মধ্যে অনেকেই সে যুগে রামজী, নিসার প্রমুখ ফাস্ট-বোলারদের বিরুদ্ধে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যাট করেছি, কিন্তু গার্ড-এর প্রশ্ন মনে জাগে নি। পরে অবশ্য দেখে শুনে এ সবকিছুই নিয়মিত ব্যবহার করেছি।

সে যুগে এ্যাবডমিন্যাল গার্ড বলতে বোঝাত উইকেট-কীপারের জন্য মাত্র একটা "ঢাউস" গার্ড যেটা প্রায় সারা তলপেটে বিছিয়ে থাকত। একে বিরাট ভারী প্যাড, তায় জগদ্দল গার্ড, উইকেট-কীপারের নড়া-চড়াই দায়! বুদ্ধিমান উইকেট-কীপাররা তখন থেকেই এই সব জিনিষ সংক্ষেপ করেছেন, তাও দেখেছি।

আগেই বলেছি ক্রিকেট খেলায় মনস্তত্ত্বের প্রভাব যথেষ্ট। সাহসই খেলার ভিত্তি। সেদিন বিনা গার্ড-এ যদি বিশেষ চোট-জখম না হয়ে দুর্দান্ত ফাস্ট-বোলারের বিরুদ্ধে খেলা সম্ভব হত, আজ কেন হয় না? কারণ মনোভাবের পরিবর্তন। বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি প্রদীপের আলোয় পড়াশুনা করে বিরাট পণ্ডিত হয়েছেন সে যুগে, আলো অল্প বলে অভিযোগ করেন নি।

আজ তাঁদেরই পৌত্র-পৌত্রীর ফ্লুয়োরোসেণ্ট-এর আলো না হলে অসুবিধা হয়, চক্ষুরত্নের হানি হবার নাকি আশঙ্কা থাকে। যুগের পরিবর্তন, তার সঙ্গে মনোভাবেরও।

নিরাপত্তার প্রশ্ন অবশ্য ফেলবার নয়, বিশেষ করে যখন ক্রিকেট খেলা আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ইংলণ্ডে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটারদের সপ্তাহে ৬ দিন খেলতে হয়। কিন্তু আমার বক্তব্য, এ-সব উপাদানের ব্যবহারের বিরুদ্ধে নয়, এই নিরাপত্তার বস্তুগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে যার পিছনে আছে আতঙ্কের মনোভাব। অর্থাৎ ফুলের ঘায়ে যেন তরুণ ক্রিকেটররা মূর্ছা না যান, মনকে তাঁদের শক্ত করতে হবে।

ক্রিকেট খেলায় বেশীর ভাগ চোট-জখমের পিছনে থাকে হয় ব্যাটসম্যানের মনের আতঙ্ক, নয় নিছক এ্যাকসিডেণ্ট। সুতরাং মনের দ্বিধা-ভয় দূর করে সাহসভরে খেলতে হবে। ভাল ব্যাটসম্যান হতে হলে প্যাড-থাইপ্যাড প্রোটেক্টর-গ্লাভস পরতে হবে অবশ্য, কিন্তু সেগুলির অস্তিত্ব ভুলে যেতে হবে।

গ্লাভস

ব্যাটসম্যানের নিরাপত্তার জন্য গ্লাভসের ব্যবহার অপরিহার্য। নিরাপত্তার জন্য যতগুলি সরঞ্জাম আছে তার মধ্যে গ্লাভসের একান্ত প্রয়োজন। 'গুড-লেন্থ' বল লাফালে, এবং ব্যাটসম্যান বলের লাইনে 'স্ট্রেট ব্যাটে' খেললে, নীচের হাতে চোট লাগা প্রায় অনিবার্য, খুব বেশী এবং হঠাৎ লাফালে বাঁ হাতেও লাগবে। অবশ্য যাঁরা ডান হাতে ব্যাটিং করেন তাঁদের কথাই বলছি।

ক্রিকেট মূলত হাত-পা-চোখের খেলা। ক্রিকেটের বল শক্ত, হাতের আঙ্গুলে চোট লাগে বেশ, ফাস্ট-বোলারের বল হলে তো চোখে "সরষে ফুল"। অথচ ছোট ছেলে-মেয়েরা যেমন দুধ খেতে বিশেষ নারাজ, কৈশোরে ব্যাটস-ম্যানরা পারতপক্ষে গ্লাভস পরতে না হলে যেন "বাঁচোয়া"। আসল কারণ, বোধ করি, খালি হাতে বেশ শক্ত করে ব্যাটের হ্যণ্ডল গ্রিপ করতে সুবিধা যতটা, প্রথম প্রথম হাতে অন্য একটা বাড়তি জিনিষ পরে ততটা হয় না।

কিন্তু সেটা গ্লাভস পরলে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে, না পরলে চোট লাগার ভয় যথেষ্ট। আর, একবার তেমন জখম হলে, মনে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় সে-আতঙ্ক সারাজীবন কাটিয়ে উঠতে পারা যায়নি এমন দৃষ্টান্ত কম নয়। ভয়ের

কারণে সযত্নে শেখা টেকনিক ভেসে যায়, তেমন চোট লাগার পর দেখা গেছে বড় বড় ব্যাটসম্যানদেরও একদম "নভিস" বা কাঁচা খেলোয়াড়ের মতো খেলতে!

গ্লাভস বাজারে সাধারণত দু'রকমের পাওয়া যায়। একটিতে চারটে আঙ্গুল গলিয়ে, একটা লম্বা ইলাসটিক স্ট্র্যাপ কবজি ঘিরে, পরে বুড়ো আঙ্গুলে পরা হয়। এর সুবিধা, খালি হাতের তালু দিয়ে ব্যাট গ্রিপ্ করা যায়। ব্র্যাডম্যান এই ধরণের গ্লাভস ব্যবহার করতেন, খালি হাতে ব্যাট গ্রিপ করায় সুবিধা হত স্বীকার করেছেন। অন্যটি পুরো গ্লাভস, সাধারণ দস্তানার মতো, হাতটা গলিয়ে দিলেই হল।

অবশ্য দু'প্রকার গ্লাভসেই আঙ্গুলের বাইরের দিকে "ট্যুবুলার" চামড়া, "স্পঞ্জ" বা "পরকুপাইন" রাবার থাকে, আরও অনেক রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা—যাতে বল লাফিয়ে ব্যাটসম্যানের হাতে লাগলেও আঘাত লাগে না, বা তেমন জোর লাগে না। পুরো দস্তানার সুবিধা হয় এমন ব্যাটসম্যানদের যাদের হাত বেশী ঘামে; যে-ঘাম তোয়ালে জাতীয় কাপড়ের খোল শুষে নেয়। গ্লাভস পছন্দ ব্যক্তিগত সুবিধার ব্যাপার। নিজস্ব গ্লাভস হলে দেখে নিতে হবে ঠিক ফিট করে কী না। বারোয়ারী হলে, যেটা নিজের হাতের মাপের সেটাই বেছে নিতে হবে। স্ট্র্যাপ-ওলা গ্লাভস হলে, স্ট্র্যাপ যদি বড় হয় সেটা টিকে নিয়ে বা অন্য প্রকারে ছোট করে ফিট করে নেওয়া উচিত। গ্লাভস "ঢলঢলে" হলে মারের সময় হাত ফস্কে যাবার সম্ভাবনা, ফলে আউট হবার যথেষ্ট ভয়। তাই গ্লাভস কেনা এবং বাছার সময় সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন।

বুট

ক্রিকেটের বুট-জোড়া অবশ্য নিজস্ব, বারোয়ারী হতে পারে না। সম্ভব হলে কেনা বুটের থেকে তৈরী করে নেওয়াই ভাল। মাঠে অনেকক্ষণ থাকতে হয়, সামান্য ছোট বা বড় হলে বিশেষ অসুবিধা, খেলোয়াড়ের পক্ষে ভীষণ দুর্ভোগও হতে পারে। তৈরী করিয়ে নিলে ঠিক মতো ফিট করে, এবং সেইটেই আসল কথা। ফিট করার সময় ক্রিকেটের পুরু মোজা পরে দেখে নিতে হবে, তাহলে পরে টাইট হয়ে যাবার ভয় থাকে না।

বুট সাধারণত বাক-স্কিন বা ক্যাম্বিশের হয়। সোল খুব বেশী মোটা বা

অত্যধিক পাতলা করা উচিত নয়—মাঝারি হওয়া যুক্তিযুক্ত। বুটের তলায় সাধারণত ১৩টি স্পাইক্ বা স্প্রিগ হীলে (গোড়ালিতে) বারটি, সোলে ন'টি (অন্যত্র ছবিতে যার নির্দেশ দেওয়া আছে)—লাগাতে হবে। বিনা স্পাইকে বুট স্লিপ করবে বা হড়কে যাবেই, ব্যাটিং-এ মারের জোর হবে না, ফিল্ডিং-এ বিশেষ অসুবিধা, আর বোলিং তো একপ্রকার অসম্ভব। স্পাইক থাকলে তবেই বুট জমি গ্রিপ করবে। স্পাইক বিভিন্ন প্রকারের পাওয়া যায়, প্রয়োজন মত বেছে নিয়ে সোলে গেঁথে নিতে হয়। অনেক স্পাইকের তলায় স্ক্রু থাকে, সোলে লাগিয়ে নেবার সুবিধার জন্য।

বুটে একবার স্পাইক লাগিয়ে নিলেই কর্তব্যের শেষ হয় না। প্রতিদিন খেলার পর স্পাইক ঠিক আছে না ঢিলে হয়ে গেছে, সেটা দেখে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এক-আধটা স্পাইক সামান্য আলগা বা উঠে যাওয়ার ফলে কত ব্যাটসম্যান আউট হয়েছেন, বোলার ও ফিল্ডসম্যানের চোট লেগেছে, এমন কী হাঁটু ঘুরে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ইংলণ্ডের ক্যাপটেন স্বর্গত ডগলাস জার্ডিনের মুখে কথাটা শোনা। ১৯৩২-৩৩ সনের এম সি সি-র অস্ট্রেলিয়াতে সেই "বডি-লাইন" টুর, প্রখ্যাত ইংলণ্ডের বোলার মরিস টেট-এর পুরানো দিনের সংহার-মূর্তি নেই বটে, তবু "মরা হাতী লাখ টাকা।" জার্ডিন বললেন: "লাঞ্চের আগে মরিস এত খারাপ বল করল যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি।"

লাঞ্চের সময় জার্ডিন নাকি জিজ্ঞাসা করলেন: "ব্যাপার কী হে মরিস, বল যে একেবারে পড়ছে না?" টেট জবাবে হেসে বলেছিলেন: "সরি, স্কিপার, আমার বোলিং করার বুট-জোড়া হোটেলে ফেলে এসেছি!" আর যায় কোথা? টেট-কে তার পরে একটি ওভারও বল করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনার বহুদিন পরে কথাটা বলছিলেন জার্ডিন, কিন্তু তিনি টেট-কে তখনও ক্ষমা করতে পারেননি সেটা তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে বেশ বোঝা গিয়েছিল। ক্রোধ-ক্ষোভ-মিশ্রিত উত্তাপের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: "বুট হোটেলে ফেলে এসে বোলারের ক্রিকেট মাঠে নামা, আর রাইফেল ব্যারাকে ফেলে যোদ্ধার যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া একই কথা। 'এ্যবসোলিয়ুটলি ইররেসপনসিবল' একদম কাণ্ডজ্ঞানহীন।" এ মন্তব্য সমর্থনযোগ্য।

ফাস্ট-বোলারদের বুটের সামনের ভাগের সোলের পাশের দিক কোনও "মেটাল" বা ধাতু দিয়ে মুড়ে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাতে সোল তাড়াতাড়ি

ক্ষয়ে যাবে না ; বিশেষ করে এ কথা খাটে ফাস্ট-বোলারের বল দেবার পব পিছনের পায়ের সম্পর্কে, যেটা মাটিতে ঘষে টানা হয়—ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে "ড্র্যাগ"। যাঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়েসলী হলের বোলিং দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন "ড্র্যাগ"-এ বিশেষ করে বুড়ো আঙ্গুলের উপর কতটা ধকল পড়তে পারে। "টো" বা আঙ্গুলগুলির উপরে বুটের "চামড়া" শক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু খুব বেশী শক্ত নয়। ব্যাটিং-এর সময় অতর্কিতে ফুল টস বলে যাতে খুব বেশী আঘাত না হয় এমন শক্ত।

উঁচুস্তরের খেলোয়াড়রা অনেক সময় একাধিক রকমের বুট ব্যবহার করেন। ফিল্ডিং-এর জন্য হালকা বুট, যার সোলে ছোট ছোট অনেক "নেল" লাগান থাকে ; যাতে ঘাসের মাঠে বুট স্লিপ না করে। রাবার-সোলও ব্যবহার হয়, খাঁজ-কাটা সোল, গলফ-সু-তে যেমন থাকে। অনেকে বুটের মধ্যে বাড়তি পাতলা একটা "ইনার" সোল ব্যবহার করে থাকেন, যাতে শক্ত মাঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফিল্ডিং করলেও পায়ের উপর ধকল বেশী না পড়ে। পায়ে "কর্ণ" বা কড়ার জন্য শেষের দিকে সি কে নাইডুকে খাঁজ-কাটা রাবার-সোল বুটই পরতে দেখেছি। ব্র্যাডম্যান "রানিং স্পাইক" ছোট করে কেটে নিয়ে সোলে লাগিয়ে নিতেন। পছন্দমতো যে কোনও রকমের বুট, সোল, স্পাইক ব্যবহার করা যেতে পারে। লক্ষ্য করতে হবে ত্ব'টো জিনিষ। বুট পায়ে দিয়ে "কমফর্ট"। আর বুটজোড়া যেন টেঁকসই ও নির্ভরযোগ্য হয়।

মোজা

বুটের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য মোজা যেন পুরু হয়। মোজা পুরু হলে পায়ে আরাম হবে, ঐ কারণেই ত্ব'জোড়া মোজা অনেকে ব্যবহার করেন। এ সম্বন্ধেও কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যার যেমন সুবিধা সেইরকম করা উচিত।

ব্যাটিং-এর গোড়ার কথা

ব্যাটিং-এর টেকনিক্ বা শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করার আগে, ব্যাটিং সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। যে কোনও ক্রিকেট-শিক্ষার বইয়ের পাতা ওল্টালেই, ব্যাটিং সম্বন্ধে দু'টি উপদেশ প্রথম চোখে পড়বে; "কনসেনট্রেট" বা পূর্ণভাবে মনোনিবেশ কর: "ওয়াচ দি বল" অর্থাৎ বলটি তির্যক দৃষ্টিতে লক্ষ্য কর। ব্যাটিং-এর মূলমন্ত্র এই দু'টি কথাতেই। শেষ কথাও।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের সময় তিনি শিক্ষক, রাজগুরু দ্রোণাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে মাত্র পাখির চোখ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু পড়ে নি—গাছপালা, আকাশ, এমনকি পাখির চঞ্চু পর্যন্ত নয়। সি বি ফ্রাই-এর ক্রিকেট শিক্ষার বইয়ে লিখেছিলেন: "আমরা অনেকেই স্পিনবোলার বল করলে বলের "সীম্" দেখতে পেতাম কিন্তু রঞ্জি বল-সেলাইয়ের সুতো পর্যন্ত দেখতে পেতেন!" ব্র্যাডমান প্রমুখ অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানদের একই বিশেষত্ব। বোলার বল হাতে নেওয়া থেকে বল হাত থেকে ছাড়া পর্যন্ত, লক্ষ্য ছিল তাঁদের বল, বোলারের আঙ্গুল ও কব্জি, জগত-সংসারে আর সব কিছু তখন নিশ্চিহ্ন, বিলুপ্ত।

কনসেনট্রেট এবং বল ওয়াচ করলে ব্যাটসম্যানদের বহু সুবিধা। বোলার কি রকম বল দেবেন সেটা প্রায়ই আগে থেকে আঁচ করা যায়, ব্যাটসম্যানেরা সেই ভাবে তৈরী হতে পারেন। বোলারের বল দেওয়া হয়ে গেল, বল মাটিতে পিচ্ খেল, তারপর বলটার একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে যাওয়া মানে অকূল পাথারে ভাসা। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে, বোলারের বল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা সহজ, কোন্ বলটায় ব্যাক বা ফরোয়ার্ড খেলতে হবে, কোন্ বলটা মারবার এবং কোন্ স্ট্রোকে ও মাঠের কোন্ অংশে।

প্রসঙ্গত এখানেই বলে রাখি, ভাল ব্যাটসম্যান হতে হলে বোলারের কিন্তু ফিল্ড-সাজানো একবার মাত্র দেখলেও সেটা ছবির মতো মানসচক্ষে ধরে রাখতে হবে। তা না হলে, মারবার বল হরদম সজোরে মারা হল, কিন্তু সব মারই ফিল্ডসম্যানের হাতে, রানের নাম নেই। অথচ একটু এ-পাশ ও-পাশ বা "প্লেসিং" করে মারলে চার রান বাঁধা। সেখানেই "ফোটোগ্রাফিক্ মেমরি"-র

দরকার, যাতে একবার দেখে নিলে ভুল হবে না, ফিল্ডসম্যান কোথায় কোথায় দাঁড় করান হয়েছে।

বলেছি, বোলারের হাত ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে, আগে থেকে প্রায়ই আঁচ করা যায় বল কী রকম হবে। প্রায় বলেছি, কারণ সব ক্ষেত্রে—বিশেষ করে স্লো লেগব্রেক ও গুগলী বোলারদের—বল ঠিক বোঝ যায় না। বড় বড় লেগব্রেক ও গুগলী বোলারদের বিশেষত্বই এই যে, কোন্‌টা লেগব্রেক কোন্‌টাই বা গুগলী, সেটা গোপন করার চেষ্টা করেন এবং বহুক্ষেত্রে পারেনও। (বসোনকোয়েটে) প্রথম গুগলী বল প্রবর্তন করেন. সাউথ আফ্রিকার ভোগলার, স্কোয়ার্জ যেটাকে ভাল ভাবে রপ্ত করেন।

কিছুদিন পরেই ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকার টেস্ট খেলা, ইংলণ্ডের অধিকাংশ ব্যাটসম্যান সাউথ আফ্রিকার গুগলী বোলারদের খেলতে গিয়ে নাকানিচোবানি! "পারফেক্ট ব্যাটসম্যান" জ্যাক হবস এই ধাঁধাঁর উত্তর খুঁজে বার করলেন: "হাত তো দেখবেই; বল বোলারের হাত ছাড়ার পর কোন্ দিকে স্পিন করছে বা ঘুরছে সেটা নজর কর, হয় অফ-ব্রেক, নয় লেগ-ব্রেক অথবা টপ্‌-স্পিন, সেই বুঝে খেল।" অর্থাৎ ব্রেক ঐ তিন প্রকারের, গুগলী অর্থে লেগ-ব্রেক দেবার ভাণ করে আফ-ব্রেক দেওয়া (বোলিং-এর পরিচ্ছেদে এর খুঁটিনাটি বলব)। বলেই খালাস হব্‌স, কিন্তু সাধারণ ব্যাটসম্যান তো হব্‌স, রঞ্জি, ব্র্যাডম্যান নন! এসব অবশ্য উচ্চস্তরের ব্যাটিং-র কথা, ওয়াচ করার চূড়ান্ত উদাহরণ। কিন্তু মূল কথা স্মরণ রাখতে হবে: (১) কনসেনট্রেট (২) ওয়াচ দি বল।

ব্যাটিং-এ সাফল্য-মণ্ডিত হতে হলে দৃষ্টি-শক্তি যে প্রখর হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সে কথা না বললেও চলে। কিন্তু তির্যক দৃষ্টি শক্তি হলেই দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান হওয়া যাবেই, সে কথা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ভাল ব্যাটিং করতে হলে প্রখর দৃষ্টি-শক্তির সঙ্গে থাকতে হবে "রিফ্লেকস এ্যাকশন"—বাঙ্গলা অনুবাদে "প্রতিবর্ত্তী ক্রিয়া"।

সরল করে বলি। চোখ খুব ভাল, বোলারের বল হাত থেকে ছাড়া হল ব্যাটসম্যান সেটা দেখলেন। দু'রকম "প্রতিক্রিয়া" সচরাচর দেখা যায়। ভাল ব্যাটসম্যান বল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পলকে সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন, এগিয়ে বা পিছিয়ে বল আটকালেন বা মারলেন। আর এক শ্রেণীর ব্যাটসম্যান, চোখ বেশ ভাল, বল ঠিকই দেখলেন, কিন্তু "নট-নড়ন-চড়ন", শেষ পর্যন্ত

কষ্টে স্বষ্টে হয়তো বলটা আটকালেন। চোখে বল দেখার সঙ্গে সঙ্গে, এই "মেসেজ" বা খবর ব্রেনে যায়, তার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করা সম্ভব হয়। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যানদের এই "রিফ্লেকস"-এর গতি তড়িৎ বেগে, ফলে বলটি খেলার জন্য তাঁদের সময় অপেক্ষাকৃত বেশী। অন্য শ্রেণীর "রিফ্লেকস" তেমন দ্রুত নয়, বলটি খেলার জন্য তাই তাঁদের সময়াভাব, এবং এই সময়াভাবের দরুণই ভুলচুক হয় বেশী।

অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানদের খেলা দেখে তাই মনে হয় সময় যেন তাঁদের অফুরন্ত, তাড়া-হুড়োর নাম-গন্ধও নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ব্র্যাডম্যান, হবস, হাটন, কম্পটন, "রেজ" সিম্পসন (ইংলণ্ড), "বিল" ব্রাউন (অষ্ট্রেলিয়া), দলীপসিংজী, হ্যামণ্ড, স্যাণ্ডহ্যাম, হেডলী, দেওধর, নাইডু, হাজারে, মার্চেণ্ট, জার্ডিন, পতৌদির নবাব (স্বর্গত) ইত্যাদি। আর সমসাময়িক ক্রিকেটে মে, হার্ভে, এণ্ডিয়ান (সাউথ আফ্রিকা), বার্ট সার্টক্লিফ্ (নিউজীল্যাণ্ড), ওরেল, স্টলমায়ার, সোবার্স, কনট্রাক্টর, বেগ, হানিফ মহম্মদ—ইত্যাদি।

অসাধারণ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সকলেই অবশ্য সময় পান প্রচুর, কিন্তু মাত্র এমন কয়েকজনের নাম করলাম যাঁদের ব্যাক বা ফরোয়ার্ড খেলায়, স্ট্রোক মারায় এই ধীর-স্থির ভাব বেশ নজরে পড়ে। চেষ্টায় এর কিছুটা উন্নতি করা যায়, কিন্তু সত্যকার তড়িৎ-গতি "রিফ্লেকস এ্যাকশন" ভগবান-দত্ত। ভগবান এ ব্যাপারে মুক্তহস্ত হলে, তার উপর ব্যাটসম্যানদের সত্যকার সাধনা থাকলে, সকলেই হতেন রঞ্জি, ব্র্যাডম্যান, দলীপ, হব্স! "রিফ্লেকস" অসাধারণ না হয়ে সাধারণ বা চলনসই হলেও উচ্চস্তরের ব্যাটসম্যান হওয়া যথেষ্ট সম্ভব এবং বিশ্ব-ক্রিকেটে এমন ব্যাটসম্যানেরই প্রাচুর্য। অবশ্য সাধনা করলে।

প্রখর দৃষ্টিশক্তি এবং "রিফ্লেকস" ভাল হলে পলকে বল বিচার বা বাছাই করার স্থবিধা হয়। তার পর দু'টি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন। বল দেখার সময় ও খেলার সময় মাথা যেন বিশেষ না নড়ে-চড়ে; চোখ বল ওয়াচ করবে, কিন্তু মাথা নড়লে চোখও নড়বে, তার ফলে দৃষ্টিশক্তি যতই ভাল হক বল ভাল দেখা যাবে না, ঝাপসা হয়ে বাবে।

যেমন স্ট্যাণ্ডের উপর ক্যামেরা, "ফোকাস" সযত্নে করা হল, নিখুঁত—কিন্তু "এক্সপোজার" দেবার সময় স্ট্যাণ্ড নড়ে গেল, ছবি হল ঝাপসা। ফলে দামী শক্তিশালী লেন্স, এবং ব্যাটসম্যানের প্রখর দৃষ্টিশক্তি বিশেষ কাজে লাগবে না।

বল ঝাপসা হয়ে গেলে "আউট" হবার যথেষ্ট আশঙ্কা—একপ্রকার অনিবার্য। ইংরাজি রিপোর্টে পড়া যায়ঃ "হি ওয়াজ আউট ড্রাইভিং উইথ হিজ হেড হাই আপ ইন দি এয়ার"—অর্থাৎ ড্রাইভ করার সময় ব্যাটসম্যান বলের ওপর চোখ রাখেন নি, চোখ আকাশের দিকে, তাই আউট হলেন। নড়াচড়ার খেলা, মাথা একেবারে নড়বে না সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু খেলার সময় মাথাটা যতটা সম্ভব স্থির রেখে, চোখ বলের ওপর রাখতে চেষ্টা করতে হবে। কারণ চোখই বল "ফোকাস্" করে। সুতরাং ইংরাজিতে প্রচলিত কথাঃ "কীপ ইয়োর হেড ডাউন"—যার তাৎপর্য বলের ওপর চোখ রাখ।

বল ভাল করে দেখে, বল বিচার ও বাছাই করে ব্যাটসম্যানকে বলটি খেলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন "ফুট-ওয়ার্ক"। আগেই বলেছি, মূলত ব্যাটিং হাত-পা-চোখের খেলা। হাতে ব্যাট নিয়ে ব্যাটিং করা হয় বটে, কিন্তু চোখে ভাল না দেখতে পেলে, বা পা ঠিক মতো না এগোলে বা পিছোলে, হাতের ব্যাট হাতেই থাকবে, প্রায় ক্ষেত্রেই স্টাম্প ছিটকে যাবে, বা ব্যাট চালালেও অন্যভাবে আউট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ব্যাটিং-এর টেকনিক্ আলোচনার সময় "ফুট-ওয়ার্ক" সম্বন্ধে বিশদভাবে বলব, আপাতত দু'টি জিনিষের উপর জোর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত, ফরোয়ার্ড খেলার সময় বলের লাইনে খেলতে হবে, সেটা সম্ভব যদি বাঁ পা (ডান হাতে যাঁরা ব্যাটিং করেন) বল যে লাইনে আসছে তার কাছাকাছি এগোন যায়, ব্যাট পায়ের কাছে রেখেই। ব্যাক খেলতে পিছোতে হয় ডান পায়ে ভর করে, সেই বলের লাইনে, ব্যাট পায়ের কাছে রেখে, স্টাম্পের দিকে—লেগের দিকে নয়।

ব্যাটিং শিক্ষার শুরুতে, ব্যাটসম্যানদের ঝোঁক সাধারণত লেগের দিকে সরে যাওয়া—বিশেষ করে বল যদি ফাস্ট হয়। এই "টেনডেনসি" বা ঝোঁক সর্ব প্রকারে পরিত্যাজ্য, কারণ ঐ খানেই হয় ব্যাটিং-এর যাকে বলে গোড়ায় গলদ, যে দোষ থাকলে ভাল ব্যাটসম্যান হওয়ার কোন আশাই থাকে না।

কখন সখন দেখা যায় নাম করা ব্যাটসম্যানরাও ঐ দোষে দুষ্ট। কিন্তু তার কারণ অন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর চোট লাগার পর এই বদভ্যাস দেখা দেয়, যেমন হয়েছিল ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার বোওস-এর বাম্পার ওয়াজীর আলীর কপালে লাগার পর। হঠাৎ কোনও মানসিক আতঙ্কের পরও এটা সম্ভব। ইংরাজিতে "প্লেইং ডাউন দি লাইন"—বলের লাইনে ব্যাট

চালান—প্রায়ই শোনা যায়—যেটা ভাল ব্যাটিং-এর জন্য একান্ত প্রয়োজন। ফুট ওয়ার্ক-এর গুরুত্ব ঐখানে, কারণ ফুট-ওয়ার্ক বিনা প্লেইং ডাউন দি লাইন অসম্ভব।

চোখ এবং পায়ের কথা বলেছি, এবার হাত। ডান হাতে যারা ব্যাটিং করেন তাঁদের ডান হাত হ্যাণ্ডেলের নিচুতে, বাঁ হাত উপরে। বল ভাল করে ওয়াচ করে, যে স্ট্রোক করার সেটা মনস্থ করে, ফুটওয়ার্ক-এর সাহায্যে ব্যাটসম্যান পোসিশন্ নিলেন। এবার হাতের খেলা। সরল করে বোঝবার জন্য ধাপে-ধাপে, ভাগ করে পদ্ধতিগুলি বলেছি, কিন্তু এ-সবই হবে প্রায় "সিমালটেনিয়াস" বা যুগপৎ, একসঙ্গে। এ সম্বন্ধে ব্যাটের গ্রিপ সম্পর্কে আলোচনার সময় আরও বিস্তৃতভাবে কিছু বলব। কিন্তু কোন্ হাত—উপরের না নিচুর—দিয়ে ব্যাট "কণ্ট্রোল" বা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে ক্রিকেটের পণ্ডিতরা দ্বিমত।

আপাতত এইটুকু মাত্র বলব যে এ বিষয়ে গোঁড়ামি ভাল নয়। হাতের পাচটি আঙ্গুল সমান হয় না, ব্যাটসম্যানদের শুধু আকৃতি নয় প্রকৃতিও বিভিন্ন। বহু কৃতী ব্যাটসম্যান নিচুর হাত দিয়ে ব্যাট নিয়ন্ত্রণ করেন, নিচুর হাতের জোরেই বেশীর ভাগ স্ট্রোক, উপরের হাত ব্যাট সোজা রাখা ছাড়া বিশেষ কিছু করে না ; এ ধরণের ব্যাটসম্যান সাধারণত উইকেটের তুই পাশে স্ট্রোকে—যেমন কাট, হুক, পুল—পারদর্শী, তবু ড্রাইভ-এও তাঁরা দক্ষ হবেন না এমন কথা নয়। ১৯৩৩-৩৪ সনে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে এম সি সি দলের বিরুদ্ধে অমরনাথের চমকপ্রদ সেঞ্চুরী দেখেছি, তখন তাঁর নিচুর হাতই মুখ্য-পরিচালক তবু তাঁর ড্রাইভ-ও ছিল অপূর্ব, ব্যাকফুট-এ শুধু নয় ফ্রন্টফুট-এও। ডেনিস কম্পটনের সম্বন্ধে একই কথা খাটে, অল্পবিস্তর অস্ট্রেলিয়ার সিডনী বার্ণস এবং ভারতের বিজয় হাজারে সম্পর্কেও।

উপরের হাত (ডান হাতের ব্যাটসম্যানের বাঁ হাত) দিয়ে ব্যাট নিয়ন্ত্রণ বহু ব্যাটসম্যান করেন। শুধু ব্যাট সোজা রাখা নয়, মারের জোর বেশীর ভাগ ঐ হাত থেকেই, নিচুর হাত কিন্তু ঠিক অলঙ্কারও নয়, কাজ যথেষ্ট করে। এটা ব্যাটিং-এর "ক্ল্যাসিকাল স্টাইল" যেটা চোখে বিশেষ করে পড়ে যখন হাটন, ওরেল বা মে ব্যাট করেন। কিন্তু এই ক্ল্যাসিকাল স্টাইল-এর বহু প্রচলন ছিল ইংলণ্ডের ক্রিকেটের স্বর্ণযুগে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

অবশ্য সঙ্গত কারণেই নিজের চোখে সে যুগের ব্যাটসম্যানদের খেলা দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু সে যুগের, সেই স্বর্ণযুগের ক্ল্যাসিকাল স্ট্রেটড্রাইভ-এর, সে যুগেরই একজন প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান দ্বারা "ডেমনস্ট্রেশন" দেখার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৪৮ সন, ম্যানচেস্টারে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট, শনিবার রাত্রি, হোটেলের লাউঞ্জে মজলিশ বেশ জমেছে, মনে পড়ে ফ্রাই, টেট্, সাটক্লিফ, চ্যাপম্যান, মেলী, ম্যাকগিলভরী (রেডিও অস্ট্রেলিয়ার ভাষ্যকার) ও'রাইলী ইত্যাদি উপস্থিত। ক্রিকেটের আলোচনা অবশ্যই, সে যুগ ও এ যুগের খেলার তুলনা, শেষে "টপহ্যাণ্ড-কণ্ট্রোল"-এর স্ট্রেটড্রাইভ-এর প্রদর্শন !

দেখালেন সি বি ফ্রাই। ব্যাট ছিল না, কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল, বেশ ঠাণ্ডা, সামনে "ফায়ার-প্লেস", গনগনে আগুন, তার পাশে যথারীতি একটি "পোকার" মাঝারি সাইজের কোদালের মতো বস্তু যার কাজ সময়ে সময়ে আগুন উস্কে দেওয়া। "পোকার" হল ব্যাট, "ফায়ার-প্লেস"-এর লাগোয়া এক বিরাট আর্শি। ফ্রাই আর্শির সামনে দু'একবার ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ-এ "টপহ্যাণ্ড কণ্ট্রোল" দেখালেন, বাঁ হাত সর্বেসর্বা, নিচুর ডান হাত যেন মাত্র হ্যাণ্ডল ছুঁয়ে আছে।

তারপর স্ট্রেটড্রাইভ, মুখ্যত "টপহ্যাণ্ড-কণ্ট্রোল"-এ। শেষ, ফ্রাই-এর প্রিয় দু'টি "শোলডার", দু'টি কাঁধের জোরে, স্ট্রেটড্রাইভ, স্বর্ণযুগের বিশেষত্ব। প্রথমবার বেশ দেখালেন, "এনকোর" পড়ল, ফ্রাই আবার দেখাতে শুরু করলেন।

তার পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত : "পোকার" হাত থেকে ফস্কে গিয়ে সোজা আর্শির ঠিক মধ্যখানে (বাঁ বা "টপ-হ্যাণ্ড" কণ্ট্রোল ঠিকই হয়েছিল তার প্রমাণ !), ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙ্গে পড়ল, কয়লাকাঁচ একাকার, ভীষণ একটা আওয়াজ, "ওয়েটার-ওয়েট্রেস"-এর ছোটাছুটিতে তুমুল হট্টগোল। ফ্রাই কিন্তু নির্বিকার। হোটেল কতৃপক্ষ যখন ভাঙ্গা আর্শির ক্ষতিপূরণের জন্য বিলে মোটা টাকা চার্জ করেছিলেন তখন ফ্রাই-র ভাবান্তর হয়েছিল কি না জানা যায় নি। ফ্রাই আজ স্বর্গত, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। তাঁর ক্রিকেট খেলার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের তুলনা খুব কমই শুনেছি।

আগেই বলেছি দু'টি হাতেরই কার্যকারিতা আছে। মূলত খেলার ধারা যদি ঠিক হয়, কোন হাত ব্যাট নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে গোঁড়ামির কোন

বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দু'হাতেরই "কোঅরডিনেশন" সহযোজন হতেই হবে—অবশ্য সে "কোঅরডিনেশন" ব্যাটসম্যানের খেলার ধারার সুবিধানুযায়ী।

ক্রিকেট খেলার আলোচনায় প্রায় দু'টি কথা শোনা যায়—"টাইমিং" এবং "টেমপারামেণ্ট"। অমুকের সুন্দর টাইমিং বা অমুকের একেবারে টেমপারামেণ্ট নেই। ক্রিকেট-অর্থে এ দুটি শব্দের ঠিক সংজ্ঞা বাঙলা ভাষায় তো নেইই, ইংরাজিতেও কথা দু'টির ঠিক প্রতিশব্দ বোধ হয় নেই। ধরুন অফ্-এর একটা বল, ওরেল সাধারণ ভাবেই পা বাড়িয়ে অফ্ড্রাইভ করলেন, বলটা কিন্তু বুলেটের মতো বাউণ্ডারী পার হল, সজোরে ব্যাট হাঁকড়ানোর আভাষ মাত্র নেই। তাকে বলে "টাইমিং" যেটা স্ট্রোকের জন্য ঠিক "পোসিশন্" নিয়ে শেষ মুহূর্তে কব্জির যাহায্যে বিদ্যুতের গতিতে ব্যাট চালানোর ফলে হয়। এই টাইমিং—সহজাত, এক কথায় ভগবানের আশীর্বাদ। অনুশীলনের ফলে টাইমিং রপ্ত করা যায়, কিন্তু সহজাত টাইমিং-এর রূপই আলাদা।

"টেমপারামেণ্ট" অর্থ বাঙ্গলায় চলতি কথায় "মেজাজ"। কিন্তু ক্রিকেট এবং অন্যান্য খেলোয়াড়ের সম্বন্ধে কথাটার অন্য এক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে। সাধারণত বলা হয়—অমুক চমৎকার ব্যাটসম্যান, কিন্তু ওর 'বিগম্যাচ টেমপারামেণ্ট নেই—বড় ম্যাচে খেলবার টেমপারামেণ্ট নেই। আরবিতে "হিম্মত" এবং ইংরাজিতে "গাটস্"—টেমপারামেণ্ট-—এর অনেকটা কাছাকাছি আসে। পাড়ার অনেক "মস্তানের" হরদম মুখে খৈ ফোটে কিন্তু পাড়ার থিয়েটারে ছোট পার্টে দু'একটি কথা মাত্র স্টেজে বলতে গিয়ে হয় গলদঘর্ম; তেমনি নেটে অনেকে দুর্দান্ত ব্যাটিং বা বোলিং করেন, কিন্তু বড় ম্যাচে নামলেই হাত-পা পাথর, ব্যাট চলে না, বলও পড়ে না।

এটাও মনস্তত্ত্বের ব্যাপার, নেটে ব্যাটিং-এ ভুলচুক হলে চরম মূল্য দিতে হবে না, সেই ভরষায় ভুল তো হয়ই না, ব্যাটিং চমৎকার হয়। কিন্তু বড় ম্যাচে নামলে, চারিদিকে হাজার হাজার চোখ, একটি মাত্র ভুল করলেই চরম দণ্ড, সবকিছু মিলে আনে মানসিক ভীতি, হৃৎকম্প, যার ফলে এই শারীরিক জড়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা। কনসেনট্রেশন বলে কিছু থাকে না, ফলে যা হবার তাই হয়।

এ রকম বহু ক্রিকেটার দেখেছি। নেট প্র্যাকটিশে "বাঘ", বড় খেলায়

নামলে বলিদানের পাঁঠা। খালি বাইরেটা দেখলে সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। এমন দেখেছি, নামী-গুণী ব্যাটসম্যান, কিন্তু এত নার্ভাস যে ড্রেসিংরুমে প্যাডের ষ্ট্র্যাপ বাঁধতে অন্যের সাহায্য নিতে হয়; কিন্তু মাঠে একবার নামলে ভয়ডরের নাম মাত্রও নেই। অন্যদিকে, বেশ হাসিখুশী ব্যাটসম্যান, ভাবটা "এমন মার মারব যে বলের চামড়া তুলে দেব" কিন্তু গার্ড বা ব্লক্ নেবার সময় দেখেছি সেই বীর-শ্রেষ্টের হাত পা থরথর করে কাঁপছে!

কিন্তু এই টেমপারামেণ্ট নিয়ে নির্বাচকদের বাড়াবাড়িও হয়। চূড়ান্ত নিদর্শন "বিল্" এডরিচ, যিনি সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরের পর টেস্ট ম্যাচে রানের মুখ দেখতে পান নি। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল এডরিচের টেমপারামেণ্ট নেই। তারপর সেই সিরীজে সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই এডরিচ করলেন ডবল সেঞ্চুরী, পরে হলেন স্থায়ীভাবে ইংলণ্ডের টেস্ট ব্যাটিং-এর মেরুদণ্ডের একটি বিশেষ ও বিশিষ্ট অংশ।

তবে কথাটা মূলত সত্য। যথার্থ কৃতী ব্যাটসম্যান কিন্তু টেমপারামেণ্ট-এর অভাবে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি; অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্তরের ক্রিকেটারেরা কিন্তু হিম্মতের জোরে ক্রিকেটের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। যথোচিত চেষ্টা করলে তরুণ ক্রিকেটারদের এই মানসিক ভীতি জয় করা সম্ভব তাই এত কথা বলেছি। মন শক্ত করা, "স্টেজ-ফ্রাইট্" বা মঞ্চভীতি—দূর করা যায়, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। সম্ভব শুধু নয়, যথেষ্ট সম্ভব।

ব্যাটিং-এ, মূলত দুটি পদ্ধতি ফরোয়ার্ড বা ব্যাক, এগিয়ে বা পিছিয়ে, বলটি খেলা। যাঁরা ব্যাক খেলেন তাঁরাই জগতের অসাধারণ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে মেজরিটি। ব্যাক খেললে বল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়াচ করা যায় এবং সে কারণে ভুলের সম্ভাবনা কম। ফরোয়ার্ড খেলার সময় ব্যাটে-বলে হবার ঠিক আগে পলকের জন্য বল তেমনি স্পষ্ট দেখা যায় না, এবং সেই পলকেই অঘটন ঘটতে পারে, বল একটু ব্রেক, সুইং করে বা লাফিয়ে।

তাই, রঞ্জি তাঁর বইয়ে উপদেশ দিয়েছেন, ফরোয়ার্ড খেলা চলতে পারে এমন বলে, যেটা পিচ পড়ার সঙ্গেই মারা যায়, অর্থাৎ বলটি হাফভলি হলে; তা না হলে অন্য সব বলই ব্যাক খেলা বিধেয়। শুনেছি, রঞ্জি, ফ্রাই, ম্যাকলারেন, ট্রাম্পার, বার্ডস্‌লে (অস্ট্রেলিয়া), ইত্যাদি—সকলেই ব্যাক খেলতেন বেশী, ব্যাক খেলায় বিশেষ পারদর্শীও ছিলেন; দেখেছি, হব্‌স, হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইংলণ্ড), ম্যাকার্টনী, ব্র্যাডম্যান, ব্রাউন (অস্ট্রেলিয়া),

আর্থার মরিস (অস্ট্রেলিয়া), হেডলী, কম্পটন্, হাটন, ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, স্টলমায়ার, সোবার্স, দলীপ, পতৌদি, নাইডু, মার্চেণ্ট, অমরনাথ, হাজারে, হানিফ মহম্মদ, ইত্যাদি ব্যাক খেলতেন বেশী, পারতপক্ষে ফরোয়ার্ড খেলতেন না।

ব্যাক খেলা অর্থে শুধ্ "ডিফেনসিভ" বা আত্মরক্ষামূলক খেলা নয়। ক্ষেত্র-বিশেষে জগতের অতি অসাধারণ ব্যাটসম্যানকেও ডিফেনসিভ খেলতে হয়। কিন্তু এই ব্যাক খেলা "অ্যাটাকিং"—আক্রমণাত্মক, এবং সেটা শুধ্ উইকেটের দুপাশে বা পেছনে স্ট্রোক, কাট, হুক, পুল্, লেগগ্লান্স—মেরে নয়। ব্যাকফুট-এ পয়েণ্ট থেকে মিড-উইকেট পর্যন্ত চোস্ত ড্রাইভ, মর্জি মাফিক প্লেসিং। ভারতের মাঠে যেটা বিশেষ করে দেখিয়েছেন হার্ডস্টাফ (ইংলণ্ড), গ্রেভনী, অমরনাথ, ওরেল, উইক্স্, ওয়ালকট, সোবার্স, কানহাই, ও'নীল, হার্ভে, সৈয়দ আহমেদ (পাকিস্তান), বার্ট সাট্‌ক্লিফ ও জন রীড (নিউজীল্যাণ্ড), হ্যাসেট ইত্যাদি।

ভারতে একটা ভুল ধারণা—ব্যাক-প্লে মানেই ব্লক করে খেলা। অনেক দিনের কথা, বাঙ্গলার একজন সত্যই কৃতী ব্যাটসম্যান জার্ডিনের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে খেলে প্রায় চল্লিশ রানও করেছিলেন, তিনি ব্যাক খেলতেনই বেশী। রান যা—কাট, হুক, গ্লান্স করেই, কিন্তু সোজা বল অথচ খুব বেশী শর্ট নয় যাতে হুক্ করা সম্ভব, সেই বলেই তাঁকে আটকে রাখা হল, প্রায় "ডেড" ব্যাটে বল ফিরল বোলারের কাছেই হরদম।

খেলার পরে, তখন কলকাতার বাসিন্দা একজন বিশিষ্ট ইংরাজ ক্রিকেটার আক্ষেপ করেছিলেন: অমুক বেশ ভালই খেলল, যদি সোজা, সামান্য শর্ট বলগুলো শুধুমাত্র না ঠেকিয়ে একটু জোরে মারার চেষ্টা করত, খেলা দেখবার মতো হত। কিন্তু সেই সোজা, সামান্য শর্ট বলে হার্ডস্টাফ, অমরনাথ, ওয়ালকট, সোবার্স ইত্যাদি ব্যাকফুটে ড্রাইভ মেরে রানের বান ডাকাতেন। তাই, মনে রাখতে হবে ব্যাক-প্লে মাত্র ডিফেনসিভ নয় এ্যাটাকিং—আক্রমণের মহাস্ত্র—অন্তত হতে পারে।

যে দেশে যে ধরণের উইকেটের প্রাধান্য, উইকেট অনুযায়ী ব্যাটসম্যানরা গড়ে ওঠেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার উইকেট সাধারণত হার্ড এবং ফাস্ট—শক্ত এবং উইকেটে পড়ে বল জোরে আসে—তাই সেখানে উইকেটের সামনে স্ট্রোকে, অর্থাৎ ফ্রণ্টফুট এবং ব্যাকফুট ড্রাইভে বেশীর ভাগ ব্যাটস-

ম্যানই পারদর্শী। ইংলণ্ডের উইকেট অপেক্ষাকৃত নরম, বৃষ্টির পর উইকেট "ভেলকি" খেলে, অর্থাৎ বল বেশ "টার্ণ" করে বা বেঁকে, লাফায় এবং আরও অনেক কিছু করে। তাই দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ইংলণ্ডের সাধারণ কাউণ্টি ব্যাটসম্যানও অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বা ভারতের নামজাদা ব্যাটসম্যানদের থেকে টার্ণিং উইকেটে ভাল খেলেন। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানদের কথা স্বতন্ত্র; টার্নিং উইকেটে হাটনকে ব্যাট করতে দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা সে কথা স্বীকার করবেন। হাটনের বাঁ হাতে ব্যাট কণ্ট্রোল করে "ড্রপড রিস্টস"-এ বা কব্জি দুটি নিচু ও আলগা করে "ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ" খেলা সত্যই অনবদ্য।

যে কোনও খেলায় "এ্যাড্যাপটাবিলিটি" অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বিনা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করা যায় না। ক্রিকেট খেলাতেও তাই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতের ও অন্য দেশের অনেক ব্যাটসম্যান নতুন পরিবেশে, উইকেটের সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিজয় মার্চেণ্ট। ভিজে, টার্নিং উইকেটে ১৯৪৬ সনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে তাঁর অপূর্ব সেঞ্চুরী আজও চোখে ভাসে।

এ কথা শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে। ভারতে সূর্যকিরণের আধিক্যে সাধারণত উইকেট হার্ড। কিন্তু এমন কোনও নিষেধ নেই যে উইকেট জলে ভিজিয়ে এবং সামান্য এবড়ো-খেবড়ো রেখে অন্তত প্র্যাকটিশ করা চলবে না—ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে। এরই মাধ্যমে হবে বিভিন্ন উইকেটে ব্যাটিং ও বোলিং রপ্ত। বস্তুত কোনও বিশেষ সফরের আগে, বা কোনও বিশিষ্ট টাইপের বোলারের বিরুদ্ধে খেলার আগে এ ধরণের প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, ইংলণ্ডে সফরের আগে মাঠ ভিজিয়ে, পাকিস্তান সফরের পূর্বাহ্ণে ম্যাটিং উইকেটে প্র্যাকটিশের বিশেষ প্রয়োজন।

এই পরিচ্ছেদে অনেক কথা বলা হয়েছে যেটা শুধু শিক্ষার্থী নয়, "কোচ" বা শিক্ষকেরও স্মরণ রাখলে ভাল বই মন্দ হবে না। শিক্ষকতার প্রয়োজন আজ সর্ববাদিসম্মত, আমিও সে প্রয়োজন স্বীকার করি। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষকতার ব্যাপারে আমার আপত্তিও আছে। বহুদিন আগের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা ব্যক্ত করেছিলাম ১৯৪৫ সনে প্রকাশিত আমার একটি ইংরাজী পুস্তকে। সে অভিজ্ঞতা জানা থাকলে আমার আপত্তির কারণ বুঝতে সুবিধা হবে।

সন ১৯৩৫, মুখ্যত বাঙ্গলা দেশের খেলোয়াড়দের শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা, কাঠ-খড় পুড়িয়ে, ইংলণ্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার, পরে নামকরা কোচ, সারের "বিল" হিচ-কে কলকাতায় এনেছি। কোচবিহারের তরুণ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের অনুগ্রহে আলিপুরে তাঁর বিরাট প্রাসাদ "উডল্যাণ্ডস"-এর সংলগ্ন সুন্দর ক্রিকেট মাঠে কোচিং-এর ব্যবস্থা ; শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঙ্গলার বহু কৃতী এবং উদীয়মান ক্রিকেটার যাঁরা অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার পেরোতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ, বিল হিচকে আনা হয়েছিল "ইউনিভার্সিটী অকেসনলস্" ক্লাবের তরফ থেকে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন স্থঁটে ব্যানার্জি—ফাস্ট বোলার, ব্যাটও করেন ভাল। স্থঁটে ব্যানার্জি ব্যাট করছেন, একস্ট্রাকভারে ফরোয়ার্ড-ড্রাইভের শিক্ষা, "ফার্ম-ফুট"-এ বা পা মাটিতে শক্ত করে গেঁথে রেখে। চেষ্টা করা হচ্ছে অফ্‌স্টাম্পের ঠিক বাইরে হাফভলি বল দেওয়ার, বল দেওয়ার ঠিক আগেই বিল হিচ নাগাড়ে বলে চলেছেন: "রাইট ফুট স্টিল, লেফট-লেগ ফরোয়ার্ড ইন লাইন উইথ দি বল, লেফট-এলবো আপ্—ব্যাঙ্গ্!"—বা "ডান পা স্থিরভাবে গেড়ে রাখ (উহ্য: পাপিং-ক্রীজের ভিতরে), বলের লাইনে বাঁ পা এগোও, বাঁ হাতের কনুই উপরে রাখ (উহ্য: সোজা করে, বলের লাইনের উপরে)—সপাটে হাঁকড়াও!" (স্থঁটে ব্যানার্জি অবশ্য ডান হাতে ব্যাট করতেন)।

তথাস্তু। নির্দেশ মত স্থঁটে ব্যাঙ্গ্ করেছেন, কখনও ব্যাটে-বলে হচ্ছে, কখনও বা নয়—কিন্তু প্রায়ই হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন স্থঁটে, "চঞ্চল" "রাইট ফুট" বেইমানি করছে, স্টিল থাকছে না একদম। ফ্যাসাদে পড়লেন হিচ, তার পর একটা কাণ্ড করে বসলেন। একটা দড়ি যোগাড় করে স্থঁটের ডান পা বাঁধলেন, দড়ির অপর প্রান্ত নেটের পোস্টের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিলেন, ডান পা বন্দী হল। দু'একটা বল খেলা হল, তার পর একটা বল স্থঁটে সজোরে ব্যাঙ্গ্ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল স্থঁটে পপাতধরণীতলে। খাবি খাচ্ছেন, আটকে গেছেন নেটের জালে, বিরাট এক মাছের মতো। এমন অবস্থায়ও স্থঁটে সপ্রতিভ, চেঁচিয়ে হেঁসে বলছেন: বিল, এ কী রসিকতা? বন্দী অবস্থায় সেই ডান পা বিদ্রোহ করেছিল, নেট-পোস্ট সব উপড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে!

কোচের এ কী রসিকতা? সেদিনও বিল হিচ-কে বলেছিলাম,

আজও শিক্ষককুলকে উদ্দেশ করে বলব। বেশ কয়েকদিন লক্ষ্য করছিলাম হিচ-এর এই গোঁড়ামি। যা বলছিলেন তা ঠিকই, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে—অর্থাৎ উইকেট ফাস্ট হলে, বল মাটি থেকে বেশী দিক পরিবর্তন না করলে, বল ড্রাইভের উপযুক্ত হলে। কিন্তু সেদিনের উইকেট ভিজে, বল বেশ "টার্ন" করছে এবং অধিকাংশ শর্ট-পিচ, এ ক্ষেত্রেও সেই গোঁড়ামি, সেই "বাঁধাবুলি" অচল তো বটেই, অসহনীয়। কথাগুলি অবশ্য আড়ালে বলেছিলাম হিচ-কে। তা ছাড়া, সে সময়ে প্রায়ই ভাল, ফাস্ট উইকেটে ব্যাটিং করার ফলে, স্টে ব্যানার্জির "স্টান্স"-এই তখন বাঁ পায়ের উপর অত্যধিক জোর—সুযোগ হলেই ড্রাইভ করার জন্য—"রাইট ফুট স্টিল" থাকবে কী করে? গোড়ায় গলদ না শুধরে গ্রামোফোনের মতো বাঁধাবুলি বলে যাওয়ার কোনও সার্থকতা নেই।

মনে রাখতে হবে বিল হিচ ছিলেন নাম-করা কোচ। কিন্তু তাঁরই যদি এমন ভুল হয়—যার জন্য দায়ী, বোধ করি, ইংলণ্ডে ক্রিকেট শিক্ষকতার তৎকালীন "ডগম্যাটিসম" বা গোঁড়ামি—তাহলে এই ধরণের পাইকারী শিক্ষাধারার ফল সহজেই অনুমেয়। আবার বলি, শিক্ষকতার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই, অবশ্য সুশিক্ষকতা হলে।

সুশিক্ষকতার প্রথম কথা, শিক্ষক স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশের সাহায্য করবেন। সব তরুণ শিক্ষার্থীর "টেমপারামেণ্ট" এক হতে পারে না; কারও স্বভাবতই "এ্যাটাকিং", আক্রমণাত্মক মনোভাব, কারও বা "ডিফেনসিভ"—যেমন প্রথম দফায় ব্র্যাডম্যান এবং অন্য দফায় হাটন। ব্র্যাডম্যানের সহজাত স্ট্রোক-প্লে অবরোধ করে হাটন তৈরী করার চেষ্টা, এবং হাটনকে বলে-বলে রান করার উপদেশদান—তুইই সমান মারাত্মক ভুল। শিক্ষকতার মূল উদ্দেশ্য "স্টিরিওটাইপড"—একই ছাঁচে সব ব্যাটসম্যান তৈরী করা নয়, যেটা মস্ত ভুল। মানুষ আকৃতি প্রকৃতিতে বিভিন্ন, তাই ব্যাটিং বৈচিত্রময়। সুশিক্ষকের কাজ দেখে নেওয়া ব্যাটসম্যানের খেলার মূলনীতিতে কোনও ভুল থাকলে সেটা সংশোধন করা (অবশ্য "খোল-নলচে" না বদলে দিয়ে), কেতাবী খুঁটিনাটি নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে। সুশিক্ষকের মুখ্য কর্তব্য ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রকাশনে সহায়তা করা, "ইনডিভিজুয়াল জিনিয়াস"—ব্যক্তিগত বিশিষ্ট প্রতিভার টুঁটি চেপে মারা নয়।

তাই, ক্রিকেট শিক্ষকের প্রয়োজন শুধু ক্রিকেটের জ্ঞান নয়, বিচক্ষণতা—এক নজরে দেখে নেওয়ার ক্ষমতা, কোন্ শিক্ষার্থী কী ধাতুতে গড়া, কার কী

সম্ভাব্য এবং কোন্ দিকে তার ঝোঁক, সেই মতো সেই ধাতু মেজে ঘসে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ দিয়ে খাড়া করা। কাঁচ হাজার ঘসামাজা করলেও হীরে হবে না, আর হীরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও হীরেই থাকবে। আর একটা কথা, বিরাট খেলোয়াড় হলেই ভাল কোচ হয় না, বিচক্ষণতা দরকার। কম বয়সে শিক্ষার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক; অল্পবয়সের ভুলের উপর খেলার যাঁর ভিত্তি, পরিণত বয়সে সে ভুল সংশোধন বিশেষ কষ্টসাধ্য, প্রায় অসম্ভব।

নাম-কা-ওয়াস্তে কয়েক সপ্তাহর কোচিং-এ কোনও বিশেষ কাজ হয় না, কোচিং ব্যাপক হতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই "অতি" ভাল নয়, শিক্ষকতার এবং শিক্ষণের আধিক্যসম্বন্ধে সেই একই কথা। অনেকের ধারণা, ব্যাটসম্যান লম্বা হলেই সে হবে "এ্যাটাকিং", ব্যাটসম্যান বেঁটে হলে "ডিফেনসিভ"। এটাও মস্ত ভুল। ফুট-ওয়ার্ক-এ বেঁটে ব্যাটসম্যান "মারনেওয়ালা", ফুট-ওয়ার্ক-এর অভাবে সাড়ে ছ' ফুট লম্বা ব্যাটসম্যানও স্থাণুবৎ! এর উদাহরণ ক্রিকেটের ইতিহাসে ছড়াছড়ি।

ব্যাটিং-এর গোড়ার কথা মাত্র বলেছি। ভাল ব্যাটসম্যান ও ভাল বোলারের দ্বন্দ্বে, উভয় পক্ষেরই বুদ্ধি-বিচক্ষণতার একান্ত প্রয়োজন—একপ্রকার বুদ্ধির লড়াই। এখানেও মনস্তত্ত্বর প্রশ্ন রয়েছে। বড় ব্যাটসম্যান পারতপক্ষে বোলারকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দিতে নারাজ, বোলারও চাইবেন না ব্যাটসম্যানের আধিপত্য। তাই এই দ্বন্দ্ব।

সব কথা বলার শেষে একটি বিশেষ কথা স্মরণ করিয়ে দেব। প্র্যাকটিশ—অনুক্ষণ ও অক্লান্ত প্র্যাকটিশ বিনা সব শিক্ষাই হবে নিষ্ফল। কোন্ বল কী ভাবে খেলতে হবে সেটা মুখে শোনা যায়, ক্রিকেট শিক্ষার বইয়েও পড়া যায়। কিন্তু হাত-পা-চোখের সমন্বয়ে ব্যাটিং, ক্রমাগত অনুশীলন করলে যখন বল বিচার ও বাছাই, সেই মতো এগিয়ে পিছিয়ে খেলা এবং মারা স্বভাবজাত হবে, তখনই ব্যাটিং সাফল্যমণ্ডিত হবে। এ প্র্যাকটিশের সর্বসময়ে প্রয়োজন, সাফল্যের শিখরেও। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বহু টেস্ট-গ্রাউণ্ডে, প্র্যাকটিশ করার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, অবশ্য টেস্ট-গ্রাউণ্ডের অন্তরালে। সেখানে, সেই টেস্টে সাফল্যমণ্ডিত ব্যাটসম্যানদেরও ইনিংস শেষের অব্যবহিত পরেই, আবার প্র্যাকটিশ করতে দেখেছি। "প্র্যাকটিশ মেকস পারফেক্ট"—অনুক্ষণ অনুশীলনের ফলেই নিখুঁত হওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্যাটিং-এ অনুশীলন করতে হবে—সাধনা করতে হ'বে।

গোড়ার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দেব। ব্যাটের মুখ্য উদ্দেশ্য বল "হিট" করা, মারবার জন্য; ঠুক ঠুক করে "ব্লক" করা বা বল কোনও মতে আটকাবার জন্য ব্যাট তৈরী হয় নি। ব্যাট—ব্যাটিং এর—মূল তত্ত্ব এইই।

গ্রিপ

ব্যাট কী করে গ্রিপ করতে বা হাতে মুঠো করে ধরতে হয় (এবং তার সঙ্গে স্টান্স বা ব্যাটসম্যানের দাঁড়াবার ভঙ্গী), ক্রিকেট-অভিজ্ঞ মহলে প্রায় সর্ববাদিসম্মতি ক্রমে তার মডেল বা আদর্শ—স্যর জ্যাক হবস (ছবি অন্যত্র দেখুন)। ব্লেডের উপর দুই বা আড়াই ইঞ্চি ছেড়ে দিয়ে ডান হাতে হ্যাণ্ডল গ্রিপ করে, ডান হাতের উপর বাঁ হাত প্রায় লাগোয়া, একসঙ্গে। বাঁ হাতের "নাকল্স" বা চারটি আঙ্গুলের গাঁঠ, এবং কনুই মিড-অফ-এর দিকে; ব্যাট এভাবে ধরলে ডান হাত একেবারে ছেড়ে দিয়েও স্ট্রেট ব্যাট চালাতে সুবিধা হবে (অবশ্য ব্যাক লিফ্ট বা ব্যাট তোলা পরের পরিচ্ছেদে নির্দেশ মত হলে) বাঁ হাত ব্যাট নিয়ন্ত্রণ করবে, যে টপহ্যাণ্ড কণ্ট্রোল এর কথা আগের পরিচ্ছেদে বলেছি।

হাত দুটি কাছাকাছি রাখার পিছনে একটি বিশেষ কারণ, দরকার মত স্ট্রোকে দুটি হাতেরই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা যাবে যা সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় ড্রাইভ মারার সময়। হব্স লং-হ্যাণ্ডল ব্যাট ব্যবহার করতেন, হ্যাণ্ডল মোট ১২ ইঞ্চি, গ্লাভস পরা প্রমাণ সাইজের দুটি হাত প্রায় ৬-৭ ইঞ্চি দখল করে বসে, তাই হ্যাণ্ডলের নিচুতে ব্লেডের উপর প্রায় আড়াই-তিন ইঞ্চি ছেড়ে দিলে হবসের বাঁ হাত হ্যাণ্ডলের প্রায় ডগায় থাকত। গ্রিপ হিসাবে এটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। কিন্তু মনে রাখতে হবে হব্স প্রায় ছ'ফুট লম্বা ছিলেন, তাঁর স্টান্স যথাসম্ভব "আপরাইট" বা খাড়া ছিল।

স্যর জ্যাক হবসের গ্রিপ পৃথিবীর সর্বত্র বহুপ্রচলিত, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। কিন্তু "হব্স-গ্রিপ"-এর সামান্য অদল-বদল হলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোনও কথা নেই। গ্রিপ-এর ব্যাপারে মূল নীতি ঠিক থাকলে, ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা বড় কথা। মূল উদ্দেশ্য ব্যাটের কণ্ট্রোল, এবং মারের সময় মারের পিছনে জোর।

দু'হাত বেশ কাছাকাছি রেখে ব্যাট গ্রিপ করা যে ঠিক সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ব্যাট-কনট্রোল, বা বিশেষ কোন

স্ট্রোকের পিছনে জোরের জন্য, নিচুর হাত হ্যাণ্ডলের তলায় নিয়ে যান—এক-প্রকার নিজের অজান্তেই। এর বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু মাত্র দু'টি দেব।

ডঃ ডব্লিউ জি গ্রেস-কে অবশ্য চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নি, কিন্তু গ্রেস ব্যাক খেলার সময় প্রায়ই যে ডান হাত হ্যাণ্ডলের নিচুতে ব্লেডের কাছাকাছি নামিয়ে নিতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা দেখেছি গ্রেসের একাধিক ছবিতে, ক্রিকেটের অমূল্য সম্পদ বেল্ডহামের "গ্রেট ব্যাটসমেন" নামক এক ক্রিকেট খেলার বইয়ে, যাতে গ্রেস-রঞ্জি-ট্রাম্পার-ম্যাকলারেন-স্পুনার-ম্যাকার্টনী-বার্ডসলে-ফ্রাই-হেওয়ার্ড প্রমুখ ব্যাটসম্যানের টিকাসমেত "এ্যাকশন" ফোটোগ্রাফের ছড়াছড়ি। দুঃখের বিষয়, এমন শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আজ বহুদিন হয়নি। প্রসঙ্গত, "গ্রেট বোলারস" নামে আর একটি বইও ছিল। তাতেও ছিল অপূর্ব রত্নসম্ভার।

ব্র্যাডম্যানকে চোখে দেখেছি, ব্যাক-প্লের সময় প্রায়ই ডান হাত হ্যাণ্ডল-এর বেশ নিচুতে, বিশেষ করে কাট মারার সময়। হব্‌স ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ খেলার সময়, নিচুর হাত অনেক নামিয়ে নিতেন অনেক সময়, কিন্তু উপরের হাতই বেশীর ভাগ কাজ করত।

গ্রিপ-এর ব্যাপারেও গোঁড়ামি যে সব সময়ে বিজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, সে-সম্বন্ধে দু'একটি উদাহরণ দেব। ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ খেলার সময় পিটার মে বাঁ হাতের কব্জি হ্যাণ্ডল-এর সামনে রাখেন না, হ্যাণ্ডল-এর পিছনে ঘুরিয়ে নেন। ব্র্যাডম্যানের গ্রিপ স্বতন্ত্র, উপরের হাতের "নাকল্‌স" মিডঅফ-এর দিকে নয়, বরঞ্চ কভার পয়েণ্টের দিকে, গ্রিপ হ্যাণ্ডল-এর পিছনে না হলেও আড়াআড়িভাবে। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের তুলনা একমাত্র ব্রাডম্যানই, সনাতন পদ্ধতি থেকে তাঁর খেলার কলাকৌশল বহুক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র, সুতরাং ব্র্যাডম্যানের নজীর দেব না। "ব্র্যাডম্যান ওয়াজ এ ল আনটু হিমসেল্‌ফ" যার তাৎপর্য ব্র্যাডম্যানের ক্রীড়া পদ্ধতি তিনি নিজেই গড়তেন।

গ্রিপ-এর ব্যাপারে ডেনিস কম্পটনের স্বাতন্ত্র্য ছিল—না "হবস-গ্রিপ" না "ব্র্যাডম্যান-গ্রিপ"—ডান হাতের গ্রিপ বেশ জোরে, তার ঠিক উপরে বাঁ হাতের নাকল্‌স কভার-পয়েণ্টের দিকে, অনেকটা ব্র্যাডম্যানের মতোই আড়া-আড়ি ভাবে। কিন্তু সে-কারণে কম্পটনের স্ট্রোকের বহর কিছু কম ছিল না।

তবে ব্যাটিং শিক্ষার জন্য "মডেল" হিসাবে হবসের গ্রিপ-ই সবের ভাল।

অবশ্য হবসের মতো বাঁ হাত হ্যাণ্ডলের ঠিক ডগায় নয়, ইঞ্চি খানেক বা দেড়েক নামিয়ে, ডান হাত কিন্তু বাঁ হাতের লাগোয়া। এ-বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। তরুণ শিক্ষার্থীকে ব্যাট দিলে দেখা যাবে, নিচুর হাতটা হ্যাণ্ডলের একেবারে নিচুতে, বাঁ হাত হয় একেবারে ডগায় না হয় বড় জোর হ্যাণ্ডলের মাঝামাঝি। হ্যাণ্ডলের একেবারে নিচুতে ধরা "ইনস্টিংকটিভ" বা সাহজিক। কারণ, ব্যাট বেশ বাগিয়ে ধরা যায় ও ইচ্ছামত চালানো যায়, যেটা ব্র্যাডম্যান প্রমুখ ব্যাটসম্যান ব'লন ব্যাট "কণ্ট্রোল" বা বা নিয়ন্ত্রণ।

একেবারে নিচুতে দু'হাত কাছাকাছি থাকলে মারের জোর হয়ত সমানই হবে, কিন্তু ফুল-সাইজ ব্যাটের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা দাঁড়াবে মাত্র ২৪।২৫ ইঞ্চি। সে-ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই, বিশেষ ফরোয়ার্ড খেলার সময়; বলের নাগাল পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে। আর এক হাত একেবারে হ্যাণ্ডলের নিচুতে, অন্য হাত ডগায় হলে, ফরোয়ার্ড-ড্রাইভের সময় শুধু মারের জোর হবে না তা নয়, ব্যাট স্ট্রেট বা সোজা থাকার সম্ভাবনা কম, ব্যাট বেঁকে যাবে বা "ক্রশ" হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ব্যাটিং-এর সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে "স্ট্রেটব্যাট"।

স্টান্স

"স্টান্স" বা ব্যাটসম্যানের ক্রীজে দাঁড়াবার ভঙ্গীর বিষয়েও স্যর জ্যাক হবসের স্টান্স আদর্শ বলে বিবেচিত হয় সেকথা আগেই বলেছি। ডান বা পিছনের পা, পপিং ক্রীজের লাইনের দু' আড়াই ইঞ্চি ভিতরে; বাঁ বা সামনের পা পিছনের পা থেকে প্রায় ছ'ইঞ্চি এগিয়ে, অর্থাৎ পপিং ক্রীজের তিন-চার ইঞ্চি সামনে, দাঁড়াবার সময় দু'টি পায়ে সমান ভার, গোড়ালীর উপর নয় পায়ের পাতার উপর। সামনের পায়ের বুটের "টো" কভারের দিকে, পিছনের পায়ের বুটের টো পয়েন্ট বা সামান্য ডান দিক ঘেঁসেও। ব্যাট রাখতে হবে পিছনের বুটের টো ছুঁয়ে বা সামান্য পিছনে (ব্যাটসম্যানের ব্লক অনুযায়ী) লেগ স্টাম্প, "টু-লেগ" (লেগ এ্যাণ্ড মিডল স্টাম্পস) বা মিডল স্টাম্পের উপরে। ব্যাটস-ম্যানের দু'টি টো লেগ স্টাম্পের ঠিক উপরে বা সামান্য বাইরে রাখা যুক্তিযুক্ত।

মডেল গ্রিপ-এর কথা আগেই বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী ব্যাটের হ্যাণ্ডল

গ্রিপ করে, উপরের নির্দেশ মতো পপিং ক্রীজের দু'পাশে দু'পা রাখলেই, ব্যাটসম্যানের বাঁ কাঁধ বোলারের দিকে হয়ে যাবে, এবং মাথা এমন পসিশনে যাবে যে দু'টি চোখেই স্পষ্ট ভাবে বোলারকে দেখা যাবে।

ব্যাট নিয়ে দাঁড়াবার সময় একদম সোজা বা খাড়া হয়ে দাঁড়ান বা ব্যাটের ওপর কুঁজো হয়ে দাঁড়ান—কোনটাই ঠিক নয়। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, *কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে, যেটা সম্ভব হবে হাঁটু সামান্য একটু মুড়ে বা ভেঙ্গে* নিলে। ব্যাটিং গ্লাভস বাঁ প্যাডের হাঁটুর উপরের অংশে আলতোভাবে ভর করলে আপত্তি নেই, কিন্তু সাবধান হতে হবে ব্যাট যাতে প্যাডে আটকে না যায়। বোলার বল দেবার আগে বহু ব্যাটসম্যান কুস্তিগীরদের "পাঁয়তাড়া কষার" মত ব্যাট মাটিতে এক-আধবার ঠুকে নেন, যেটা হয়ত মুদ্রা-দোষ (কখনও কখনও বা উদ্বেগের চিহ্নও), কিন্তু তাতে প্যাডে ব্যাট আটকাবার ভয় কম।

প্রত্যেক নির্দেশের অর্থ আছে। দু'পায়ের পাতার উপর সমান ভার রাখার উদ্দেশ্য যাতে বল অনুযায়ী ব্যাটসম্যানের সামনে বা পিছনে নড়া-চড়া পলকে সম্ভব হয়। বাঁ পা বা সামনের পায়ের বুটের টো কভারের দিকে রাখার উদ্দেশ্য যাতে ফরোয়ার্ড খেলার অফ-এর বা সোজা বলে, বলের লাইনের দিকে পলকে পা (তার সঙ্গে ব্যাট) এগোবার সুবিধা হয়। আর পিছনের পায়ের বুটের টো পয়েন্ট এমন কি থার্ডম্যানের দিকে রাখার ফলে, কাট বা লেট-কাট মারার সময় পিছনের পা বলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে প্রয়োজন, তাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। মূলত ব্যাটিং-এর স্ট্রোকের দু'টি ভাগ করা যায়—ফরোয়ার্ড এবং ব্যাক। সুতরাং স্টান্স বা দাঁড়াবার ভঙ্গী এমন ভাবে করা হয় যে অল্প আয়াসে, পলকে পা দু'টি "করেক্ট" বা ঠিক ভাবে চালানর—ফুট ওয়ার্ক-এর—সুবিধা হয়। পিছনের পা ক্রীজের অন্তত দু'ইঞ্চি ভিতরে রাখার অর্থ, ফরোয়ার্ড খেলার সময় ডান পা সামান্য ঘসড়ে এগিয়ে গেলেও স্টাম্প হবার ভয় থাকে না।

নির্দেশমত স্টান্স নিলে, ব্যাটসম্যানের চোখ "ব্লক-হোল"-এর বা "গার্ড"-এর উপর থাকবে, তাতে বলের দিক-নির্ণয়ের সুবিধা হবে। স্টান্সের ব্যাপারেও মূলনীতি মনে রেখে, সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রসঙ্গত, ব্র্যাডম্যান বাঁ পা পপিং ক্রীজের "প্যারালাল" বা সমান্তরাল রাখতেন, ব্যাট পিছনের পায়ের সামনে।

অনেক ক্রিকেট শিক্ষার বইয়ে বলা হয় "ওয়ান-আইড" স্টান্স এবং

"টু-আইড" স্টান্স। ওয়ান-আইড স্টান্সের আক্ষরিক অর্থে বোঝায়, এমন দাঁড়াবার ভঙ্গী যাতে মাত্র এক চোখে বলটা দেখা যায়। কথাটা বাড়াবাড়ি, তু'চোখ থাকতে, স্বেচ্ছায় ব্যাটসম্যান "একচক্ষু হরণি" হতে যাবেন কেন? আর বলা বাহুল্য এক চোখে তু'চোখের মত বল পরিস্কার দেখাও যায় না। ওয়ান-আইড স্টান্সের তাৎপর্য ব্যাটসম্যানের বাঁ কাঁধ বোলারের দিকে, যে পোসিশন থেকে অফ-ড্রাইভের বিশেষ সুবিধা হয়, কিন্তু তু'চোখেই বল দেখেন তাঁরা! টু-আইড স্টান্সের তাৎপর্য, ব্যাটসম্যান সামান্য ঘুরে দাঁড়ান, ব্যাটসম্যানের বুক বোলারের দিকে। টু-আইড স্টান্সের ব্যাটসম্যান সাধারণত অন-সাইডে বেশী খেলেন। ধরুন, ডান হাতের বোলার "রাউণ্ড-দি-উইকেট" বা বোলারের দিকের উইকেটের ডান পাশ দিয়ে বল করছেন; তখন স্টান্স নিতে গেলে তথাকথিত ওয়ান-আইড ব্যাটসম্যানকে বল ভাল করে দেখার জন্য বোলারের দিকে "ফেস" করে বা ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যেটা বলা যেতে পারে টু-আইড স্টান্সের ব্যাটসম্যানের সাধারণ স্টান্স। এভাবে দাঁড়াতে হলে, স্বভাবতই বাঁ পায়ের টো মিড-অফ এমন কি বোলারের দিকে, ডান পায়ের টো প্রায় কভার-পয়েণ্টের দিকে, সুতরাং অন-সাইড স্ট্রোকের জন্য ব্যাটসম্যান প্রায় আগে থেকেই তৈরী। মোট কথা, স্টান্স যেরকমই হক তু'চোখ দিয়ে বল দেখতে হবে, এক চোখে নয়।

আর একটা কথা। অনেক ব্যাটসম্যানের ফার্স্ট বা প্রাথমিক স্টান্সে অনেক বিচিত্র জিনিষ সময় সময় দেখা যায়। যেমন, "মুদ্রাদোষ" বা অন্যান্য কারণে গ্রেস বা হব্‌স বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর, টো শূন্যে! কিন্তু বোলার বল দেবার আগে বা সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাটসম্যানদের শরীরের ভার সরিয়ে নেওয়া হত পায়ের পাতার উপর। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রামচাঁদের প্রাথমিক ব্যাটের উপর কুঁজো হয়ে ভর করে স্টান্স, এক কথায় কদর্য, দৃষ্টিকটু; কিন্তু বোলার বল দেবার ঠিক আগেই রামচাঁদ অনেকটা সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এই "সেকণ্ডারী" বা দ্বিতীয় স্টান্সই আসল। তবু মুদ্রাদোষ বা অন্য কারণ বশত প্রাথমিক স্টান্সে কোনও গলদ না রেখে, প্রথম থেকেই স্টান্স যথাসম্ভব নিখুঁত করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ব্যাটিং-এ "অধিকন্তু" সর্বসময়ে পরিত্যাজ্য।

ব্যাক-লিফ্‌ট

ব্যাটের "ব্যাক-লিফ্‌ট" বা বোলারের বল ছাড়ার মুহূর্তে বা সামান্য আগে ব্যাটসম্যানের পিছনে ব্যাট তোলা-র উপর স্ট্রেট ব্যাট চালানো নির্ভর করে।

এবং স্ট্রেটব্যাট ব্যাটিং-এর সাফল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সেকথা আগেই বলেছি। বিশেষ করে ডিফেনসিভ বা আত্মরক্ষামূলক খেলার সময়।

জগতের সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে খেলতে দেখেছি, "গ্রেট ব্যাটসম্যান" নামক বইয়ে আগের যুগের বহু বিরাট ব্যাটসম্যানের এ্যাকশন ফোটোগ্রাফও। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই দেখেছি ব্যাট তোলা হয় সামান্য অফ-এর, স্লিপ-ফিল্ডসম্যানের, এমন কি থার্ডম্যানের দিকেও। তাতে আপত্তি নেই, দু'এক ক্ষেত্রে তাতে সুবিধাই, যেমন কাট ও হুক বা পুল মারার সময়। আসল কথা ব্যাট তোলার সময় নয়, ব্যাট নামার সময় স্ট্রেট বা সোজা থাকে কি না তার উপর লক্ষ্য রাখা।

বহু ক্রিকেট শিক্ষার পুস্তক, বা কোচের মতানুযায়ী ব্যাট পিছনে তুলতে হবে একেবারে সোজা, স্টাম্পের উপরে। এতটা গোঁড়ামি, কড়াক্কড়ির কোনও প্রয়োজন নেই, বরং তাতে বিপত্তি হতে পারে, ব্যাটসম্যান হিট-উইকেটও হতে পারেন। সাবধান হয়ে ব্যাট পিছনে সোজা তুলতে পারলে ভালই, ফার্স্ট বা সেকণ্ড স্লিপের দিকে তুললে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। নামাবার সময় ব্যাট যেন সোজা থাকে।

ব্যাট তোলার উদ্দেশ্য ব্যাট চালাবার স্বাচ্ছন্দ্য, এবং মারের সময় মারের পিছনে জোর। "গার্ড"-এ ব্যাট স্থানুবৎ রেখে, তার পর বল মারার চেষ্টা করলে, ব্যাট পিছনে তোলার প্রয়োজন ও সার্থকতা বোঝা যাবে। ব্যাট বেশী তোলা, একেবারে কাঁধের উপর, যুক্তিযুক্ত নয়, বিশেষ করে ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে, কারণ ব্যাট নামাতেও সময় লাগে। আর অল্প তুললেও মারের জোর সাধারণত তেমন হবে না, ব্যাট সব সময়ে সোজাও না থাকতে পারে। "সাধারণত" কথাটা ব্যবহার করেছি কারণ অল্প লিফটেও মারের জোর বেশ ছিল এমন ব্যাটসম্যান বহু, যেমন ভারতের স্বর্গত সৈয়দ ওয়াজীর আলি। ব্যাট বেশী তোলার বিপদের প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে পূর্ববঙ্গের দুই "ভোলা"—ময়মনসিংহের ভোলা ও ঢাকার ভোলা—বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ছিলেন। ঠিক স্মরণ নেই, কিন্তু বোধ হয় ঢাকার ভোলা, তাঁর স্টান্স-ই আকাশচুম্বী ব্যাক লিফট সমেত, যেন তর সয় না বল মাঠের বাইরে হাঁকড়াতে। স্বর্গত প্রিয়কান্তি সেন বেশ জোর বল করেন, বোধ হয় সুঁটে ব্যানার্জির থেকেও কিছু জোরে—তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকার ভোলা ব্যাট করছেন, ব্যাট নামানো আর হল না, স্টাম্প ছিটকে গেল!

আবার বলি, ব্যাক লিফট-এ উনিশ-বিশ হলে ক্ষতি নেই, সার কথা নামাবার সময় ব্যাট সোজা রাখা। ব্যাটিং-এর টেকনিক কেতাদুরস্ত হল—গ্রিপ, স্টান্স, গার্ড, ব্যাক লিফট—কিন্তু সব কিছু মনে রাখতে গিয়ে আসল জিনিষই হল না, অর্থাৎ ব্যাটে-বলে, এর কোনও অর্থ হয় না। মুখ্য উদ্দেশ্য বল ব্যাট দিয়ে মারা, তাই যদি না হয় টেকনিক-এর সার্থকতা থাকে না।

স্ট্রেট ব্যাটের উপর যথেষ্ট জোর দিয়েছি, এবং চিরদিনই দেব। প্রসঙ্গত একটি কথা বলব। তখন কলেজে, কলকাতায় বং বিখ্যাত ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেটার, তার মধ্যে স্বর্গত এলেক হোসি। কথায় কথায় স্ট্রেট ব্যাটের কথা। হোসি বললেন: "চোখ যতক্ষণ না 'সেট' হচ্ছে ততক্ষণ স্ট্রেট ব্যাট, একবার 'সেট' হলে যেমন খুশী সেই ভাবেই খেলবে।" চোখ সেট অর্থে বল ভাল করে দেখতে পাওয়া। হোসির কথাটা হয়ত একটু বাড়াবাড়ি কিন্তু এই বাড়াবাড়ি প্রায় সব বড় ব্যাটসম্যানই করে থাকেন পৃথিবীর সর্বাংশে। যেমন ব্র্যাডম্যান, কম্পটন, মিলার, ওরেল, নাইডু ইত্যাদি। তাতেই ফুটে উঠত তাঁদের ব্যক্তিত্ব। তবে তরুণ শিক্ষার্থীদের এ উপদেশ ভুলে যাওয়াই ভাল, অন্তত শুরুর দিকে।

ব্যাট সোজা নামাতে হবে এই কথা মাত্র স্মরণ রেখে, সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক ভাবে ব্যাট পিছনে লিফট করাতে সামান্য তারতম্যে কিছু এসে যায় না। বলা বাহুল্য গ্রিপ, স্টান্স ও গার্ড আগের নির্দেশ মতো হলেই ব্যাক লিফট-ও ঠিক হবে।

গার্ড বা ব্লক

গার্ড বা ব্লক নেওয়ার মানে ঠিক করা ব্যাট কোথায় রাখতে হবে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য বলের দিক-নির্ণয় করা—কোন্ বলটা অফ-এর বাইরে, কোন্টা সোজা, কোন্টাই বা লেগের বাইরে। সাধারণত লেগ-স্টাম্প, টু-লেগ, লেগ-এ্যাণ্ড-মিডল বা মিডল স্টাম্পে গার্ড নেওয়া হয়। স্টান্স নেবার সময় ব্যাটসম্যানের পা দু'টি লেগ-স্টাম্প বা সামান্য বাইরে রাখলে, প্যাডের উপর বল বা লেগের বাইরে, সেটা বুঝতে সুবিধা হয়। কোন ব্লক ঠিক তা ব্যাটসম্যানের বিচারের, তাঁর সুবিধার উপর নির্ভর করবে।

আম্পায়ারের কাছে গার্ড নিয়ে সাধারণত ব্যাটসম্যানের বুটের স্পাইক দিয়ে দাগ কেটে নেওয়া হয়; ম্যাটিং উইকেট হলে চক বা খড়ি দিয়ে। সন্দেহ হলেই

গার্ড আবার নতুন করে নেওয়া উচিত, সেজন্য ইতস্তত করার কোনও কারণ নেই। মাটিতে দাগ মিলিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, তাছাড়া অন্য ব্যাটসম্যান —বিশেষ করে ন্যাটা ব্যাটসমানের গার্ড-এর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। আর ম্যাটিং-এ খড়ির দাগের তো কথাই নেই। লজ্জা বশত সন্দেহ সত্ত্বেও গার্ড যাচাই করে না নিলে আফশোষেরই কারণ হবে। কমপাস বা দিঙনির্ণয় যন্ত্র বিনা জাহাজ ভাসে অকুল পাথারে, ঠিক দিক নির্ণয় না করতে পারলে ব্যাটসম্যানের অবস্থাও তথৈবচ। ভারতের ১৯৪৬ সনের ইংলণ্ড সফরে বিজয় মার্চেন্টের মত অতি-সাবধানী ব্যাটসম্যানও একবার ঐ ভুল করেছিলেন ; ফরোয়ার্ড লেগ-গ্লান্স করতে গিয়ে বল ফস্কে গেলেন, লেগ স্টাম্প ছিটকে গেল ! পরে জানা গিয়েছিল, মার্চেন্টের গার্ড গুলিয়ে গিয়েছিল।

বলেছি, গার্ড সাধারণত লেগ থেকে মিডল স্টাম্প নেওয়া হয়। বহু বছর আগে কলকাতায় আর এল ওডহাউস নামে এক বোলার স্লো-মিডিয়াম "পেস"-এ (মিডিয়াম পেস থেকে সামান্য আস্তে) সাংঘাতিক ইন স্যুইং বল করতেন, তাছাড়া তিনি বিশেষ কিছু বড় দরের বোলার ছিলেন না। তিন জন শর্ট-লেগ ফিল্ড সাজিয়ে বল করতেন, শর্ট লেগ-এ ক্যাচ দিয়ে বহু ব্যাটসম্যান আউট হতেন।

ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের আই পি এফ্ ক্যাম্পবেল বললেন : "ওডহাউসের বিরুদ্ধে অফ-এ্যাণ্ড-মিডল স্টাম্প গার্ড নেওয়াই উচিত। অফ-এর বাইরের ইন স্যুইং বলের রীচ্ (নাগাল) পেতে সুবিধা হবে, বেগতিক দেখলে বল ব্যাটে না খেলে প্যাডে আটকালে আউট হবার ভয় নেই (তখন লেগ-বিফোর উইকেটের "নতুন" আইন হয়নি, অফ-স্টাম্পের বাইরে বল পিচ পড়ে উইকেটে লাগা নিশ্চিত জেনেও আউট দেওয়া হত না) ; আর ওডহাউসের ইন স্যুইং এত বেশী হয় (বা হাওয়ায় অফ থেকে লেগের দিকে এত বেশী ঘোরে) যে হাত থেকে ছাড়ার সময় বলের ডিরেকশন বা গতি যদি সোজা স্টাম্পের দিকে হয়, সে বল সপাটে হাঁকড়ালে এবং ফস্কে গেলেও, বল স্যুইং করার দরুণ স্টাম্পে লাগার কোনও সম্ভাবনা নেই। আস্তে ফরোয়ার্ড খেলে অফ স্টাম্পে বোলড বা শর্ট লেগ-এ "খোঁচা" দেওয়ায় কোন মানে হয় না। পরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বহু বড় ব্যাটসম্যানকে "টার্নিং" উইকেটে অফ ব্রেক বোলারদের বিরুদ্ধে অফ-এ্যাণ্ড-মিডল গার্ড নিতে দেখেছি, "নতুন" লেগ-বিফোর-উইকেট আইন প্রবর্তনের পরেও।

এ গার্ড অবশ্য সাধারণত নেওয়া হয় না—একপ্রকার "ক্ষেত্রে কর্মে বিধয়তে"। যেমন শুনেছি ১৯২১ সনে ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার গ্রেগরী ও ম্যাকডোনাল্ডের বিরুদ্ধে জ্যাক হব্‌স পপিং ক্রীজের হাত-খানেক বাইরে গার্ড নিতেন; এগিয়ে দাঁড়াবার ফলে হবসের ফরোয়ার্ড খেলার সুবিধা হত, আর বোলার ফরোয়ার্ড খেলার বল না দেবার মনস্থ করলে বল এত শর্ট হত যাতে কাট বা বাম্পারে হুক করার সুযোগ হত। ক্রীজের বাইরে দাঁড়ালে স্টাম্প হবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ উইকেটকীপারের বহু পিছনে দাঁড়াবার রেওয়াজ ছিল এবং এখনও আছে।

এ উদাহরণ অবশ্য উঁচুস্তরের ব্যাটসম্যান ও বোলারের "বুদ্ধির লড়াই"-এর পর্যায়। যেমন স্বয়ং স্বর্গত ডগলাস জার্ডিনের নিজের মুখে শুনেছিলাম ব্র্যাডম্যানের সম্পর্কে। এম সি সি-র ১৯৩২-৩৩ সনের অষ্ট্রেলিয়ার সফরে "বডি-লাইন"—ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ফাস্ট বোলিং-এ "লেগথিয়োরী"—বল লেগ-স্টাম্পে বা লেগের বাইরে, তার মধ্যে বাম্পারের মাত্রাধিক্য, ফিল্ডসম্যান বেশীর ভাগই লেগ সাইডে।

ব্র্যাডম্যান এর উল্টো চাল চালনেন, স্টাম্প একদম খালি রেখে, লেগের বেশ বাইরে গার্ড নিয়ে। উদ্দেশ্য, ব্যাকফুটে ড্রাইভ বা কাট মেরে অফ্ সাইডে রান করা যেখানে ফিল্ডসম্যানের সংখ্যা নাম মাত্র। এ পদ্ধতি যে সমূহ বিপজ্জনক তাতে সন্দেহ নেই, তবে যাকে বলেঃ "বিষস্য-বিষৌসধম"। ব্র্যাডম্যানের টেস্টে রানসংখ্যা সেবার আশানুযায়ী না হলেও, বিশেষ কমও হয়নি, আউট না হয়ে এক ইনিংসে ১০৩ করেছিলেন। ব্র্যাডম্যানের পদানুসরণ করে ১৯৪৯ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই-এর ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার প্রায়র জোনস ও জন ট্রিম-এর ফাস্ট লেগথিয়োরীর বিরুদ্ধে পঞ্চাশের উপর রান করে ভারতকে জয়ের পথে এনেছিলেন। মাত্র দু'রান বাকী, হাতে দু'টি উইকেট ঠিক সেই নাটকীয় মুহূর্তকাল ভারতের পক্ষে "কাল" হল, খেলা হল সাঙ্গ, ভারতের জয়ের আশা নির্মূল করে!

ভারতের প্রখ্যাত ব্যাটসম্যান মুস্তাক আলী, কখন কোন্ স্টাম্পে গার্ড নেন, ক্রীজের কত বাইরেই বা দাঁড়ান, বোলার বল দেবার আগেই অফ-এ বা লেগ-এ সরে দাঁড়ান--তার হদিস কেউই বিশেষ পেতেন না। অনেকেই হয়তো মুস্তাক আলীর বোলারকে এই "ভড়কি" দেওয়া দেখেছেন। কিন্তু

এ-সব মুস্তাকেরই মানাত, অসামান্য ফুট-ওয়ার্ক এবং প্রখর দৃষ্টিশক্তির ফলেই এ ধরণের ক্রিকেট খেলার টেক্‌নিক-এর নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ সম্ভব হত। সাধারণ ব্যাটম্যান এ চেষ্টা করলে বলে বলে স্টাম্প ছিটকে যাবার যথেষ্ট ভয়। সুতরাং, তরুণ শিক্ষার্থীদের সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী গার্ড বা ব্লক নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

ফুট-ওয়ার্ক

ভাল ব্যাটসম্যানদের খেলা দেখে মনে হয় ব্যাটিং এমন কিছু শক্ত জিনিষ নয়, বরং অতি সহজ। কোনও তাড়াহুড়ো নেই, অনায়াসে বল আটকাচ্ছেন বা স্ট্রোক মারছেন—খুশী মতো। আর এক প্রকার ব্যাটসম্যান দেখা যায়, "যায় যায়" অবস্থা, কোনও মতে বল আটকাচ্ছেন, মারের বল হয়তো মারছেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সব সময়ে ব্যাটের বা ব্লেডের মধ্যখান দিয়ে নয়, কানায় বা ব্যাটের তলা দিয়ে ; মারের জোর হয় না, বল মাটি থেকে উঠে যায়, আউট হয় কি না হয়।

প্রথমোক্ত ব্যাটসম্যানের ফুট-ওয়ার্ক বা বল-অনুযায়ী পা যথাস্থানে ঠিক সময়ে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি নির্ভুল। অফ্-এর সামান্য বাইরে হাফ ভলি, সুদক্ষ ব্যাটসম্যান বাঁ পায়ে জোর রেখে বলের লাইনে এগিয়ে নিলেন, ব্যাট পায়ের কাছাকাছি, ড্রাইভ মারলেন, বল বিদ্যুৎ গতিতে মাটির সঙ্গে যেন "লেপটে" কভার বাউণ্ডারী পার হল, মনে হল এ অবার শক্ত কী? ঠিক সেই বলেই, আর একজন ব্যাটসম্যান বাঁ পা এগোলেন না অথবা এগোলেও বলের লাইন থেকে আধহাত দূরে, হুমড়ি খেয়ে ব্যাট চালালেন, হয় ব্যাটে-বলে হল না, অথবা স্রেফ চোখের জোরে বলটা মারলেন কিন্তু ব্যাটের কানা দিয়ে, মারের জোর হল না, মাটি থেকে উঠে গেল। কভারে "লোপ্পা" ক্যাচ উঠল। তখন মনে হবে ব্যাটিং কী শক্ত জিনিষ।

প্রথমোক্ত ব্যাটসম্যানের ফুট-ওয়ার্ক সঠিক ; অন্য ব্যাটসম্যানের হয় ফুট-ওয়ার্ক বলে কিছু নেই, যদি বা থাকে সেটা ভুল।

বলা বাহুল্য, শুধু ফুট-ওয়ার্ক হলেই হবে না, ফুট-ওয়ার্ক বোলারের বলের গতি অনুযায়ী হতে হবে, এবং বল বিচার বা বাছাই ঠিক করে করতে হবে। সরল করে বলি। ফরোয়ার্ড খেলার উপযুক্ত সোজা একটা বল, প্রায় হাফ-ভলি, বিচারের ভুলে ব্যাটসম্যান ব্যাক খেললেন, সময় পেলেন না বলটা

সামলাতে, হয় লেগ-বিফোর-উইকেট (এল বি ডাব্লিউ) নয় বোল্ড; নিখুঁত ভাবে ব্যাক খেলার ফুট-ওয়ার্ক সত্ত্বেও বিচারের ভুলে ব্যাটসম্যান আউট হলেন। তেমনই, ব্যাক খেলার বল ঠিকই, ব্যাটসম্যান সঠিক ফুট-ওয়ার্ক করে ডান পা পিছিয়ে নিলেন, ব্যাট পায়ের কাছাকাছি—সবই ঠিক করলেন কিন্তু ধীরে, অতি ধীরে। বল পিচ্ পড়ে তীব্র গতিতে ইতিমধ্যে স্টাম্পের দিকে, ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগল, ব্যাটসম্যান আউট হলেন—এল বি ডব্লিউ। সুতরাং সঠিক ফুট-ওয়ার্ক হলেই চলবে না। বং ঠিকভাবে বাছাই করতে হবে, বলের গতির সঙ্গে ব্যাটসন্যানের ফুট-ওয়ার্ক-এর তালে তাল রাখতে হবে। অন্যথায়, পুঁথিগত নিভুর্ল ফুট-ওয়ার্কও হবে নিষ্ফল। ফুট-ওয়ার্ক-এ ব্যাটসম্যানের "গজেন্দ্রগমন" হলেও বিপদ, অন্যপক্ষে অতিমাত্রায় "তড়ি-ঘড়ি"-তেও একই সঙ্কট। যেমন, অফ্-এর সামান্য বাইরে হাফ ভলি, ব্যাটসম্যান অতি মাত্রায় ব্যস্তবাগীশ হয়ে আগেই ব্যাট চালালেন, বলের তলায় ব্যাট লাগল, ক্যাচ উঠল একস্ট্রা কভারে। সুতরাং, দু'টি কথা মনে রাখতে হবে; ঠিকভাবে বল বাছাই, এবং বলের গতির সঙ্গে তাল রেখে সঠিক ভাবে ফুট-ওয়ার্ক করতে পারলে ব্যাটিং মনে হবে সহজ, অন্যথায় নয়। ভাল ব্যাটিং করতে হলে সব কিছুরই প্রয়োজন যা আগে বলা হয়েছে, তবে তুলনামূলক বিচারে ফুট-ওয়ার্ক-এর গুরুত্ব অবিসংবাদিত।

রিফ্লেক্স-এর তারতম্যের উপর ব্যাটসম্যানের নড়া-চড়া নির্ভর করে সে কথা আগে বিশদ ভাবে বলেছি। কিন্তু রিফ্লেক্স অসামান্য, এমন কি সাধারণ না হলেও চলনসই ব্যাটসম্যান হওয়া যেতে পারে ফুট-ওয়ার্ক ভাল ভাবে, অনবরত প্র্যাকটিশ করলে। তার প্রমাণ, এককালে ভাল ব্যাটসম্যান, চোখের জ্যোতি আর তেমন নয়, বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু তবু ভালই খেলছেন। যেমন আমাদের সি কে নাইডু বা ডি বি দেওধর, পঞ্চাশোর্দ্ধেও যাঁরা ভালই ব্যাটিং করতেন। অবশ্য চোখের দৃষ্টি তেমন প্রখর না থাকায়, কাট্ বা হুক বেশী মারতেন না, নির্ভর করতেন বেশী ড্রাইভ-এর উপর। বলা বাহুল্য বার্ধক্যের দ্বারে তাঁদের রিফ্লেক্সও তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু সে-অবস্থায়ও তাঁদের ব্যাটিং সাফল্যের পিছনে ছিল সেই ফুট-ওয়ার্ক যেটা বহু অনুশীলনের ফলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, প্রায় মজ্জাগত। তাই, ফুট-ওয়ার্ক-এর উপর এত জোর।

ব্যাক-প্লে ডিফেনসিভ

ব্যাটিং-এ সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে ডিফেন্স বা আত্মরক্ষামূলক খেলা অপরিহার্য। ডিফেন্স দু' রকম ভাবে করা যায়, ফরোয়ার্ড ডিফেন্স বা পিচের মাথায় বলটি এগিয়ে খেলে আটকানো ; এবং ব্যাক ডিফেন্স বা বল পিচ পড়ার পর স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে গিয়ে রোখা। আগেই বলেছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যাক খেলার উপর তাঁদের ব্যাটিং-এর ভিত্তি গড়ে থাকেন, কারণ ব্যাক খেলা ফরোয়ার্ড খেলার থেকে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত, ভুলচুক হবার সম্ভাবনা কম। তবে তাঁদের ব্যাক খেলা অর্থে মাত্র ডিফেনসিভ বা আত্মরক্ষামূলক খেলা নয়, ব্যাক খেলা ভিত্তি করে এ্যাটাকিং বা আক্রমণাত্মক খেলাও। তবে এই পরিচ্ছেদে ব্যাক ডিফেন্স-এর কথাই বলব যেটা, আগেই বলেছি, ব্যাটিং সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। "ফাউনডেশন" বা ভিত শক্ত না হলে যেমন বিরাট প্রাসাদ ধ্বসে-ভেঙ্গে যেতে পারে, ডিফেন্স নিখুঁত না হলে ব্যাটসম্যানের পতনও যে কোনও মুহূর্তে সম্ভব।

ঠিকমত ব্যাক খেলার বল বাছাই করে, ব্যাটসম্যানের সচেষ্ট হওয়া উচিত যাতে ব্যাটের ব্যাকলিফট যথাসম্ভব সোজা হয়, ব্যাট নামবার সময় ডান পায়ের প্যাড ঘেঁসে থাকে ; সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ডান পা বলের লাইনের পিছনে স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে নিতে হবে, ডান পায়ে শরীরের বেশীটা ওজন ভর করে, বাঁ পা ডান পায়ের পাশে রেখে, উইকেট সম্পূর্ণভাবে "কভার" করে বা ঢেকে রেখে।

সম্পূর্ণভাবে ডিফেনসিভ ব্যাক খেলার সময় যখন বল আটকানোই মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ডান হাত হ্যাণ্ডল-এর নিচুতে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে গ্রিপ করাই সঙ্গত, যার ফলে ব্যাট কনট্রোল ব্যাটসম্যানের "নর্ম্যাল" গ্রিপ-এর থেকে অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হয়। লেগ-এর বা অফ-এর বল পিচ পড়ার পর সোজা আসবে এমন কোনও কথা নেই, সাধারণত ব্রেক বা টার্ন করে ; এই ব্যাক বা টার্ন অনুযায়ী ব্যাট সরিয়ে বল ব্লেডের মধ্যখানে খেলার জন্য ডান হাত যথেষ্ট সহায়তা করে, এই ডিফেনসিভ ব্যাক খেলায় বাঁ হাতের কাজ নাম মাত্র। যে ক্ষেত্রে বলটা আটকানোই একমাত্র উদ্দেশ্য, রানের কোনও আশা নেই, সে ক্ষেত্রে বল ব্যাটে লাগার ঠিক আগে ব্যাটের গতিরোধ করতে হবে। যে উইকেটে বল বেশী টার্ণ করছে, সেখানে গ্রিপ আলগা করা বিধেয়, যাকে বলে "ডেড"-ব্যাট ; ব্যাট অবশ্য "মরে না", কিন্তু ব্যাট ইচ্ছা করেই করা হয়

নিশ্চল, নির্জীব যার ফলে ব্যাটের কোন মুভমেণ্ট বা গতি থাকে না। ডেড ব্যাটের সুবিধা এই যে বল ব্যাটে লেগে ব্যাটের সামনেই পড়ে, ব্যাটের সামান্য গতি থাকলেই, বল ব্যাটে লেগে কাছাকাছি ক্যাচ ওঠার আশঙ্কা। অবশ্য ডেড ব্যাটের প্রয়োজন যে উইকেটে বল বেশী টার্ণ করে বা হঠাৎ লাফায়।

ব্যাট তোলা, নামান, ডান পা পিছিয়ে নেওয়া বাঁ পা কাছাকাছি রেখে, ডান হাত হ্যাণ্ডলের নিচুতে নামিয়ে নেওয়া— এ সবই একসঙ্গে বা যুগপৎ করতে হবে। বলা হয়তো অবান্তর যে বল ভাল ভাবে ওয়াচ করতে হবে, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় "কীপিং দি হেড ডাউন"। নির্দেশ মত ডিফেনসিভ ব্যাক খেললে ব্যাটসম্যানের ডান পায়ের বুটের টো পয়েণ্ট বা কভার, বাঁ পায়ের বুটের টো কভার বা মিড অফ্-এর দিকে হবে।

ব্যাক খেলায় সাধারণ ত্রুটির মধ্যে পপিং ক্রীজের উপরই দাঁড়িয়ে খেলা; যত বেশী সময় বলটা দেখা যায় ততই ব্যাটসম্যানের ভুল হবার ভয় কম, এবং স্টাম্পের দিকে পিছনে দেড় দু' ফুট যাওয়া কম সুবিধার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, ডান পা পিছিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পা দিয়ে উইকেট সম্পূর্ণ কভার না করা যার ফলে বল বেশী টার্ণ বা সুইং করলে বোল্ড হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, যেখানে রান পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, সম্পূর্ণ ডিফেনসিভ ব্যাক খেলা, সে ক্ষেত্রে ব্যাটে বলে হবার সময় অমনোযোগিতা বা অন্য কোনও কারণে ব্যাটের "ফলো থ্রু" বা বলটি খেলার সময় ব্যাট সামনের দিকে ঠেলার সাধারণ ঝোঁক রোধ না করা।

এই অমনোযোগিতা বা অজ্ঞতার জন্য বহু ব্যাটসম্যানকে টেস্ট ক্রিকেটে— বিশেষ করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে আউট হতে দেখেছি। ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। ১৯২৯ সন, দিল্লীর রোশানারা গ্রাউণ্ডে অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট, কলকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের খেলা বিজয়নগরের মহারাজকুমারের দলের বিরুদ্ধে—এক কথায় সর্ব ভারতের বাছাইকরা দল। ম্যাটিং উইকেট, ওপেনিং ব্যাটসম্যানের মধ্যে একজন আমি, বিরুদ্ধে বোলারদের একজন বেশ ফাস্ট, নাম সাহাবুদ্দিন; অন্যদিক থেকে তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত একজন মিডিয়াম-স্লো ন্যাটা বোলার, প্রোফেসর এস এস জোশী, দুর্দান্ত লেট (শেষ মুহূর্তে) ইন সুইং, তার মধ্যে এক একটা ন্যাটা বোলারদের সহজাত লেগব্রেক।

নতুন বল আর নতুন নেই, "কয়ের" ম্যাটিং-এ বল অপেক্ষাকৃত বেশী লাফায়, টার্ন-ও করে। বুঝে বুঝে বেশ খেলছি, জোশী নিয়েছেন দু'টি স্লিপ এবং গালী—গালী-তে স্বনামখ্যাত সি কে নাইডু। জোশীর দুর্দান্ত লেন্থ, পর পর দু'বার ডিফেনসিভ ব্যাক খেলেছি, ব্যাটের মধ্যখানে বল, ব্যাটের সামনে ফুট খানেকের মধ্যে পড়ছে। মাত্র একটিবার অসতর্ক মুহূর্তে সামান্য "ফলো-থ্রু", হতবাক হয়ে দেখলাম একজোড়া লম্বা কালো হাত ব্যাটের মুখ থেকে বল লুফে নিলেন মাটিতে শুয়ে পড়ে! ভদ্রলোককে অবাক হয়ে দেখলাম, কালো, ছিপছিপে গড়ন, ছ'ফুটের উপর লম্বা—নাম সি কে নাইডু !!

বহু ব্যাটসম্যান, বিশেষ করে তরুণ ব্যাটসম্যানদের "ফ্লারিশ," ব্যাটিং-এ স্ট্রোক করার পর অকারণ একটা আড়ম্বর দেখানোর ঝোঁক থাকে, তার ফলে যেখানে "ফলো-থ্রু" নিষিদ্ধ সেখানেও অজান্তে একআধবার হয়ে যায়, আমার যেমন হয়েছিল, যা উত্তর কালে দেখেছি অনেকেরই হয়েছে। এমন অনেক ব্যাটসম্যান দেখা যায়, যাঁরা স্ট্রোক করার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত সেই পোজ বা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকেন, ভাবটা যেন "ক্যামেরাম্যানকো বোলাও" —অর্থাৎ "ফ্লারিশ"-এর চূড়ান্ত। সত্যই সমঝদার দর্শকদের ক্রিকেট মাঠে এর থেকে দৃষ্টিকটু দৃশ্য, বোধ করি, আর নেই।

তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, এ ধরণের ফ্লারিশ শুধু অবান্তর নয়, ব্যাটসম্যানের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার স্মরণ করিয়ে দেব ব্যাটিং-এ সুদক্ষ হতে হলে ডিফেনসিভ ব্যাক খেলা রপ্ত করতে হবে। কথায় বলা হয়ঃ "এ্যাটাক্ ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স।" এ কথার তাৎপর্যের অনুমোদন- করি, তারিফও করি; কিন্তু বোলাররা মাঠে ঘাস বাছতে নামেন না, তাঁদের লক্ষ্য ব্যাটসম্যানের উইকেট, এমন বল করেন যা মারা অসম্ভব, আটকাবার জন্যও নির্ভুল ডিফেন্স অত্যাবশ্যক। তাই, সাধনার দ্বারা ডিফেন্স নিখুঁত করার প্রয়োজন।

আমাদের সময় সে যুগের বাঙ্গলা দেশের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান কার্তিক বোসকে বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাক ডিফেন্স, ফরোয়ার্ড ডিফেন্স ও অন্যান্য স্ট্রোক করতে দেখেছি। সত্যকার শিক্ষাব্রতীদের তখন এবং তার পরেও দেখেছি। ১৯৪৮ সনে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের টেস্ট উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট অলরাউণ্ডার এ্যাল্যান ফেয়ারফ্যাক্স-এর সঙ্গে আলাপ লীডসের হেডিংলী মাঠে, ইংলণ্ডের এক কাগজে টেস্ট সমীক্ষা করার জন্য। তখন লণ্ডনে তাঁর "ফেয়ারফ্যাক্স ক্রিকেট স্কুল" প্রখ্যাত। কিশোর বয়সে ফেয়ারফ্যাক্স কোচ-

বিহারের মহারাজাকে "কোচ" করেছিলেন, সেই সুবাদে আলাপ। লণ্ডনে তাঁর স্কুল দেখতে গিয়ে অনেক কিছুই দেখেছিলাম, তার মধ্যে বিরাট এক আয়না। তার সামনে কয়েকটি সোজা লাইন টানা, তরুণ শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে নিখুঁত ভাবে বিভিন্ন স্ট্রোক প্র্যাকটিশ করার জন্য। ফেয়ারফ্যাক্স আজ স্বর্গত, তিনি বলেছিলেন: "ইফ্ ইউ ওয়াণ্ট টু বি পারফেক্ট ইন ইয়োর স্ট্রোক-প্লে, ইউ মাস্ট প্র্যাকটিশ বিফোর এ মিরর। আই ডিড ইট মাইসেলফ ফর আওয়ার্স।" অর্থাৎ স্ট্রোক ত্রুটিহীন করতে হলে আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিশ করতে হবে, তিনিও তাই করতেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের এ উপদেশ আমিও দেব।

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ

ক্রিকেটের অমর ব্যাটসম্যান রঞ্জি উপদেশ দিতেন, কার্যত নিজেও সেই পন্থা অবলম্বন করতেন: যতটা সম্ভব ব্যাক খেলা, পারতপক্ষে ফরোয়ার্ড না খেলা; কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বল অনুযায়ী ফরোয়ার্ড খেলা যখন অপরিহার্য, তখন ব্যাটসম্যানের অবশ্য কর্তব্য পিচের মাথায় এগিয়ে বলটি "হাঁকড়ানো", ড্রাইভ করা—পিচ পড়ার পর বল যেন এঁকে-বেঁকে বা লাফিয়ে ব্যাটসম্যানের কোনও বিপদ না ঘটায়।

এ হল অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি, রিফ্লেকস, ফুট-ওয়ার্ক, অভ্রান্ত বিচারশক্তি—এক কথায় অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির কথা। রঞ্জির উপদেশ মতো যথাসম্ভব কাজ করতে পারলে কথা নেই, কিন্তু অতি সাধারণ ব্যাটসম্যানের পক্ষে সেটা সম্ভব হয় না। ব্যাটসম্যানের ডিফেন্স-এ—ব্যাক ডিফেনসিভ খেলার মতো ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ অপরিহার্য।

ধরুন বল স্টাম্পের উপর গুড লেন্থ-এর সামান্য এগিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে। এমন বলে ব্যাটসম্যান স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে ব্যাক খেললে সময় পাওয়া যাবে না, বলটা হাফভলিও নয় যে ড্রাইভ করা যায়। এর উপর উইকেট যদি টার্নিং হয় বা বল যদি বেশী সুইং করে, তাহলে ব্যাটসম্যানের চিন্তার কারণ আরও বেশী।

একমাত্র উপায় ফরোয়ার্ড খেলে বলটা আটকানো। বলের লাইনের দিকে বাঁ কাঁধ ও কনুই, তার সঙ্গে ব্যাটসম্যানের শরীর, ব্যাট এবং বাঁ পা এগিয়ে নিয়ে, বলের উপর তির্যক দৃষ্টি রেখে (কীপিং দি হেড ডাউন), বলটি খেলতে

হবে। ব্যাট হতে হবে একদম "পার্পেণ্ডিকুলার", ব্যাটের হ্যাণ্ডেল এগিয়ে ও ব্লেড ব্যাটসম্যানের শরীরের দিকে পিছিয়ে, যাতে বল ব্যাটে লেগে মাটিতে পড়ে, অন্যথায় বল উঠে গিয়ে ক্যাচ-এর যথেষ্ট সম্ভাবনা। বল খেলার সময় ব্যাট বাঁ প্যাডের সামান্য এগিয়ে থাকবে, কিন্তু ব্যাট ও প্যাডের মধ্যে "গ্যাপ" বা ফাঁক একদম যাতে না থাকে সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে ফাঁক থাকলে বলে সামান্য টার্ণ বা সুইং থাকলে (বিশেষ করে অফব্রেক ও ইনসুইং), বল ব্যাট ও প্যাডের ফাঁক দিয়ে "গলে" গিয়ে ব্যাটসম্যানের বোল্ড হবার বিশেষ ভয়—একপ্রকার অনিবার্য।

বাঁ পা এগিয়ে, বাঁ পায়ের উপর শরীরের ভর, বাঁ হাঁটু সামান্য মুড়ে বা ভেঙ্গে নিলে সুবিধা হবে ; ডান পা পপিং ক্রীজের ইঞ্চি ছয়েক ভিতরে গেড়ে বা গেঁথে রাখতে হবে। ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলতে গিয়ে নানা কারণে, বিশেষ সামান্য লেগব্রেক, আউটসুইং করলে বা বল হঠাৎ লাফালে, ব্যাটসম্যানের অনেক সময়ে ব্যাটে বলে হয় না , ডান পায়ের টো পপিং ক্রীজের ভিতরে গেড়ে রাখলে, ব্যাটসম্যান বল ফস্কে গেলেও, স্টাম্প হবার ভয় থাকবে না। তাই, এই সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন।

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ উপরের বা বাঁ হাত ব্যাটের দিকনির্ণয় কনট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র , নিচুর বা ডান হাতের গ্রিপ-ই বেশী কায করে, ব্যাটসম্যানের অভ্যাসমতো গ্রিপ নিচুতে নামতে পারে, কনট্রোলের জন্য গ্রিপ ঘুরিয়ে নেওয়া হয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, নিজে নিজেই ঘুরে যায় যার ফলে ব্যাটসম্যানের বুড়ো আঙ্গুল হয় বোলারের দিকে, তার সঙ্গে প্রথম দু'টি আঙ্গুল। নিচুর হাতের গ্রিপ বল খেলার সময় জোর না করে আলতো ভাবে রাখা বিধেয়। ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার সময় ব্যাট চালানোর পিছনে মারের জোর আদৌ থাকবে না, ব্যাটে বলে হবার সময় বা পরে "ফলো-থ্রু" (আগের পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য) তো নয়ই। কারণ ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার সময় ব্যাটের পিছনের সামান্য শক্তি বা জোর, বিশেষ করে "ফলো-থ্রু" হবে মারাত্মক , উপরের নির্দেশ মতো ব্যাটের হ্যাণ্ডল এগিয়ে, ব্যাটের ব্লেড স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে রাখার তাৎপর্য বল মাটিতে রাখা, অসতর্কতা বা ভুলক্রমে "ফলো-থ্রু" হলে, সে উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ, বল ব্যাটে লাগার সময় ব্যাট যদি বোলারের দিকে উঠে যায়, তাহলে ক্যাচ উঠবেই উঠবে।

গ্রিপ-এর "টপহ্যাণ্ড" বা উপরের হাত সনাতন পদ্ধতিতে রাখা বিধেয়

(*গ্রিপ-এর পরিচ্ছদ দ্রষ্টব্য*)। *কিন্তু আগেই বলেছি ফরয়োর্ড ডিফেনসিভ* খেলা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সনাতন গ্রিপ-এর ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য তারতম্য করা হয়। যেমন পিটার মে ও ডন ব্র্যাডম্যান প্রমুখ পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। হবসের ছবিতে দেখা যাবে, ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার সময় বাঁ হাত ডগায়, ডান হাত একেবারে নিচুতে আলতো ভাবে, হাতের বুড়ো এবং প্রথম দু'টি আঙ্গুল বোলারের দিকে। এবং কথাটা স্মরণ রাখতে হবে যে সুনিপুণ ব্যাটসম্যান হিসাবে "স্টিকি" উইকেটে (ভিজে উইকেট, রৌদ্র বা বৃষ্টির দরুণ যে উইকেট শুকিয়ে উঠেছে, যে উইকেটে বল আকস্মিক ভাবে বিরাট ব্রেক করে, বল কখন মাটি ছেড়ে ওঠে না বা বিপজ্জনক ভাবে লাফায়) স্যার জ্যাক হবসের তুলনা নাই, একমাত্র স্যর লেনার্ড হাটন ছাড়া—তাও আংশিক ভাবে। ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলায় হব্‌স ছিলেন অনবদ্য। হাটনের "স্টিকি" উইকেটে "ড্রপড-রিস্ট" ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলা—কব্জি নামিয়ে ও আলগা করে খেলা বহুবার দেখেছি—এক কথায় অতুলনীয়!

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার সময় উপরোক্ত সব নির্দেশমতো খেলতে হবে, কিন্তু বিশেষ করে মনে রাখতে হবে তিনটি কথা। ব্যাট আর প্যাডের মধ্যে কোনও ফাঁক থাকবে না, পিছনের পা পপিং ক্রীজের ভিতরে শক্ত করে গেঁথে রাখতে হবে, বল খেলার সময় মারের পিছনে আদৌই জোর থাকবে না, "ফলো-থ্রু" তো নয়ই। আর, অবশ্যই বলের পিচ-এর ৫।৬ ইঞ্চির মধ্যে ব্যাট এগোতে হবে; ৫-৬ ইঞ্চির ভিতর বল টার্ণ, ব্রেক বা সুইং করলেও ব্যাটের মাঝামাঝি বল লাগবে, বলের দূরত্ব তার বেশী হলে এবং বল টার্ণ-ব্রেক সুইং করলে ব্যাটের কানায় লেগে বা অন্যভাবে আউট হবার বিশেষ ভয়।

তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে বাঁ পা পুরো বলের দিকে এগিয়ে নেওয়া, বহু ক্ষেত্রে বাঁ পা বলের পিচ্‌-এর দিকে অর্ধেক পথও এগোয় না, যার ফলে ভুল অবশ্যম্ভাবী। অনেক ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলার সময় পিছনের পা ফুটখানেক স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে নিয়ে তারপর বাঁ পা এগোন। ফল একই হয়, বলের কাছাকাছি বাঁ পা যায় না, পরিণাম একই ফরোয়ার্ড খেলার নামে বেশ দূর থেকে বলটি ব্যাট দিয়ে "আলগোছে" খেলা। এই দু'প্রকার খেলা একেবারেই চলবে না, কারণ এভাবে খেললে আউট না হওয়াই হবে আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

আধুনিক ক্রিকেট শিক্ষার গ্রন্থে ডিফেন্স বলতে—ব্যাক এবং ফরোয়ার্ড।

কিন্তু ডিফেন্সে "হাফ্-কক্" খেলা আগেও হত, আজও যথেষ্ট দেখা যায়। ধরুন ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার বল মনে করে ব্যাটসম্যান বাঁ পা এগিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন বিচারে ভুল, বল আরও "শর্ট," বলের নাগাল পাওয়া যাবে না; পিছিয়ে গিয়ে ব্যাক খেলারও সময় নেই, সুতরাং বাঁ পা এগিয়ে, ডান পা পপিং ক্রীজের ভিতর, ব্যাটসম্যান ব্যাট এগোলেন না, দু' পায়ের মধ্যে রেখে বল সামলালেন। একে বলা হয় হাফ্-কক্ বা না ফরোয়ার্ড না ব্যাক। হাফ্ অর্থাৎ আধাআধি ফরোয়ার্ড বা ব্যাক খেলা। যে উদাহরণ দিয়েছি সেটা অনিচ্ছাকৃত বা দায়ে পড়ে।

কিন্তু ভাল ব্যাটিং-এর পক্ষে উইকেটে, যে উইকেটে পিচ্ পড়ার পর বল বিশেষ টার্ণ বা অপ্রত্যাশিত অন্য কিছু করে না, এমন উইকেটে বিশেষ করে জোর বোলারদের বিরুদ্ধে ইচ্ছা করে হাফ্-কক্ খেলা বহু প্রচলিত। বলা বাহুল্য, স্লো বোলারদের বিরুদ্ধে হাফ্-কক্ খেলা সর্বসময়েই বিপজ্জনক, তা ছাড়া তার প্রয়োজনও হয় না; ব্যাটসম্যান এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ফরোয়ার্ড খেলা সম্ভব নয়, বল স্লো হওয়ার দরুণ পিছিয়ে গিয়ে কাট বা হুক করছেন, এমন বহু দেখা যায় ক্রিকেট মাঠে। ব্র্যাডম্যান, ওরেল, কনস্টানটাইন ও মুস্তাক আলীকে দেখেছি দুর্দান্ত ফাস্ট বোলারের বলে ডিফেনসিভ খেলতে এগিয়ে গেছেন, ভুল বুঝে পলকে পিছিয়ে এসে বলের "ডিরেকশন" অনুযায়ী কাট বা হুক মেরেছেন। কিন্তু এসব ক্রিকেট খেলার নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়!

তরুণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দেশ মতো ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলাই শ্রেয়। ব্যাটিং-এর পক্ষে ভাল উইকেটে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে হাফ্-কক্ খেলাও কাজে লাগবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রেও বল যেন মাটিতে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কাট্

ক্রিকেট স্ট্রোকের মধ্যে সত্যই মনোরম হল কাট্। দুঃখের বিষয় আজকাল কাট্—বিশেষ করে লেট কাট্ মারার রেওয়াজ কম। কারণ একাধিক। সমসাময়িক ক্রিকেটে অধিকাংশ ব্যাটসম্যান সামান্য "রিস্ক" বা ঝুঁকি নিতে রাজী নন; দ্বিতীয়ত, বোলিং ডিফেনসিভ—বল সাধারণতঃ লেগস্টাম্প বা তার বাইরে যাতে অফ্সাইড স্ট্রোক সম্ভব নয়; তৃতীয়ত, আধুনিক ক্রিকেট

খেলায় সামগ্রিকভাবে বর্তমান ডিফেনসিভ মেণ্ট্যালিটি বা আত্মরক্ষামূলক মনোভাব।

কাট্ স্ট্রোক তিন প্রকার—চার প্রকারেরও বলা যেতে পারে। ফরোয়ার্ড কাট্, স্কোয়ার কাট্, লেট কাট্। চতুর্থ দফা ঠিক কাট্ না হলেও সমগোত্র—গালী-র পাশ দিয়ে বলটি ঠেলে দেওয়া।

বলা বাহুল্য কাট্ মারার বল অফস্টাম্পের বেশ বাইরে হতে হবে, এবং গুড-লেন্থ বলের থেকে শর্ট। স্ট্রেট ব্যাটে কাট মারা অসম্ভব, "হরাইজণ্টাল" ব্যাটে মারতে হবে। ত্ব'হাতে গ্রিপ্ করে ব্যাট শূন্যে পয়েণ্টের দিকে তুলে, দেখে নিতে হবে মাটি বা জমির সঙ্গে ব্যাট "প্যারালাল" বা সমান্তরাল হয় (অবশ্য শূন্যে), তা হলেই হবে ব্যাট হরাইজণ্টাল। তারপর অবশ্য ব্যাটের "ফেস" বা ব্লেড এমন ভাবে ঘুরিয়ে নিতে হবে যার ফলে ব্লেড মাটির দিকে হয়। ব্যাটের হ্যাণ্ডেল থেকে ব্লেড মাটির দিকে সামান্য নিচু করে নিতে হবে যাতে বল মাটির দিকে মারার সুবিধা হয়। ব্যাট মাটির সঙ্গে প্যারালাল হলে, বা হ্যাণ্ডল তলায় এবং ব্লেড তার থেকে উঁচু হলে, ব্যাটে বলে হবার পর বল যে শূন্যে উঠবেই সে কথা বুঝিয়ে বলার কোনও প্রয়োজন নেই।

বল অফ্-এর বাইরে এবং শর্টপিচ্ হলেও, বলের "বাউন্স"—বা বল মাটি থেকে কতটা ওঠে—সেটা ওয়াচ করতে হবে। সাধারণতঃ বল "স্টাম্প-হাই", বা স্টাম্পের সমান উঁচু বা সামান্য বেশী হলেও কাট্ মারার পক্ষে আদর্শ, বল স্টাম্প-হাই বাউন্স করার সময় কাট্ মারা বিধেয়। বল বেশী বাউন্স করলে ক্যাচ ওঠার বিশেষ ভয়, নিচু হলে ব্যাটের ইনসাইড-এজ বা ব্যাটের ভিতরকার দিকের কানায় লেগে বল ভিতরে ঢুকে উইকেটে লাগার আশঙ্কা। অবশ্য চোখ ও রিফ্লেক্স ভাল হলে, ব্যাটসম্যান বলের বাউন্স হিসাবে নিজের স্ট্রোক এ্যাডজাস্ট বা প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। কাট্ সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় মোটামুটিভাবে বললাম। এখন বিভিন্ন কাট্ মারার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে নির্দেশ, ও সেই নির্দেশের তাৎপর্য আলোচনা করব।

ফরোয়ার্ড কাট্

প্রথমে ফরোয়ার্ড কাট্। ব্যাটিং-এ ফরোয়ার্ড খেলার সঙ্গে সামনের বা বাঁ পা জড়িত, এখানেও তাই। অফস্টাম্পের বেশ বাইরে, বল বেশ শর্টপিচ্

হলে—সেই বল ফরোয়ার্ড কাট্-এর পক্ষে আদর্শ, বলা বাহুল্য বল বেশী না লাফালে, বা নিচু না হলে। বলের লাইনে বা পা উইকেটের "এ্যাক্রশ" বা আড়াআড়ি এগোতে হবে বাঁ পায়ের বুটের টো হবে পয়েণ্ট থেকে কভার পয়েণ্টের মধ্যে, বাঁ পায়ের উপর শরীরের ওজন। ব্যাট লিফ্ট করার পর ব্যাট ব্যাটসম্যানের ডান কাঁধের উপর শূন্যে, ফাইন লেগের দিকে ব্যাটের তলা, তখন বাঁ কাঁধ মিড-অফ-এর দিকে। ডান হাতের গ্রিপ শক্ত করে, হাত, আর্ম (বাহু) এবং কাঁধের সম্মিলিত পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে ব্যাট হরাইজণ্টাল চালিয়ে পাপিং ক্রীজের উপর বা কিছু সামনে ব্যাটে বলে বা ইমপ্যাক্ট হলে, বল বিদ্যুৎগতিতে পয়েণ্ট ও কভার পয়েণ্টের মধ্যে গ্যাপ দিয়ে বাউণ্ডারী পৌছোবে। বলেছি বল সপাটে মারতে হবে, "ফলো-থ্রু" সমেত; সঠিক ভাবে মার হলে স্ট্রোকের শুরুতে যে ব্যাট ব্যাটসম্যানের ডান কাঁধে ছিল সে ব্যাট একটা পুরো সার্কল করে বা বৃত্তাকারে বাঁ কাঁধের উপর শেষ পর্যন্ত আসবে।

নির্দেশ মতো ফরোয়াড কাট্ মারায় বিপদ মোটেই নেই, দু'একটি বিষয়ে সতর্ক হলে, ব্যাটের সুইং-এর সময় ব্যাটের ব্লেড ঘুরিয়ে মাটিমুখো করে নিতে হবে যাতে বল মাটি থেকে উঠে পয়েণ্ট বা কভারে ক্যাচ না ওঠে, এবং বল খুব বেশী লাফালে সে বল ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত। ঠিকমতো বলের দিকে পা না বাড়িয়ে, আলগোছে কোনও মতে স্ট্রোক মারায় বিপদ সর্বক্ষেত্রে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হবে না।

ফরোয়ার্ড কাট্ আজ যে বিশেষ দেখা যায় না তার কারণ আধুনিক ব্যাটসম্যানের বোলার বল ছাড়ার সময় প্রথম ঝোঁক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এমন কি পিছিয়ে যাওয়া, উচ্চস্তরের ক্রিকেটে ফরোয়ার্ড কাট্-এর উপযুক্ত অফ-এর বেশ বাইরে এত শর্ট বল বিশেষ দেখাও যায় না। সুতরাং ব্যাটস-ম্যান মওকা পেলেও চোখ চেয়ে দেখেন, কিছু করতে পারেন না। তার মানে নয় যে ফরোয়ার্ড কাট্ উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট থেকে বিলুপ্ত; কম্পটন, এডরিচ, ব্র্যাডম্যান, উইক্‌স ফরোয়ার্ড কাটে ধুরন্ধর। কিন্তু বহু বছর আগে আমাদের এই ইডেন গার্ডেন্সে একটি ফরোয়ার্ড কাট্ দেখেছিলাম, সে স্ট্রোক আজও চোখের সামনে ভাসে। বৃটিশ স্কুলস ও বেঙ্গলী স্কুলস-এর খেলা, বৃটিশ স্কুলস-এর ফাস্ট বোলারের নাম আজ ঠিক মনে নেই, বোধ হয়, ডি এইচ্ ম্যাকফারসন—ময়দানের দিক থেকে বল দিচ্ছেন, ব্যাটসম্যান মণি দাস।

সামান্য শর্ট বল, অফ-এর বাইরে, কেতাদুরস্ত মণি দাস ফরোয়ার্ড কাট্ করলেন, অনায়াসে, ছবির মতো। মনে হয় স্ট্রোকের পিছনে "রিস্ট"-এর আধিক্য ছিল—আর্ম এবং শোলডার ছাড়াও। যে সব ব্যাটিং ধুরন্ধরের নাম করেছি তার তুলনায় মণি দাস হয়তো নগণ্য, কিন্তু এখানে বলছি একটি অতুলনীয় স্ট্রোকের ছবির কথা ব্যাটসম্যানদের নামডাকের কথা নয়। মনে আছে কভারে ফিল্ড করছিলেন আই পি এফ ক্যাম্পবেল, যিনি দলে থাকলে জ্যাক হব্স-কে কভার পয়েন্ট ক্যাম্পবেলকে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র ফিল্ড করতে হত—সেই ক্যাম্পবেল দাঁড়িয়ে রইলেন স্থানুবৎ!

উচ্চাঙ্গের ক্রিকেটে ফরোয়ার্ড কাট্ মারার উপযুক্ত বল বেশী না পাওয়া গেলেও, সাধারণ ক্রিকেটে এর দর্শন মেলে প্রচুর, সুতরাং ফরোয়ার্ড কাট্ তরুণ শিক্ষার্থীদের ভাল ভাবে রপ্ত করা উচিত।

স্কোয়ার কাট্

অনেক ক্রিকেট শিক্ষার বইয়ে ফরওয়ার্ড কাট্-কে স্কোয়ার কাট্ বলা হয়, কারণ, বোধ করি, ব্যাটসম্যানের পোসিশন হিসাবে, স্ট্রোকের ফলে বলের গন্তব্য স্থান ব্যাটসম্যানের স্কোয়ার (অবশ্য অফ্ সাইডে)—কভার পয়েন্টের বাঁ হাত থেকে পয়েন্টের বাঁ হাতের দিক পর্যন্ত। কিন্তু আমি ক্রিকেটের স্ট্রোক সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত করেছি। সামনের বা বাঁ পা কেন্দ্র করে ফরোয়ার্ড স্ট্রোক, পিছনের বা বাঁ পা কেন্দ্র করে ব্যাক স্ট্রোক। স্কোয়ার কাট্ (এবং লেট কাট্ ও গালী-র দিকে মার) পিছনের পা কেন্দ্র করে, সুতরাং স্কোয়ার কাট্ আমি ব্যাক স্ট্রোক বিবেচনায় স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করব।

ফরোয়ার্ড কাট্ মারার জন্য যা প্রয়োজন তার অনেক কিছুই স্কোয়ার কাট্ মারার জন্য দরকার হবে। বল অফ্-এর বাইরে কিন্তু খুব বেশী শর্ট না হলেও এমন কি গুড-লেন্থ বলেও স্কোয়ার কাট্ মারা চলে। বলের দিকে আড়াআড়ি ডান পা এগোতে হবে, ডান হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে ডান পায়ে শরীরের ওজন। ব্যাটের হ্যাণ্ডল সামান্য উঁচু, ব্যাটে বলে লাগা বা ইমপ্যাক্টের সময় ব্লেড হ্যাণ্ডল থেকে সামান্য নিচু, ব্লেড প্রায় মাটি-মুখো, উদ্দেশ্য, বল মাটিতে থাকবে শূন্যে উঠে ক্যাচ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। ব্যাট লিফট করার পর, বাঁ কাঁধ মিডঅফের দিকে, সুইং-এর আগে ব্যাট ডান কাঁধের উপর ও ব্যাটের তলা শূন্যে ফাইন লেগের দিকে, ডান প্যাডের উপর দিয়ে ব্যাট যাবে বলের দিকে,

ইমপ্যাক্টের সময় ব্যাটের গতি স্ট্রোকের ডিরেকশনের দিকে, তারপর ফলো থ্রু-র পর ব্যাটের চক্রাকারে ফেস ঘোরার পর বোলারের দিকে।

স্কোয়ার কাট মারার বিপদ যখন ব্যাটসম্যানের ডান পা বলের কাছে যায় না, বা মারার সময় ডান কাঁধ নিচুতে ঝুলে যায়, অথবা স্ট্রোকের আগেই বা স্ট্রোকের সময় বাঁ কাঁধ তড়িঘড়ি বোলার বা মিড-অনের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। প্রথম দোষ হলে ব্যাট বলের তলায় লেগে ক্যাচ উঠবে, দ্বিতীয় ভুল হলে বলের উপর চোখ ঠিক থাকতে পারে না, মার ঠিক হবে না, "মিস-হিট্" হবে। নির্দেশ মতো স্ট্রোক করলে অবশ্য ভুল হবে না, কিন্তু উপরোক্ত ভুল দু'টি অতি সাধারণ, সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

নির্দেশ মতো স্ট্রোক করলে, ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট পপিংক্রীজের উপর বা সামান্য ডান দিকে হলে, স্কোয়ারকাট্ পয়েন্ট এবং গালীর-র মধ্যে যাবে। আজকাল পয়েন্ট-কে সামান্য ঘুরিয়ে গালী-র দিকে রাখা রেওয়াজ। ভাল ব্যাটসম্যান তাই বল একটু আগে বা পরে মেরে প্লেস করে থাকেন। স্কোয়ার কাট্ মারার আদর্শ, বল স্টাম্পের সামান্য উঁচুতে কিন্তু সেটা সব সময় সম্ভব নয়, ব্যাটসম্যানকে বল উঁচু নিচু হলেও মানিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে অফ্ব্রেকে কাট্ না মারাই ভাল, "শার্প" বা দ্রুতগতিতে অফব্রেক হলে বল ফস্কে বোল্ড হবার যথেষ্ট আশঙ্কা। অনেক সময়ে ব্যাটের নিচুর কানায় লেগে স্টাম্পেও বল লেগে থাকে। বল বেশী লাফালে বা বেশী সুইং বা টার্ণ করলে সে বল ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত।

প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অনেকেই স্কোয়ার কাট্ সুন্দর মারেন, কিন্তু তার মধ্যে হব্স, হ্যাসেট্, অমরনাথ, উইক্স, হেডলী, আর্থার মরিস (অস্ট্রেলিয়া) প্রভৃতির স্কোয়ার কাট অন্তত আমার চোখে অনির্বচনীয় !

লেট কাট

স্কোয়ার কাট-এর মতো লেট কাট ব্যাকস্ট্রোকের পর্যায় পড়ে, কারণ ডান পা কেন্দ্র করে এই স্ট্রোক মারতে হয়। বল শর্ট ও অফস্টাম্পের বাইরে হতে হবে। কিন্তু খুব বাইরে নয়, স্টাম্প থেকে ফুট খানেক দূরে। শর্ট অর্থে গুড লেন্থ থেকে সামান্য শর্ট; এমন কি মিডিয়াম পেস্ বা স্লো বল হলে গুড লেন্থ বলেও উঁচুদরের ব্যাটসম্যানরা লেট কাট মেরে থাকেন।

লেট কাট মারার টেকনিক স্কোয়ার কাট মারার মতোই, কিন্তু সামান্য

ভারত বনাম নিউজীল্যাণ্ড—১৯৫৫ সনের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ—বম্বে ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ভারতের ক্যাপ্টেন পলি উমরিগর ও হেনরি কেভ 'টস' করতে যাচ্ছেন

অদলবদল করে নিতে হবে। লেটকাট মারলে বল যাবে সেকণ্ড বা থার্ড স্লিপে-এর দিকে। তাই, বলের দিকে পিছনের বা ডান পা উইকেটের এ্যাক্রশ বা আড়াআড়ি এগোতে হবে থার্ডম্যান বা বলের ডিরেকশন অনুযায়ী আরও ডান দিকে, ডান পা সামান্য ভাঁজ করে ডান পায়ের উপর শরীরের ভার, বলের পুরো বাউন্স-এর মাথায় ব্যাটের সঙ্গে বলের ইমপ্যাক্ট হবে বোলিং ক্রীজের সামান্য আগে। এ ক্ষেত্রেও ব্যাট হরাইজন্টল বলটা, যেন ছেড়ে দিয়ে বলের লাইনের উপরে ব্যাট প্যারালাল নিয়ে গিয়ে শেষ মুহূর্তে বলের উপর কোপ্‌ মারতে হবে। এই শেষ মুহূর্তে মারার জন্যই এই স্ট্রোক-কে লেট কাট বলা হয়।

লেট কাট মারার সময়, ব্যাটের সুইং-এর শুরুতে ব্যাট ডান কাঁধের উপর (ডান পায়ের প্যাডেরও) বাঁ কাঁধ মিডঅফ-এর দিকে, তড়িৎ বেগে স্ট্রোক শেষ করে ফলো-থ্রু সমেত ব্যাট চক্রাকারে যখন ঘুরে আসবে তখন ব্যাটের আগা বা নিচুর অংশ হরাইজন্টাল ভাবে বোলারের দিকে। অনেক ব্যাটসম্যানের কিন্তু লেট কাট মারার পর, ফলো-থ্রু অর্থে, স্ট্রোকের মোশনেই ব্যাট মাটিতে চাপড়ানো—বল অনুযায়ী ব্যাটের আগা সেকণ্ড বা থার্ড স্লিপের দিকে। অনেকে এই স্ট্রোককে "চপ" বলে থাকেন। সারের আই পি এফ ক্যাম্পবেল প্রায়ই, এবং কম্পটন ও এডরিচ কখন সখন চপ মারতেন।

লেট কাট ফাস্ট বলে মারা বিপজ্জনক, তাছাড়া স্লিপ-এ ফিল্ডসম্যানও বেশী রাখা হয়; ফাস্ট বলে সামান্য ভুল হলেও উইকেটকীপার বা ফার্স্ট ও সেকণ্ড স্লিপ-এ ক্যাচ অব্যর্থ। সে কারণে লেট কাট মার অধিকাংশ আধুনিক ব্যাটসম্যানই বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ঠিক ভাবে মারতে পারলে লেট কাট হয় সত্যই মনোরম। খাঁটি ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রফেসর দেওধর লেট-কাট চমৎকার মারতেন—ফাস্ট বলেও; বহুদিন আগে বোম্বাইয়ের কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলে আসার পর কলকাতার বিশিষ্ট ইনসুইং ফাস্ট বোলার স্ট্যানলী বেহরেণ্ড (আজ স্বর্গত) বলেছিলেন: "দেওধরের তুলনা নেই, আমার বল খুশীমতো ফার্স্ট স্লিপ থেকে গালী পর্যন্ত কাট্‌ মেরে গেলেন, আমি আটকাতে পারলাম না!"

মিডিয়াম পেস এবং স্লো বলে লেট কাট মারাই প্রচলিত। গোঁড়া শিক্ষক বলবেন স্লো বলে কাট মারা নিষিদ্ধ, কথাটার গুরুত্ব নেই তা নয়। কিন্তু

অধিকাংশ উঁচুদরের ব্যাটসম্যানই মিডিয়াম ও স্লো বলে লেট কাট মেরে থাকেন। লেট কাট মারবার মুহূর্তে, ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় রিস্ট বা কব্জির ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। লেট কাট মারার বিশেষজ্ঞের মধ্যে মনে পড়ে—বিশেষ স্লো বলে—ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট, দলীপসিংজী, বিজয় মার্চেন্ট, মুস্তাক আলী, হ্যাসেট্, দেওধর, ওরেল, এবং অবশ্যই ব্র্যাডম্যান প্রভৃতি। এই কব্জির শক্তিতেই স্লো বল যায় বুলেটের মতো।

কিন্তু তরুণ শিক্ষার্থীর উচিত শুরুতে অতি ফাস্ট ও অতি স্লো বলে লেট কাট মারার চেষ্টা না করা ; আর স্লো বলে লেট কাট যদি করতেই হয়, চপ মারার ভঙ্গীতে যাতে বিপদের আশঙ্কা কম। ফাস্ট বলে কাট করার বিপদের কথা আগেই বলেছি, বিশেষ করে বল কম বেশী বাউন্স করলে, আর ব্যাটস-ম্যান সামলাতে না পারলে, হয় ব্যাটের আউটার এজ বা বাইরের কানায় লেগে ক্যাচ, নয় ইনসাইড এজ বা ভিতরের কানায় লেগে উইকেটে লাগার বিশেষ ভয়।

তবে অন্য সব কাট মারার মতোই এক্ষেত্রেও ব্যাট মন খুলে সজোরে চালানোই যুক্তিযুক্ত, মিস-হিট বা মারের ভুল হলেও বল জোরে যাবে, উঁচু-নিচু হয়ে, এবং ক্যাচ স্লিপ-ফিল্ডসম্যানদের দিকে গেলেও সব সময় ধরা না যেতেও পারে। কারণ, ফিল্ডসম্যানও মানুষ, তাঁদেরও তড়িৎ বেগে ক্যাচে ভুলচুক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কাট্ মারতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সুশীল সুবোধ বালকের মতো আস্তে খোঁচা দেওয়া—যা ভারতীয় টেস্ট ব্যাটসম্যানরাও হরদম করে থাকেন মারাত্মক, সেটা মনে রাখতে হবে।

কাট গালী-র দিকে

আগেই বলেছি কাট-এর সমগোত্র হলেও গালী-র পাশ দিয়ে অফের বাইরে ফাস্ট বা মিডিয়াম পেস্-এর শর্ট বল হরাইজণ্টাল ব্যাট দিয়ে যে ঠেলে দেওয়া হয় সেটা ঠিক কাট নয়। এখানেও অবশ্য পিছনের বা ডান পা উইকেটের এ্যাক্রশ বলের দিকে, ডান পায়েই জোর, কিন্তু এ মার মারতে ব্যাটসম্যানের হাতের জোর প্রয়োগ করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর পর, বল থার্ডম্যানের দিকে চলে যায় নিজের গতিতেই, ব্যাট দিয়ে মাত্র দিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

অন্য তিন ধরণের কাট-এর মতো, এ ক্ষেত্রেও ফুটওয়ার্ক একই রকম।

কিন্তু ব্যাটসম্যানের সতর্ক হতে হবে দু'টি বিষয়ে ; বলের উপর ব্যাট রাখতে হবে যাতে বল মাটিতে থাকে। বেশী দূর থেকে বল আলগোছায়—অর্থাৎ পা না এগিয়ে, ব্যাট দূর থেকে চালিয়ে—মারাতেই সমূহ বিপদ, বিশেষ করে যখন ফাস্ট বা মিডিয়াম পেস্-এর বোলারদের দু'তিনটি স্লিপ ও গালী রাখা হয়।

কিন্তু ঠিক ভাবে ফুটওয়ার্ক হলে, বল মাটিতে রাখার জন্য সযত্ন হলে, প্রায়ই থার্ডম্যানের দিকে এক বা দু'রান পাওয়া খুবই সহজ। ব্যাটিং-এ রান করার এই স্ট্রোক একটি বিশেষ সহজ পন্থা—থার্ডম্যানে ঠেলে দিয়ে এক রান। তবে উচ্চাঙ্গ ব্যাটসম্যান নিজ প্রতিভাগুণে যখন এমন বলেই থার্ড-ম্যানের আশ-পাশ দিয়ে কব্জির জোর এবং টাইমিং-এর গুণে বাউণ্ডারী মেরে থাকেন, তখনই হয় এই কাট যথার্থ কাট।

তরুণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে ফুট-ওয়ার্ক ঠিক রেখে, বল নিচুতে রেখে প্রথম-প্রথম থার্ডম্যান বাউণ্ডারীর অঞ্চলে এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

।। ড্রাইভ ফরোয়ার্ড ।।

ফরোয়ার্ড ড্রাইভ-এ সামনের বা বাঁ পা বলের লাইনের দিকে এগিয়ে, ব্যাট বা প্যাডের যথাসম্ভব কাছে রেখে, বাঁ হাঁটু সামান্য ভাঁজ করে শরীরে ভর বাঁ পায়ে রেখে) বাঁ কাঁধ, ব্যাটের লিফট, ব্যাট নামানো ইত্যাদির টেকনিক মোটামুটি ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার মতোই, আগের এক পরিচ্ছেদে যার বিশদ বর্ণনা আছে) বলটা পিচের মাথায় উইকেটের সামনে মারা বা হিট্ করা হয়।

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলা আত্মরক্ষামূলক, বল মারার উপযুক্ত নয় বলে রান করার আশা যেক্ষেত্রে বর্জন করা হয়। সচরাচর ডেড্-ব্যাট-এ খেলা হয়। ফরোয়ার্ড ড্রাইভ কিন্তু "এ্যাট্যাকিং শট্" আক্রমণাত্মক মার, বলের পিচ্ অনুযায়ী বলটা মারা সম্ভব বলে, সাধারণত যাকে বলা হয় হাফভলী। ফরোয়ার্ড ড্রাইভ-এর পিছনে থাকতে হবে দু'টি কব্জি, আর্ম বা বাহু, এমন কি দুই শোলডার বা কাঁধের শক্তি। ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার টেকনিক মনে রেখে খেললে বল মাটিতে থাকবে, বল টার্ণ করলেও ব্যাট ও প্যাডের মধ্য দিয়ে বল গলে যাবে না। তফাৎ মাত্র এই ব্যাটের "ডাউন-ওয়ার্ড" সুইং বা ব্যাট নামার সময়, গ্রিপ ফার্ম বা শক্ত করে ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সজোরে মারতে হবে।

(কৃতী ক্রিকেটার)
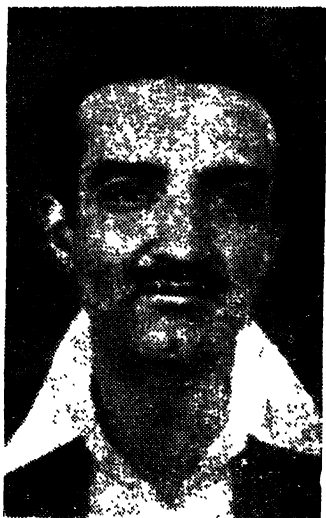
মার্চেন্ট

মুস্তাক আলী

পি সেন
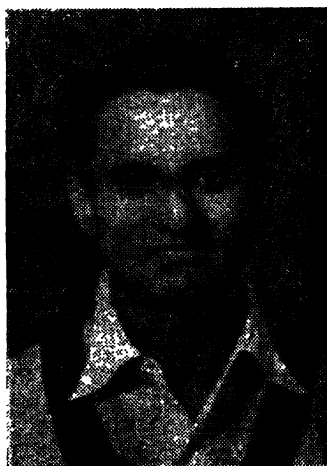
হাজারে

ফরোয়ার্ড ড্রাইভ সাধারণত চার রকমের—কভার ড্রাইভ, অফ-ড্রাইভ, ষ্ট্রেট ড্রাইভ এবং অন-ড্রাইভ। ড্রাইভ এর টেকনিক একই কিন্তু মারের জোরের জন্য ব্যাক লিফট সামান্য বেশী, আর বল মারার পর সম্পূর্ণ ফলো-থ্রু করতে হবে। বলের ডিরেকশন অনুযায়ী বিভিন্ন ড্রাইভ।

কভার ড্রাইভ

অফ-এর বাইরে ওভার-পিচ বল (বা গুডলেন্থের বেশ খানিকটা আগিয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে), অফস্টাম্পের ফুটখানেক বা কিছু বেশী বাইরে, বাঁ পায়ের টো কভারের দিকে বাড়িয়ে, ক্রীজের ভিতরে ডান পায়ের টো গেড়ে রেখে, ব্লেডের ফেস্ সামান্য অফসাইডের দিকে কাত করে, বলের উপর গিয়ে ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় পারপেণ্ডিকুলার ব্যাটে মারলে বল যাবে কভার বাউণ্ডারীর দিকে। এই হল কভার ড্রাইভ। অবশ্য ফরোয়ার্ড খেলার অন্যান্য নির্দেশ (যা আগেই বলা হয়েছে একাধিকবার) সেগুলি মনে রাখতে হবে। ঠিক ভাবে কভার ড্রাইভ হলে মারের জন্য ব্যাটের স্যুইং ডান কাঁধের উপর থেকে ঘুরে বাঁ কাধের উপর শেষ হবে—ব্যাটসম্যানের বাঁ পা, বুক ও মুখ কভারের দিকে থাকবে—যেন বলটার সঙ্গেই ব্যাটসম্যানও কভার বাউণ্ডারীতে যেতে ব্যস্ত !

অফড্রাইভ

অফড্রাইভ-এর বল সাধারণত অফ-স্টাম্পের চার থেকে ছ'ইঞ্চির ভিতর হয়, ব্যাটসম্যানের টেকনিক কভার ড্রাইভ-এর সদৃশ। মাত্র নজর রাখতে হবে ব্যাটের ফেস্ অতি সামান্য অফ্-এর দিকে কাত হবে। শুধু বল অনুযায়ী ব্যাটসম্যানের বাঁ পায়ের টো একষ্ট্রাকভার বা মিডঅফের দিকে, সুতরাং ড্রাইভ কভার থেকে লং-অফ্ বাউণ্ডারীর অঞ্চলে যাবে। অফড্রাইভ নির্ভুল হলে, ফলো-থ্রু-র পর ব্যাটসম্যানের বাঁ প্যাড, ব্যাটসম্যানের বুক ড্রাইভের ডিরেকশন্ অনুযায়ী একষ্ট্রাকভার থেকে লংঅফ্-এর দিকে, ব্যাট বাঁ-কাঁধের উপর রাইফেলের মতো।

স্ট্রেটড্রাইভ

ষ্ট্রেটড্রাইভ-এর টেকনিক উপরোক্ত দু'টি ড্রাইভ-এরই মতো। কিন্তু ব্যাটের ফেস্ ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় বোলারের দিকে সোজা

রাখতে হবে। স্ট্রেটড্রাইভ-এর জন্য বল সোজা স্টাম্পের উপর হতে হবে, তাই ফলো-থ্রু-র শেষে ব্যাটম্যানের বাঁ পা, বুক, দুটি কনুই বোলারের দিকে, ব্যাট ব্যাটসম্যানের মাথার উপর। স্ট্রেট ড্রাইভ যাবে বোলারের সামান্য ডান বা বাঁ পাশ দিয়ে।

অনড্রাইভ

অনড্রাইভ-এর টেকনিক একই। বল লেগস্টাম্প বা তার বাইরে লেগের দিকে হতে হবে, সুতরাং বলের ডিরেকশন অনুযায়ী, অনড্রাইভের মার যাবে লংঅন থেকে মিডউইকেটের এমন কি স্কোয়ার লেগের অঞ্চল পর্যন্ত। অন-ড্রাইভ-এর সময় দু'টি জিনিষ মনে রাখতে হবে; প্রথমত, ব্যাটের ফেস অন-সাইড বলের ডিরেকশন অনুযায়ী অল্পবিস্তর কাত করে নিতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত স্ট্রোকের পিছনে বাঁ কাধের জোর বিশেষ থাকবে না, ইমপ্যাক্ট-এর সময় বাঁ-কাঁধ শক্ত না করে "ঝুলিয়ে" নিলেই সেটা সম্ভব।

কভার, অফ এবং স্ট্রেট ড্রাইভ-এ দু'টি কাঁধেরই জোর দেওয়া সঙ্গত। অন ড্রাইভ-এর সময় বাঁ কাঁধ ঝুলিয়ে নেবার উদ্দেশ্য এই যে, অন্যথায় মারের পর বলের ডিরেকশন বেশী ঘুরে যেতে পারে, ব্যাটের ফেস্ অন সাইডে ঘুরিয়ে নেওয়ার ফলে বল ব্যাটের ইনসাইড এজ বা ব্যাটের ভিতরের দিকের কাণায় লেগে বিপদও হতে পারে।

চার রকম ড্রাইভ-এর কথা বলেছি, কিন্তু আজকাল খবর কাগজের রিপোর্টে বা রেডিও কমেণ্ট্রি-তে স্কোয়ারড্রাইভ-এর কথাও পড়া ও শোনা যায়। এই স্ট্রোক অবশ্য বরাবরই ছিল; অনেক সময়ে এটাকে হাফকাট- হাফড্রাইভ বলা হত, যেটা ভুল। এটাও যথার্থ ড্রাইভ, কভার ড্রাইভ-এর মতো; কিন্তু বল অফস্টাম্পের দু' আড়াই ফুট বাইরে, বেশ ওভারপিচ পপিংক্রীজের কাছাকাছি, বাঁ পা উইকেটের আড়াআড়ি পয়েণ্টের দিকে বেশ এগিয়ে, ব্যাটের ফেস অফসাইডের দিকে প্রায় পয়েণ্টের দিকে বেশ কাত করে ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে মারলে, এই স্কোয়ারড্রাইভ হয় সত্যই সুন্দর স্ট্রোক। অনড্রাইভ-এর মতো, স্কোয়ার ড্রাইভ-এ ভারতের বিজয় হাজারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম। এই দুটি স্ট্রোকে হাজারের মতো কুশলী খুব অল্পই দেখেছি। অনেক সময় কভার ড্রাইভ মারতে গিয়ে, ফাস্ট বা মিডিয়াম পেস-এর বলে বেশী আউটসুইং

স্থইং করলেই বল কিছু মারাত্মক হয় না, অনেক বল পাওয়া যায় ব্যাটের মুখে আউটস্থইং বা ইনস্থইং যা স্বচ্ছন্দে কভার বা অনড্রাইভ করা যায়, বেশ ফাস্ট বোলারের বলেও।

কিন্তু আধুনিক ব্যাটসম্যান এমন কী টেস্ট ব্যাটসম্যান "আপন প্রাণ বাঁচাতে" এমনই ব্যস্ত যে এধরণের বল মারার জন্য আদৌ প্রস্তুত থাকেন না অথবা মারতে গেলেও শেষ পর্যন্ত আস্তে "পুশ" করেন, আর সাধারণত বল আউটস্থইং করার দরুন স্লিপ-এ হয় বা গালীতে ক্যাচ, ইনস্থইং করলে শর্টলেগে। অথচ সাহস ভরে ব্যাট সপাটে চালালে এধরণের বলে হয় বাউণ্ডারী, মিস-হিট হলেও কাছাকাছি ফিল্ডসম্যান টপকে গিয়ে রানের সম্ভাবনা। ব্যাট জোরে চালালে ক্যাচ উঠলেও ক্যাচ যে ধরা হবেই তারও নিশ্চয়তা নেই।

প্রসঙ্গত, স্থইং বলে তরুণ শিক্ষার্থীরা যেন কদাচ আস্তে পুশ করে বা বলটা আস্তে ঠেলে না খেলেন, তাতে আউট হবার বিশেষ আশঙ্কা। অবশ্য চোখে যখন বল ভাল দেখা যাচ্ছে, হাত বেশ জমেছে তখন পিচের মাথায়, বলের ওপর ঝুকে পুশ করে বল প্লেস বা ফিল্ডসম্যানের মধ্যে ফাঁক দেখে প্রায় এক, দুই রান নেওয়া যায়। সেটা কিন্তু ড্রাইভ নয়, পুশ।

আর একটা কথা বলব। ড্রাইভ করার সময় বলের পিচ-এর অন্তত ছ' ইঞ্চির মধ্যে ব্যাট এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করাই ঠিক। কিন্তু এমন উইকেট আজ বহু যাতে পিচ পড়ার পর বল ডিরেকশন আদৌ বদলায় না। এমন উইকেটে ওয়েটিং ড্রাইভ-এর বেশ চল। অর্থাৎ বল গুডলেন্থ, ব্যাটসম্যান নিশ্চিত বল ঠিক লাইনেই আসবে। সে ক্ষেত্রে বলের লাইনে বা পা মাঝামাঝি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, পোসিশনে ওয়েট বা অপেক্ষা করে ড্রাইভ মারলেন ব্যাটসম্যান, মার হবে নিখুঁত। ভারতে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে এবং কিছুমাত্রায় অষ্ট্রেলিয়াতেও এমন উইকেট আছে, ইংলণ্ডেও কয়েকটি মাঠে। তাই এই ওয়েটিং ড্রাইভ-এ বিশিষ্ট ব্যাটসম্যানের মধ্যে আছেন উইকস, ওয়ালকট, কনস্টানটাইন, সিডনী বার্নস, গ্রেভনী, মিলার, এডরিচ প্রমুখ আরও অনেকে।

ড্রাইভ সম্বন্ধে শেষ কথা বলতে মনে পড়ে ওয়ালটার হ্যামণ্ডের কভার ড্রাইভ। ছবিতে বহুবার দেখেছিলাম হ্যামণ্ডের কভারড্রাইভ-এর ছবি। স্বচক্ষে দেখেছিলাম ১৯৪৬ সনে ওল্ড-ট্র্যাফোর্ড (ম্যানচেষ্টার) মাঠে ভারত বনাম

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্টে। উইকেট ভিজে, মাঠ অর্থাৎ আউটফিল্ড অত্যধিক স্লো। অমরনাথ একটি লেগকাটার দিয়েছিলেন, হ্যামণ্ড কভারড্রাইভ মারলেন—একটা যেন ছবি। অমন স্লো মাঠে আউটফিল্ডেও বল মাটিতে মিশিয়ে বিদ্যুৎগতিতে গেল কভার বাউণ্ডারী পার হয়ে। অপূর্ব স্টাইল এবং মারের পিছনে বিস্ময়কর শক্তি। চাঁদিনী রাতে প্রথম তাজমহলের প্রতিকৃতি দেখে হয়েছিলাম মুগ্ধ, মোহাবিষ্ট। সেই অনুভূতিই হয়েছিল সেদিন ওল্ড-ট্রাফোর্ডে। জগতে প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান—হাটন, গ্রে গনী, ওরেল, মে ইত্যাদির কভার-ড্রাইভ দেখেছি সুন্দর ও মনোরম। হ্যামণ্ডে' আরও অনেক কভার ড্রাইভ দেখেছিলাম। কিন্তু সেই ওল্ডট্রাফোর্ড মাঠে মেঘলা দিনের হ্যামণ্ডের সেই কভার ড্রাইভ-এর ছবি আজও এক স্বর্গীয় অনুভূতি জাগায়—আজও, বোধ করি চিরদিনের তরে করবেও!

জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ

এ যাবৎ যে সব রকমের ড্রাইভ-এর কথা বলেছি, সাধারণত সবই এক-প্রকার বল বা বোলারের নির্দেশ মতো। অর্থাৎ বোলার ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে হাফভলী বা ওভারপিচ বল যদি দেন, তবেই ব্যাটসম্যান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী সে বলে ড্রাইভ মারতে পারবেন। তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তত শুরুতে এই ধারাই ঠিক।

লিয়ারী কনষ্ট্যানটাইনের জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ-এর চিত্র।

কিন্তু বোলার যন্ত্রের মতো গুডলেন্থে বল দিয়ে যাচ্ছেন, ব্যাটসম্যান দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো রাইট ফুট স্টিল, লেফট লেগ এ্যাণ্ড এলবো ফরোয়ার্ড, হেড ডাউন করে হরদম বল ঠেকিয়ে যাচ্ছেন, মেডেনের পর মেডেন (যে দৃশ্য প্রায়ই আজকালকার টেস্টক্রিকেটেও দেখা যায়), এমন হালচাল শুধু বিরক্তিকর নয়, অসহনীয়। ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্য ব্যাটে ও বলে দ্বন্দ্ব—কে কাকে হারাতে পারে শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধির জোরে। সুতরাং গুডলেন্থ বল হলেই ব্যাটসম্যানকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার কোনও অর্থ

নেই। ফুটওয়ার্ক ইত্যাদির সহায়ে গুডলেন্থ বলও এগিয়ে পিছিয়ে মারা যায় এবং মারা হয়, বোলারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়ে।

জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ—অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করা সাধারণত স্লো, স্লো-মিডিয়াম বা মিডিয়াম-স্লো বলে সম্ভব। ধরুন, মানকাদ, রামাধীন, রিচি বেনো বা সুভাষ গুপ্তে নিখুঁত ভাবে গুডলেন্থে বল ফেলছেন। বল স্লো অথবা এমন কী মিডিয়াম-স্লো, সুতরাং ব্যাটসম্যান সময় পাচ্ছেন বলের দিকে এগিয়ে যাবার—বা সময় তাঁর পাওয়া উচিত যদি অবশ্য অত্যধিক আত্মরক্ষা মনোভাবের জন্য ব্যাটসম্যান ক্রীজ় আঁকড়ে পড়ে না থাকেন।

বড় ক্রিকেটারের কথা নয়, আমার কথা। বহু বছর আগে কলকাতার এককালীন প্রসিদ্ধ গ্রাউণ্ড মার্কাস-স্কোয়ারে নেট প্র্যাকটিশ করছি, বল করছেন প্রফেসর শৈলজারঞ্জন রায়; ফ্লাইট করে বল কখনও বেশী উঁচু, কখনও কম—লেগব্রেক ও অফব্রেক নির্ভুল ভাবে গুডলেন্থে ফেলছেন, আমি যত ব্যাক খেলছি প্রফেসর রায় ততই বল আমার আরও কাছে দিচ্ছেন। অত্যধিক স্পিন করার জন্য ড্রাইভ করার ভরসা হচ্ছে না। নেটের পিছনে দাঁড়িয়ে, প্রফেসর রায়ের পিতা স্বনামখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়, বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তনের ব্যাপারে যিনি অগ্রণী, এক কথায় বাঙ্গালী-ক্রিকেটের জনক।

প্রিন্সিপ্যাল রায় আমাকে ডেকে নিয়ে বললেনঃ দেখ, শৈল তোকে সুতো ছেড়ে খেলাচ্ছে, মাছ ধরার সময় আমরা যেমন করি, হঠাৎ একটা সোজা জোর বল বা অফব্রেক দিয়ে তোকে লেগবিফোর করে দেবে। তোর উচিত একটু উঁচু ফ্লাইটে বল করলেই দৌড়ে গিয়ে ফুল পিচে মারা, না পারলে বল পিচ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভ মারা। মারতে যদি পারিস তা হলে শৈল বল শর্ট পিচে ফেলবে, তখন কাট, হুক যা খুশী মারতে পারবি।

প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়ের সহজ, সরল বাঙ্গলা ভাষায় ঐ নির্দেশেই স্লো থেকে মিডিয়াম-স্লো বোলিং ড্রাইভ করার ফুটওয়ার্ক-এর গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে; তার সঙ্গে, বোধ করি, বোলারের চাল ব্যর্থ করে ব্যাটসম্যানের আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব। বলা বাহুল্য ড্রাইভ করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় টেকনিক্ (আগের নির্দেশ মতো) ঠিক রাখতে হবে।

জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ, আক্ষরিক অর্থে ক্রীজ ছেড়ে লাফিয়ে গিয়ে,

এগিয়ে ড্রাইভ অনেক ব্যাটসম্যান করেন। স্বনামধন্য রঞ্জির এই লাফিয়ে ড্রাইভ করার ছবি ক্রিকেট জগতের বহু প্যাভিলিয়নে শোভা পায়। বল বোলারের হাত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বল কোথায় পিচ পড়বে তা আন্দাজ করে, তার বেশ কাছে লাফিয়ে বাঁ-পা এগিয়ে নিয়ে সপাটে ব্যাট চালালে ড্রাইভ বেশ জোর হবে।

জাম্পিং আউট না করে রানিং আউট টু ড্রাইভ—অর্থাৎ ক্ষিপ্রগতিতে পা দুটি চালিয়ে বলের কাছে গিয়ে ড্রাইভ দেখতে আরও সুন্দর। বিরাট একটা লম্ফ না দিয়ে—যেটা অনেক সময় দৃষ্টি কটু হয়, শেষোক্ত পদ্ধতি শুধু সুদৃশ্য নয়, এতে মারের ভুলের আশঙ্কাও কম। এর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম আই পি এফ ক্যাম্পবেলের ট্যারান্টের মত দুর্ধর্ষ স্লো বোলারের বিরুদ্ধে; অন্য সব ব্যাটসম্যান সেই রাইট ফুট স্টিল ক্রীজের ভিতর গেড়ে রেখে ট্যারান্টের বলে ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্টাম্প হচ্ছেন বা স্লিপে ক্যাচ তুলছেন! কিন্তু ক্যাম্পবেল ছোট ছোট কয়েকটি স্টেপ নিয়ে এগিয়ে পিচ-এর মাথায় বল স্বাচ্ছন্দ্যভরে খেলছেন। স্বর্গত দুখীরামবাবু ইডেন গার্ডেনে বা অন্যত্র খেলা দেখতে বসলে, তাঁকে ঘিরে একটা ছোটখাটো দরবার বসত। তিনি বলেছিলেন: এর নামই ফুটওয়ার্ক।

রঞ্জির মতোই পতৌদির নবাবের জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ-এর একটা ছবি অনেক জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু লর্ড উইলিংডনের দলের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লিতে পতৌদি এবং আমি এক সঙ্গে ব্যাট করছি, একদিক থেকে বল করছেন অস্ট্রেলিয়ার স্লো বোলার (ডান হাতে) ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্ণ, তখন দেখেছি পতৌদি ক্যাম্পবেলের মত ছোট ছোট স্টেপ নিয়ে অনায়াসে পিচ-এর মাথায় এগিয়ে এসে ড্রাইভ করছেন। পরে পতৌদি এই ধরণের ফুটওয়ার্ক ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ধরুন, অফস্টাম্পের সামান্য বাইরে ফ্লাইট করা একটা লেগব্রেক। বলের পিচ সঠিক বিচার করে, এগোলে দুটি পায়ের পোসিশন অফ ড্রাইভ-এর জন্য প্রয়োজনীয় নিখুঁত ভাবেই থাকবে—বাঁ-পার হাঁটু ভাঁজ করে তার উপর শরীরের ভার, পিছনের বা ডান-পা যথাসম্ভব মাটিতে গেড়ে, যাতে মারের পিছনে জোর হয়। প্রভেদ এই মাত্র, যে ডান-পা ক্রীজের ভিতরে থাকবে। কিন্তু জাম্পিং আউট বা রানিং আউট টু ড্রাইভ করতে হলে প্রথমেই বল বিচার করতে হবে নির্ভুল ভাবে, ব্যাটসম্যানকে নিশ্চিত হতে হবে যে, বলের পিচ-এ তিনি পৌছোতে পারবেন। বলের দূরত্ব অনুযায়ী দুই বা তিন বা চার স্টেপ নিতে হবে ক্ষিপ্রগতিতে।

পরে এই রানিং আউট ড্রাইভ-এ বিশেষ কৃতিত্ব দেখেছি ওরেল, ম্যাকার্টনী, কম্পটন, ব্র্যাডম্যান, মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, স্টলমায়ার (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), নীল হার্ভে, ওয়াকার হাসান (পাকিস্তান), আব্বাস আলি বেগ প্রমুখ ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং-এ। জাম্পিং আউট টু ড্রাইভ-এ অনেকেরই নাম মনে পড়ে—দু'একটি লম্ফ-সমেত অপেক্ষাকৃত লম্বা স্টেপ নিয়ে ড্রাইভ (ড্রাইভের অন্যান্য মূল টেকনিক বজায় রেখে)—তার মধ্যে ওয়ালকট, ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্যাপটেন ফ্রেডী ব্রাউন, এভারটন উইকস, কাউড্রী, ইত্যাদি অনেকে। উপরোক্ত বিশিষ্ট ব্যাটসম্যানদের অবমাননা করছি না। সাধারণত তাঁরা লম্বা হবার দরুন, জাম্পিং আউট ড্রাইভ তাঁদের সহজাত, কিন্তু এই জাম্পিং আউট ড্রাইভ আজকাল শেষের দিকের ব্যাটসম্যানরাই বেশী করে থাকেন, যাঁদের উদ্দেশ্য এস্পার না হয় ওস্পার! আধুনিক শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অধিকাংশই রানিং আউট ড্রাইভ-এর ভক্ত ও বিশেষজ্ঞ। আমার ব্যক্তিগত ঝোঁক রানিং আউট-এর পক্ষে; বিশেষ করে স্ট্রোক মারার জন্য দু'পায়ের পোজিশন নির্ভুল হবার সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে কম, অবশ্য ফুটওয়ার্ক ঠিক হলে।

পূর্ব্বে রানিং আউট ড্রাইভের যে নির্দেশ দিয়েছি, সেটা প্র্যাকটিশ করে দেখলে মনে হতে পারে যে, এটা ব্যাটিং না কোনও নৃত্যের ভঙ্গী। টম লংফিল্ড তখন বড় খেলা ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জন্য কোচিং নিয়ে ব্যস্ত। তিনি শিক্ষার্থীদের এক সম্মেলনে বলেছিলেন ফুটওয়ার্ক-এর উন্নতি করতে ডানসিং, (বলরুম ডানসিং) খুব সাহায্য করে। সে কথা শুনে অনেকেই হাসাহাসি করেছিলেন। আজ অস্ট্রেলিয়ার টেনিস প্লেয়ারদের ফুটওয়ার্ক উন্নতি করার জন্য ব্যালে ডানসার-দের সাহায্য নেওয়া হয়, স্কিপিং তো অপরিহার্য। বলরুম ডানসিং ক্রিকেট জগতে বহু প্রচলিত, আমার মতে তা ফুটওয়ার্ক-এ বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানে বোধ করি, ডানসিং-এর বিশেষ চল নেই, কিন্তু স্কিপিং করতে বাধা নেই। ব্যাটিং-এ কৃতী হতে হলে সঠিক ফুটওয়ার্ক অত্যাবশ্যক। সুতরাং তরুণ শিক্ষার্থীদের অন্তত নিয়মিত ভাবে স্কিপিং করা উচিত, তার ফলে পায়ের জড়তা কেটে যাবে, ইচ্ছামতো দুটি পা ক্ষিপ্রগতিতে নাড়া-চাড়া করার বিশেষ সুবিধা হবে।

হুক ও পুল

কোন্‌টা হুক বা কোন্‌টা পুল শট্, সে বিষয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু সে মতানৈক্যে বিশেষ কিছু এসে যায় না। দু'টি স্ট্রোকই ব্যাক স্ট্রোকের পর্যায়

পড়ে, পিছনের বা ডান-পা কেন্দ্র করে। ডান-পা স্টাম্পের দিকে আড়াআড়ি পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই পায়ের উপর ভর করে, বাঁ-পা বলের দিকে এগিয়ে নিয়ে, হরাইজণ্টাল ব্যাটে অফ-এর বাইরের, স্টাম্পের উপর বা লেগ-স্টাম্পের বাইরের শর্টপিচ বল পুল বা টেনে মিডউইকেট থেকে ডীপ ফাইনলেগে মারা। মোটামুটি হুক এবং পুল শট্ মারার পদ্ধতি এই।

আধুনিক মতে যে বল মিডউইকেট থেকে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীর দিকে মারা হয়, সেটাকে বলা হয় পুল; আর স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারী থেকে ডীপ ফাইনলেগ, এমন কি উইকেটকীপারের বাঁ দিক দিয়ে যে মার হয়, তাকে বলা হয় হুক। হুক মারার বল সচরাচর ফাস্ট হয়, পুল মারার বল সাধারণত মিডিয়াম পেস্-এর বা স্লো।

হুক

হুক শটের কথা আগে বলি। সাধারণত হুক মারার বল হয় ফাস্ট শর্টপিচ বল—স্টাম্পের উপর বা লেগস্টাম্পের বাইরে, ঠুকে বা বাম্প না করিয়ে দিলেও ব্যাটসম্যানের কোমর এবং বুক পর্যন্ত সাধারণত ওঠে যে বল।

এমন বলে ব্যাটসম্যানের রান করার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ব্যাটসম্যানের পিছনের বা ডান-পা পিছিয়ে নিতে হবে উইকেটের আড়াআড়ি অফ স্টাম্পের দিকে, বুটের টো তখন প্রায় বোলারের দিকে, বাঁ-পা ডান-পায়ের বেশ তফাতে লেগস্টাম্পের দিকে এগিয়ে, দেখে নিতে হবে যেন ব্যাটে বলে না হলেও বলটা শরীরের বাঁ দিক ঘেসে চলে যায়। অনেক কৃতী ব্যাটসম্যান অবশ্য বলটা শরীরের উপরই নিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁরা সাধারণের ব্যতিক্রম। এই পোজিশন থেকে বল যখন পপিংক্রীজের কাছাকাছি, তখন হরাইজণ্টাল ব্যাটে হলেও ব্যাটের হ্যাণ্ডলংএর উপর রিস্ট বা কব্জি মুরে নিয়ে (যার ফলে ব্যাটের ফেস্ কিছুটা মাটির দিকে থাকে) বলটা সপাটে মারতে হবে, স্কোয়ারলেগ থেকে ফাইনলেগের মধ্যে। মারতে হবে, ডান-হাতের কব্জি, বাহু, কাঁধ, শরীরের সব শক্তি দিয়ে; ব্যাটের লিফট প্রথমে অফস্টাম্পের উপর ডান কাঁধের উপর হলেও, স্ট্রোক ও স্ট্রোকের জন্য ব্যাটের সুইং শেষ হবার পর বডি ঘুরে গিয়ে ব্যাটসম্যানের শরীর এবং দু'পায়ের টো উইকেটকীপারের দিকে হবে। ব্যাটের ফেস্ কব্জির সাহায্যে সামান্য মুড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় বলটা একটু 'চাপ্পা' মেরে মাটিতে রাখতে হবে যাতে ক্যাচ না ওঠে।

ফাস্ট বলে হুক করার বিপদের মধ্যে প্রথমত, বল ফস্কে গেলে ব্যাটসম্যানের শরীরে চোট লাগার আশঙ্কা। সেই কারণে বল পুরোপুরি শরীরের উপর না নিয়ে, বলের লাইনের সামান্য বাইরে অফসাইডের দিকে পোজিশন নেওয়া যুক্তি যুক্ত; বল সাধারণত শর্ট এবং স্টাম্পের থেকে উঁচু হয় সুতরাং বল
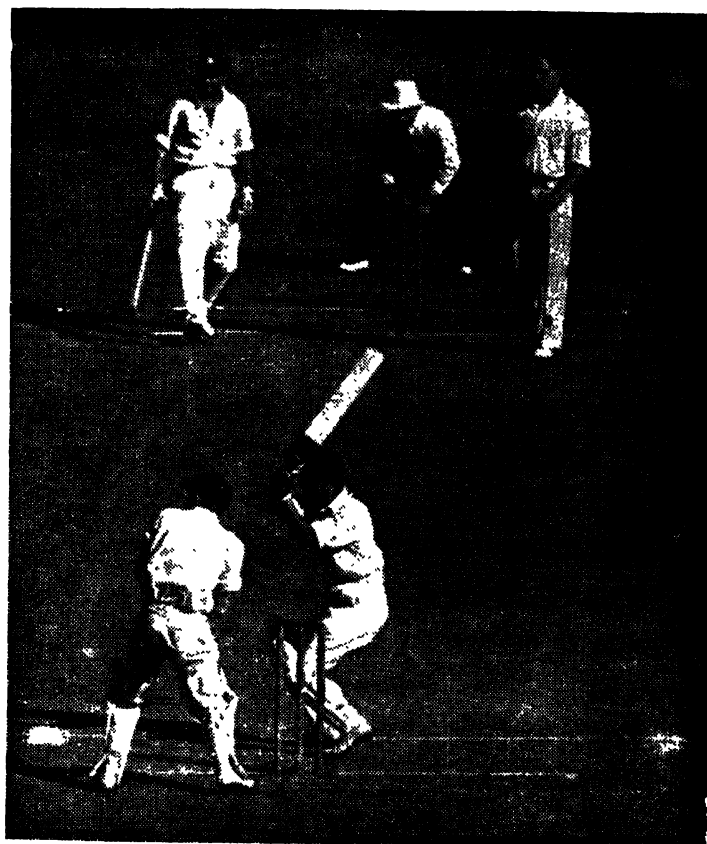
ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া—মেলবোর্ণ ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে হাজারে হুক করছেন। ক্যাপ্টেন অমরনাথ। ছবিতে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকীপার বেকার এবং ভিনু মানকাদ-কে মাঠের অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে।

ব্যাটসম্যানের বাঁ দিক ঘেঁসে ফস্কে গেলেও উইকেটকীপারের হাতে যাবে, বোল্ড বা অন্য কোনও রকমে আউট হবার সম্ভাবনা সচরাচর থাকবে না।

দ্বিতীয় বিপদ হল, ফাস্ট বল অপ্রত্যাশিত ভাবে মুখের দিকে লাফালে, অনেক সময় ব্যাটসম্যান আত্মরক্ষামূলক ভাবে ব্যাট উঁচু করে খেলেন, তার

ফলে শর্টলেগে ক্যাচ প্রায় অব্যর্থ; এমন ক্ষেত্রে বল ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আর যদি মারতেই হয়, সজোরে মারতে হবে শর্টলেগের ফিল্ডসম্যানদের তাক করে, যাতে ফিল্ডসম্যানদের পক্ষে ক্যাচ ধরা প্রায় অসম্ভব, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই তাঁরা হবেন ব্যস্ত।

তৃতীয় বিপদ—হুক এবং পুল শট মারতে—বল বিচার বা বাছাই করার ভুল; অতএব বল কতটা বাউন্স করে, উঁচু বা নিচু থাকে, সেটা ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে; বল স্টাম্পের উপর আ নবে ধরে নিয়ে ব্যাটসম্যান ব্যাট চালালেন, বল আশানুযায়ী উঠল না। ব্যাট বলে : উপর দিয়ে গেল, ব্যাটসম্যান হয় বোল্ড না হয় লেগবিফোর উইকেট; আর, বল আশানুযায়ী উচ্চতার উপরে হলে, ব্যাটের কানায় লেগে ক্যাচ। তাই হুক করার বল বাছাই করার সময় বিশেষ যত্নবান হতে হবে, বলের উপর তির্যক দৃষ্টি রাখতে হবে।

স্টাম্পের ওপর বা লেগস্টাম্পের বাইরে ফাস্ট বোলাররা ইচ্ছা করেই বল বেশী শর্ট এবং ঠুকে বা বাম্প করে দিয়ে থাকেন, বল সাধারণত বুক-মুখ পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠে। কখনও বা ব্যাটসম্যানের মাথা বা মাথার উপরেও। এ ধরণের বলের জন্য বোলার লংলেগে ক্যাচের আশায় ফিল্ডসম্যান রেখে থাকেন, ব্যাটসম্যানের কাঁধ বা তার উপরে বল হুক করার সমর কব্জি মুড়ে বল মাটিতে রাখা একপ্রকার অসম্ভব। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যাটসম্যান ব্যাট চালিয়ে বলের তলায় মেরে লংলেগের দিকে শূন্যে হুক করছেন যাকে বলা হয় লফটেড হুক। এই লফটেড হুক ফাস্ট বলে জোরে মার হলে লংলেগে ক্যাচ হবার যথেষ্ট ভয়।

সুতরাং এমন বল রীচ বা নাগালের বাইরে হলে আন্দাজে ব্যাট না চালিয়ে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। কিন্তু ব্যাটসম্যান বল ভাল করে দেখতে পেলে এবং বল রীচ-এর মধ্যে হলে, লফটেড হুক করা উচিত। বলা বাহুল্য বলের তলায় মারার জন্য স্ট্রোক শর্টলেগ ফিল্ডসম্যানদের মাথা টপকে যাবে, কিন্তু একে জোর বল তায় ফলো-থ্রু-সমেত ডান কব্জি, হাত, কাঁধ, একপ্রকার সমস্ত শরীরের শক্তি স্ট্রোকের পিছনে, তার ফলে বল লংলেগ বাউণ্ডারী পর্যন্ত যাওয়া স্বাভাবিক। অতি অসাধারণ ব্যাটসম্যান, যেমন ব্র্যাডম্যান এই লফটেড হুকও ফিল্ডসম্যান দেখে স্ট্রোক প্লেস করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণত ভাল ব্যাটসম্যান ইমপ্যাক্ট-এর সময় বলটা সামান্য আসতেই মারলে বল লংলেগ বাউণ্ডারী পর্যন্ত যাবে না। অবশ্য ফিল্ডসম্যানদের পোজিশন অনুযায়ী মার

জোর বা আস্তে করতে হবে, সম্ভব হলে স্ট্রোকের দিকনিয়ন্ত্রণও করতে হবে।

এ সব নির্দেশ কাগজে-কলমে দেওয়া বা মুখে বলা যত সহজ, কার্যক্ষেত্রে তত নয়, বেশ শক্তই। ফাস্ট বলে, সিদ্ধান্তগ্রহণ পলকে করতে হবে। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ওপনিং ব্যাটসম্যান ওয়াশব্রুকের ফাস্ট বলে হুক করার জন্য খ্যাতি ছিল। ১৯৪৮ সনে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড (ম্যানচেস্টার) মাঠে ইংলণ্ডের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট, প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়াল ওয়াশব্রুকের লফটেড হুক-এর ব্যাপারে বিশেষ আশক্তি দেখে (ডন ব্র্যাডম্যান অবশ্য ক্যাপটেন), যথারীতি লেগে ফিল্ড সাজিয়ে, হ্যাসেটকে রাখলেন লংলেগ বাউণ্ডারীর ঠিক এক হাত ভিতরে। লিণ্ডওয়াল পরিকল্পনা অনুযায়ী লেগস্টাম্পে শর্টপিচ বাম্পার দিলেন; ওয়াশব্রুক পত্রপাঠ লফটেড হুক মারলেন, বল গেল সোজা হ্যাসেটের দু'হাতে। হ্যাসেট্ ক্যাচ ফেলে দিলেন। লিণ্ডওয়ালের পরের বল একই, ওয়াশব্রুকের হুকও অভিন্ন, আবার ক্যাচ সোজা হ্যাসেটের দু'হাতের মধ্যে, আবার হ্যাসেটের মতো সুযোগ্য ফিল্ডসম্যানের হাত থেকে বল পপাত ধরণী-তলে!

লিণ্ডওয়াল দু'হাত আকাশের দিকে তুললেন—ভাবটা যেন ভগবান এ কী পরিহাস। যথারীতি অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য ফিল্ডসম্যান লাফিয়ে উঠলেন, ব্র্যাডম্যানও যেন একটু নড়লেন-চড়লেন, কিন্তু অপরাধী হ্যাসেট নির্বিকার, বাউণ্ডারীর পাশেই বসা এক পুলিশম্যানের মাথা থেকে হেলমেট্ তুলে নিয়ে দু'হাতে হেলমেট্‌টি ধরে ক্যাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইনাকুলারে দেখেছিলাম হ্যাসেটের 'পোকার ফেস্'—মুখে কোনও ভাবাবেশ নেই—ব্র্যাডম্যান মুচকি হাসছেন, মিলার হেসে গড়াগড়ি এমন কী ভুক্তভোগী লিণ্ডওয়ালের মুখও হাস্যোদ্ভাসিত। এটা পড়ে গ্লোরিয়াস আনসারটেনটি অব ক্রিকেট এর পর্যায়।

এই লফটেড হুকের অবশ্য আমাদের যুগে বেশ চল ছিল—ফাস্ট বোলারের ভয় ছিলই না, বরং ফাস্ট বল ঠেঙ্গাবার একটা প্রবল আসক্তি ছিল। কলকাতায় এলেক হোসি, কার্তিক বোস প্রমুখ ব্যাটসম্যান হুক স্ট্রোকে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ড্যালহাউসি ক্লাবের এক ব্যাটসম্যাস (মোটেই বিখ্যাত নয়), নাম সিম্পসন, দৈত্যসম আকৃতি (মিচেলীন টায়ার এর বিজ্ঞাপনের মূর্তির সদৃশ !) সিম্পসনকে দেখেছিলাম ফাস্ট বাম্পার হুক করে ব্যাটসম্যানের পিছনের দিকে স্ক্রীনের উপর

ওভারবাউণ্ডারী মারতে। কিন্তু নির্ভুল ভাবে দিকনিয়ন্ত্রণ করে। প্রয়োজন মত জোরে বা আস্তে লফটেড হুক মারা প্রথম দেখেছিলাম ইংলণ্ডের প্রখ্যাত ওপনিং ব্যাটসম্যান হারবার্ট সাটক্লিফের। জ্যাক হবসের জুটী—হবস্ ও সাটক্লিফ প্রায় অভিন্ন। দুজনে ১৯৩০ সনে বিজয়নগরের মহারাজকুমারের আমন্ত্রণে তাঁর দলে ভারতে খেলতে এসেছিলেন। খেলাটি হয়েছিল মার্কাস-স্কোয়ারে, স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। তেমন দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার আমাদের ছিল না, কিন্তু বোধ করি, আড়াআড়িতে বাউণ্ডারী ছোট লক্ষ্য করে সাটক্লিফের সেঞ্চুরীর মধ্যে অধিকাংশ রান হয়েছিল ঐ লফটেড হুক মেরে।

পরে ফাস্ট বলে হুকশটে বিশেষ পারদর্শী ব্যাটসম্যানের মধ্যে দেখেছি ব্র্যাডম্যান, এভারটন উইক্স্, এডরিচ, মুস্তাক আলী, মার্চেণ্ট, নাজীর আলী, ম্যাকলীন, হবস্, (সাউথ আফ্রিকা), বিল্ ব্রাউন আর ব্যাটসম্যান হিসাবে বিখ্যাত না হলেও উইকেটকীপার ব্যাটসম্যান ওয়ালী গ্রাউট্ (অস্ট্রেলিয়া), মাঞ্জ্রেকার, হানিফ মহম্মদ প্রভৃতিকে।

ফাস্ট শর্টপিচ বল লাফালেই যেন তেন প্রকারেণ ব্যাট চালিয়ে মারার চেষ্টা বিশেষ বিপজ্জনক , এমন ক্ষেত্রে ব্যাটে সামান্য লেগে উইকেটকীপারের হাতে ক্যাচ অব্যর্থ। ১৯৪৮ সনে হাটনের একটি টেস্টে বাদ পড়ার কারণই ঐ ধরণের হঠকারিতা। লিণ্ডওয়াল ও মিলার সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরে বাম্পার দিতেন, হাটন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট ঘুরিয়ে স্নিক করে উইকেটকীপারের হাতে আউট হতেন। মিডলসেক্সের জ্যাক রবার্টসনের ঐ দুর্বলতা না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করতেন।

হুক মারার সময় সাধারণ ভুল হল—বলটাকে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে মারার চেষ্টা , অর্থাৎ বল ব্যাটসম্যানের শরীর যখন পেরিয়ে যাচ্ছে তখন মারার চেষ্টা। বলা বাহুল্য সেক্ষেত্রে ব্যাটে বলে হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বলের সঙ্গে ব্যাটের ইমপ্যাক্ট করতে হবে অন্তত পপিংক্রীজের উপর, সম্ভব হলে তারও আগে, ব্যাটের ফুলফেস্ দিয়ে। তরুণ শিক্ষার্থীদের এ কথা মনে রাখতে হবে। ক্লাব-ক্রিকেটে প্রায়ই দেখা যায় লেগের বাইরে পরের পর বল, ব্যাটসম্যান হরদম হাঁকড়ে যাচ্ছেন কিন্তু ব্যাটে বলে হচ্ছে না। কারণ, বল ব্যাটসম্যানের শরীর পেরিয়ে যাবার পর ব্যাট চালানো হচ্ছে, ব্যাটে বলে হবে কী করে ?

বল ঠিক মতো বাছাই করে, নির্দেশ মতো ফাস্ট বল হুক মাটিতে বা লফটেড মারায় বিপদ বিশেষ নয়, সাহস ভরে খেললে সামান্য হুক স্ট্রোকে রান যথেষ্ট পাওয়া যায়, সুতরাং এই স্ট্রোকের ভাল ভাবে চর্চা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে, সোজা বা লেগস্টাম্পে প্রায়ই শর্টপিচ ফাস্ট বল, ব্যাটসম্যানও ক্রমাগত বল ছেড়ে দিয়েই খালাশ, তার ফলে বোলার পেয়ে বসবেন। এ অবস্থা কোনও ব্যাটসম্যানেরই বরদাস্ত করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন এই স্ট্রোক অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার সঙ্গে খেললে যথেষ্ট রান পাওয়া যায়। সমসাময়িক ক্রিকেটে একটা ধারণা হুকশট্ বিশেষ বিপজ্জনক, সেটা ভুল।

আর একটা কথা। যেমন ফাস্ট বাম্পার ব্যাক খেলার সময় বল বেমক্কা বেশী লাফালে ব্যাটসম্যানকে অনেক সময় ডাক্ বা মাথা নিচু করে নিতে হয়, তেমনই ফাস্ট বাম্পার হুক করার সময়ও ব্যাটসম্যানকে পলকে ডাক্ করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। বল বেশী বাম্প করলে, ব্যাটসম্যান নির্দেশ মতো বলের লাইন ছেড়ে সামান্য অফসাইডে সরে গেলে শারীরিক আঘাতের আশঙ্কা থাকবে না, কিন্তু ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানের এমন কী বোলারের অজান্তেও বল হঠাৎ মুখ বা মাথার দিকে ওঠে, তখন ডাকিং-এর বিশেষ প্রয়োজন। ডাকিং একটা আর্ট—ক্রিকেটের কলা-কৌশলের মধ্যে একটি বিশেষ অঙ্গ—ফাস্ট বোলিং খেলার জন্য অপরিহার্য। ডাকিং অবশ্য হবে সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়—আতঙ্কে নয়, যার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বেলায় ওয়েসলী হলের বিরুদ্ধে।

আতঙ্কগ্রস্ত ডাকিং বহু দেখেছি প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র। একটি দৃষ্টান্ত, ব্যাপারটা ঘটেছিল ঢাকায়। ভারতের দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার রামজী ময়মনসিংহের রাজ পরিবারের দলে এক প্রতিযোগিতায় খেলতে এসেছেন ঢাকায়। বিরুদ্ধ দলে একজন ব্যাটসম্যান, বোধ করি কুমারটুলী ক্লাবে খেলতেন, নাম ইউ পাল —বন্ধু বান্ধবের কাছে উদো পাল বলে পরিচিত।

রামজী ম্যাটিং উইকেটে পর পর তিনটি বাম্পার দিয়েছেন, উদো পাল যথারীতি ডাক্ করেছেন কিন্তু স্টাম্পের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। রামজীর পরের বল সোজা, বাম্পার নয়, স্টাম্পের সমান উঁচু। কিন্তু পাল মহাশয় সেবারেও ডাক করেছেন। বল সজোরে মাথার পিছনে, মাথার হাড়ে-বলে একটা বীভৎস আওয়াজ, পাল মহাশয় মুখ থুবড়ে স্টাম্পের উপর, আম্পায়ারের সমস্যা কী ভাবে আউট—লেগবিফোর উইকেট না হিট্‌উইকেট। অথবা কমপ্লিটলী ডেড!

কিছুদিন বাদে পাল মহাশয়ের সঙ্গে কলকাতায় দেখা, মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ, যথারীতি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম। পাল মহাশয় উত্তরে ঢাকার আম্পায়ারিং-এর যথেষ্ট নিন্দা করলেন, বললেন—মশায় মাথায় লেগে আউট হলুম, ঐ হাড়-বজ্জাত রামজীটার বলে, আর আম্পায়ার কী না দিল লেগবিফোর উইকেট। যদি আউট দিতেই হয়, তবে হেড-বিফোর-উইকেট, ঠিক কিনা বলুন ?

এ প্রশ্নের জবাব বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু এর শিক্ষা মনে গেঁথে গিয়েছিল। অর্থাৎ ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে প্রথম অবশ্যকরণীয় দু'টি বস্তু—সাহস ও বল বাছাই করার শক্তি। কথাটা হয়তো আধিক্যের দোষে দুষ্ট, কিন্তু ক্রমশ তরুণ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবেন এই সতর্ক বাণীর পুনরুক্তিতে ক্ষতি নেই।

পুল

পুলশট খেলার পদ্ধতি হুক-এর অনুরূপ, মাত্র কিছু তারতম্য করে নিতে হয়। আগেই বলেছি, পুল সাধারণত মিডিয়াম পেস থেকে স্লো বোলিং-এ করা হয়, স্ট্রোকের ডিরেকশন মিডউইকেট বাউণ্ডারী থেকে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারী পর্যন্ত। বল ফাস্ট না হওয়ার দরুণ সময় বেশী পাওয়া যায়, এবং শর্টপিচ বল পপিংক্রীজের আগেই মারা যায়, অনেক সময় স্ট্রোকের ডিরেকশন ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ বা প্লেস করা যায়। স্লো এমন কি মিডিয়াম পেস-এর বল অফ-এর বাইরে হলেও পুল করে বা টেনে অনবাউণ্ডারীতে মারা যায়।

বল সোজা স্টাম্পের উপর শর্টপিচ, ব্যাটসম্যানের পিছনের বা ডান-পা স্টাম্পের দিকে আড়াআড়ি পিছিয়ে নিতে হবে, ডান-পায়ের উপর জোর দিয়ে, বুটের টো তখন মিডঅফ এমন কি বোলারের দিকে ; বাঁ-পা ডান-পায়ের থেকে বেশ তফাৎ, বলের দিকে, ব্যাটের লিফট প্রথম সোজা স্টাম্পের উপরে। বল পপিংক্রীজের কাছে ব্যাটসম্যানের রীচ-এর ভিতর আসা মাত্র, হরাইজণ্টাল ব্যাটের ফেস কব্জির সাহায্যে সামান্য মাটিমুখো করে, ব্যাটেবলে ইমপ্যাক্ট হলে বল যাবে মিডউইকেট বাউণ্ডারীর দিকে।

হুকশট মারার নির্দেশমতো এক্ষেত্রেও ব্যাট পুরো সুইং করতে হবে, স্ট্রোকের পিছনে শরীরের ভর দিয়ে। সুইং-এর শেষে তাহলে দেখা যাবে ব্যাটসম্যানের মুখ, বুক, বুটের টো স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীর দিকে—যে পা

দুটি সুইং-এর শুরুতে বেশ তফাৎ ছিল সে দুটি এখন প্রায় পাশাপাশি। পুলশট মারার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, বল যেন মাটিতে থাকে, শূন্যে না ওঠে। এটা সহজ হবে ডান হাতে ব্যাট নিয়ন্ত্রণ করলে; কারণ বাঁ-হাতে বেশী জোর থাকলে বলের তলায় ব্যাট লাগার বিশেষ সম্ভাবনা। হুক শটের মতো অন্যান্য সতর্কতা অবশ্য অবলম্বন করতে হবে—যেমন বলের বাউন্স লক্ষ্য করা ইত্যাদি, যা বিশদভাবে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।

পুলশটে—কী ফাস্ট, মিডিয়াম বা স্লো বলে—স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের থেকে কৃতী ব্যাটসম্যান দেখিনি, বোধ করি দেখবও না। সারের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং তথাকথিত ফাস্ট বোলার স্টুয়ার্ট সারিজের পর পর তিনটি; সামান্য শর্টপিচ বল বুলেটের মতো যে ভাবে মিডউইকেটে ব্র্যাডম্যানকে মারতে দেখেছি, সে দৃশ্য আজ মানসপটে ভেসে উঠলেও লোমহর্ষণ হয়। আর মিডিয়াম-স্লো থেকে স্লো বোলার শর্টপিচ বল ফেললে তো রক্ষা নেই!

স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান বলেন, পুলশটের পূর্বোক্ত পদ্ধতির সামান্য অদল-বদল করে নিলে মারের জোর আরও বেশী হয়। পিছনের বা ডান-পা আড়াআড়ি উইকেটের দিকে না পিছিয়ে, স্টাম্পের দিকে সোজা পিছোতে হবে সামান্য; বাঁ-পায়ের টো স্কোয়ারলেগের দিকে কিন্তু দু'পায়ে বেশী ফাঁক থাকবে না; ডান-পা পিভট বা কেন্দ্র করে হরাইজণ্টাল ব্যাটের ফেস মাটির দিকে সামান্য কাত করে স্ট্রোকের পিছনে পুরো ব্যাট ও বডি সুইং দিয়ে মারলে, বল বাউণ্ডারীতে যাবে তড়িৎ গতিতে।

ব্র্যাডম্যানের এ স্ট্রোক দেখেছি—দেখে মনে হয়েছিল আমরা যাকে বলতাম শর্টআর্ম হুক, সেই রকমই। অর্থাৎ বল এমন—বলের স্পীড বা দ্রুত-গতি, বা ক্ষিপ্র-গতিতে বলের ব্রেক—যাতে আপতদৃষ্টিতে বল শর্টপিচ মনে হলেও, পুলশটের টেকনিক পূর্ণ বা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ না করতে পারলেও, টেকনিক-এর মূল নীতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বজায় রেখে পুল করা সম্ভব। শর্ট-আর্ম পুল না হলেও ব্র্যাডম্যানের পুল-এর দ্বিতীয় পদ্ধতি—শর্টআর্ম পুল-এর সমগোত্র।

পুল-এর জন্য উপযুক্ত বল মিডিয়াম পেস-এ ইনসুইং বা অফব্রেক—অবশ্য শর্টপিচ হলে। স্লো বলেও তাই, অফব্রেক হলেই ভাল। এ ধরণের বল অফ-এর বেশ বাইরে থেকেও পুল করা শুধু সম্ভব নয়, সহজ। কারণ স্ট্রোক হচ্ছে সুইং বা ব্রেকের অনুকূলে। অবশ্য বলের ডিরেকশন অনুযায়ী সে ক্ষেত্রে ডান-

পা অফ-এর বাইরে নিয়ে যেতে হবে, স্ট্রোকের অন্যান্য নির্দেশমতো (প্রথমোক্ত পুল, ব্র্যাডম্যান স্পেশ্যাল নয়) ব্যাট ও বডি-র সুইং, এবং ফুটওয়ার্ক করতে হবে। স্লো লেগব্রেক হলেও আপত্তি নেই, বল যদি বেশ শর্ট হয়, যদিও ক্রিকেটের গোঁড়া শিক্ষকমণ্ডলী বলবেন, ব্রেকের প্রতিকূলে কোনও স্ট্রোক বিষবৎ পরিত্যজ্য !

তরুণ শিক্ষার্থীদের অবশ্য প্রথম প্রথম এ চেষ্টা না করাই বিধেয়। কিন্তু এমন স্ট্রোক যা ব্যাটসম্যানের সম্পূর্ণ আয়ত্তে—দশবারের মধ্যে দশবার নির্ভুল ভাবে মারতে পারেন—সেটা তথাকথিত শাস্ত্রসম্মত নয় বলে এমন গোঁড়া বিধান আমি অন্তত মানি না। সুভাষ গুপ্তে ও ভিনু মানকাদ জগতের শ্রেষ্ঠ স্লো বোলারদের মধ্যে অন্যতম। তাঁদের শর্টপিচ লেগব্রেক বল ক্লাব স্ট্যাণ্ডার্ডের ব্যাটসম্যানও পুল বা হুক করেন, বড় ব্যাটসম্যানদের কথা নাই বললাম।

হুকশট্ মারার বিশেষজ্ঞের মধ্যে কয়েকজনের নাম আগে করেছি। পুল্ শট মারায় সুদক্ষ ব্যাটসম্যানের মধ্যে ব্র্যাডম্যানের নাম বলেছি, এই স্ট্রোকে যিনি অনুপম, অদ্বিতীয়। তার পরেই মনে আসে সি কে নাইডুর নাম, অফ-এর দু'হাত বাইরের বল পুল করতে যিনি ছিলেন ওস্তাদ ; অবশ্য বহু ক্ষেত্রে তিনি পিচ-এর মাথায় অফ-এর বেশ বাইরের বল অফব্রেকের মাথায় অনসাইডে টানতেন—যেটা হয়তো আধুনিক মতে ঠিক পুল বলা যায় না। নাইডুর একটি বিশেষত্ব ছিল যার জুড়ী কোনও দিনই ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও হওয়া একপ্রকার অসম্ভব; সোজা এমন কি অফ-এর বাইরে শুধু শর্টপিচ নয়, গুডলেন্থ লেগব্রেক ও পিচের মাথায় নির্ভুল ভাবে মিডউইকেটে বাউণ্ডারী বা ওভার-বাউণ্ডারী করতেন। তবে এক্ষেত্রে নাইডুর তুলনা নাইডুই। তরুণ শিক্ষার্থীদের এই স্ট্রোক অর্থাৎ পিচ-এর মাথায় লেগব্রেক পুল করা ভুলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। নাইডুর সাকরেদ মুস্তাক আলীও পুলশটে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ ব্যাটসম্যান পুল মারতে নারাজ, মারলে বল উঠে যায় বলে। কিন্তু ঠিক টেকনিক মতো খেললে পুলশটে বহু রান পাওয়া যায়, বিশেষ করে সাধারণত মিডঅন ও স্কোয়ারলেগের মধ্যে কোনও ফিল্ডসম্যান রাখা হয় না বলে। স্টলমায়ার, মিলার, বার্নস্, ও'নীল, হ্যাসেট্ প্রমুখ ব্যাটসম্যান এই শটের উপকারিতা এবং প্রচুর লাভের সম্ভাব্যতা দেখিয়েছেন। তাই, তরুণ শিক্ষার্থী এই হুক ও পুল নির্দেশ মতো প্র্যাকটিশ করলে ঠকবেন না।

ব্যাকফুট ড্রাইভ

ডিফেনসিভ ব্যাক-প্লের পরিচ্ছেদে বলেছিলাম, ব্যাক খেলা মানেই ডিফেনসিভ বা আত্মরক্ষামূলক নয়। ডিফেনসিভ ব্যাক খেলতে গিয়ে ব্যাটসম্যান হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, প্রথম দর্শনে বল গুডলেন্থ মনে হলেও বস্তুত শর্টপিচ, সে অবস্থায়ও কৃতী ব্যাটসম্যান শেষ মুহূর্তে কব্জি ও ফোর-আর্ম-এর জোরে আত্মরক্ষামূলক স্ট্রোকের বদলে আক্রমণাত্মক স্ট্রোক মেরেছেন এমন বহুক্ষেত্রে দেখা যায়।

এ পরিচ্ছেদে ব্যাকফুট ড্রাইভ-এর আলোচনা করব ; অর্থাৎ ব্যাক খেলেও স্ট্রেট ব্যাটে কী উপায়ে এ্যাগ্রেসিভ বা আক্রমণাত্মক ড্রাইভ করে রান করা যায়। শর্টপিচ বল অফ ও লেগস্টাম্প এবং সোজা স্টাম্পের উপর একটু বেশ শর্ট হলে—হরাইজণ্টাল ব্যাটে কাট, পুল, হুক স্ট্রোক করে রান করা যায়। লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরে শর্টপিচ বল স্ট্রেট ব্যাটে ব্যাকওয়ার্ড লেগগ্লান্স করে রান পাওয়া যায়।

কিন্তু বল স্টাম্পের উপর, গুডলেন্থের থেকে শর্টপিচ, যাতে স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে বল জোরে মারার সময় পাওয়া যায়, কিন্তু এমন বেশী শর্ট নয় যে, নিরাপত্তার সঙ্গে হরাইজণ্টাল ব্যাটে পুল বা হুক করা যেতে পারে। এই ধরণের বলই ব্যাকফুট ড্রাইভ করার উপযুক্ত, অবশ্য স্ট্রেট ব্যাটে।

ব্যাকফুট ড্রাইভ মারার প্রাথমিক মুভমেণ্ট—ব্যাটের লিফট, ডাউনওয়ার্ড স্থইং অর্থাৎ ব্যাট নামানো, ডিফেনসিভ ব্যাক প্লের মতোই কিন্তু পিছনের বা ডান-পা বলের লাইনে সোজা স্টাম্পের দিকে যাবে, ডান-পায়ে জোর, বাঁ-পা ডান-পায়ের কাছাকাছি। ডান-পায়ের সামনে থেকে ব্যাটের হ্যাণ্ডল সামনে রেখে ব্লেড সামান্য পিছনে (যার ফলে বল মাটিতে থাকে), কব্জি ও ফোর-আর্ম-এর সমস্ত জোর দিয়ে বল সামনে মারতে হবে, পুরো ফলো-থ্রু-সমেত। বল অবশ্য যথারীতি ওয়াচ করতে হবে। যে ড্রাইভ উপরে বর্ণনা করেছি, সেটা উইকেটের উপর সোজা শর্টপিচ বলে।

এটা হল ব্যাকফুট ড্রাইভ-এর টেকনিক যা তরুণ শিক্ষার্থীদের রপ্ত করতে হবে। তার পরে ব্যাকফুট ড্রাইভ-এর প্লেসিং। সোজা বলে ব্যাটসম্যানের স্ট্রোক বোলারের দিকে সোজা গেলে রান হবে না। স্থতরাং যা কৃতী ব্যাটসম্যানরা করে থাকেন, ব্যাটে বলে ইমপ্যাক্ট-এর সময়ে, স্ট্রেট ব্যাটের ফেস সামান্য অনসাইডে কাত করে নিলে, বোলারের ডান পাশ থেকে মিডঅন বা

তারও ওয়াইড, অর্থাৎ মিডঅন-এর ডান দিকে স্ট্রোক প্লেস করা যেতে পারে। অনসাইডে ফিল্ডসম্যান বেশী থাকলে, সুদক্ষ ব্যাকফুট ড্রাইভার সোজা বল ও ব্যাটের ফেস অফ-এর দিকে সামান্য কাত করে নিলে মিডঅফ অঞ্চলে মারা যায়।

অফস্টাম্পে বা অফস্টাম্পের সামান্য বাইরে মিডিয়াম বা মিডিয়াম ফাস্ট শর্টপিচ বলে (যাতে কাট মারা সম্ভব নয়) ব্যাকফুট ড্রাইভ-এ যথেষ্ট রান পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে টেকনিক একই তবে, পিছনের বা ডান-পা বলের লাইনে নিয়ে যেতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই, বলে যদি টার্ণ থাকে, নিরাপত্তার দিক দিয়ে ড্রাইভ টার্ণ-এর অনুকূলে করা সঙ্গত। অফস্টাম্প বা অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরের বলের ব্যাকফুট ড্রাইভে বিশেষ সতর্ক হতে হবে দুটি কারণে, প্রথমত, বল হঠাৎ লাফাতে পারে, দ্বিতীয়ত বল অফ-এর দিকে টার্ণ বেশী করতে পারে। দু'ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যান বিশেষ সতর্ক না হলে বল ব্যাটের হ্যাণ্ডল বা আউটার-এজ ছুঁয়ে স্লিপে ক্যাচ ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা। স্লো বলে ব্যাকফুট ড্রাইভ নিরাপদই বলা যেতে পারে। ব্যাক ফুট ড্রাইভ-এ তরুণ শিক্ষার্থীদের, স্ট্রোকের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ছাড়া, দু'টি কথা মনে রাখতে হবে—এর সাফল্য নির্ভর করে টাইমিং এবং বল মাটিতে রাখার উপর। স্লো বলে ব্যাটে-বলে ইমপ্যাক্ট তড়ি-ঘড়ি হবার সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে বোলার বা মিডঅফ বা মিডঅন-এ ক্যাচ ওঠার যথেষ্ট আশঙ্কা। আর, ব্যাকফুট ড্রাইভের উপযোগী উইকেট এমন হবে যে বল পিচ পড়ার পর সচরাচর এক হাইট-এ অর্থাৎ কম-বেশী লাফাবে না, এবং বিশেষ টার্ণ করবে না মিডিয়াম বা মিডিয়াম ফাস্ট বল হলে। স্লো বল ব্রেক করলে বা লাফালে সামলে নেবার সময় পাওয়া যাবে।

ব্যাকফুট ড্রাইভ-এ বিশেষ পারদর্শী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা। তার মুখ্য কারণ বোধ করি, দু'দেশের উইকেটই সাধারণত ট্রু হয়, অর্থাৎ উইকেটের বাউন্স-এ তারতম্য বিশেষ হয় না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নাম করা ব্যাটসম্যান মাত্র নয়, প্রায় সব প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যানই ব্যাকফুট ড্রাইভ-এ দক্ষ। অস্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। ওরেল, উইকস, সোবার্স, ওয়ালকট, স্টলমায়ার, কানহাই, ব্র্যাডম্যান, হার্ভে, হ্যাসেট, ও'নীল এবং আরও অনেক ব্যাটসম্যান ব্যাকফুট ড্রাইভ-এ যথার্থ কৃতী।

ভারতবর্ষের উইকেটে ব্যাকফুট ড্রাইভ-এর চল আগেই হওয়া উচিত ছিল,

কিন্তু হয়নি, যদিও আজকাল ব্যাকফুট ড্রাইভ-এর চল কিছু হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে অমরনাথই ব্যাকফুট ড্রাইভ-এ একমেবা দ্বিতীয়ম।

তার কারণ বোধ করি, তরুণ বয়সে অমরনাথের ক্রমাগত পাতিয়ালার ট্রু উইকেটে প্র্যাকটিশ, এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্টের অমরনাথের উপর প্রভাব। পাতিয়ালার উইকেট অস্ট্রেলিয়া থেকে মাটি এনে তৈরী। আর ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যদিও কৃতী ব্যাকফুট ড্রাইভার দেখেছি, ব্যাকফুট ড্রাইভে জো হার্ডস্টাফের সমকক্ষ কাউকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না।
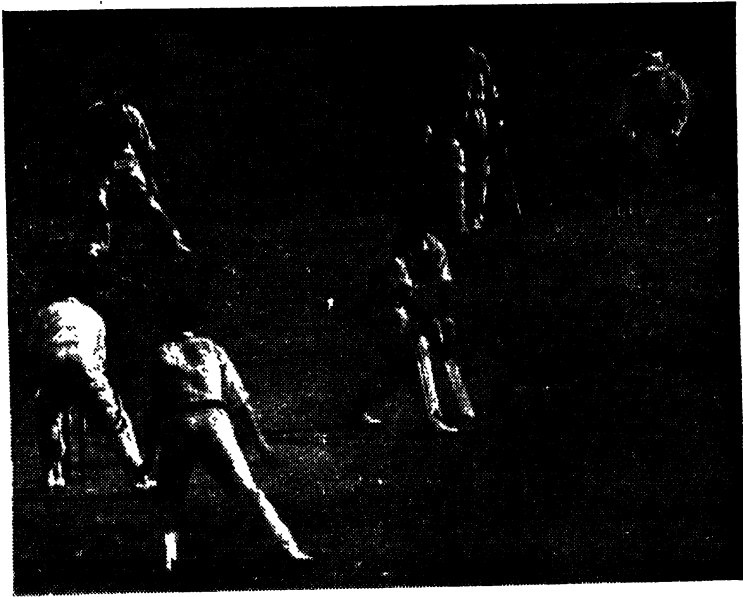
১৯৫১-৫২ সনে অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ম্যাচ। ওয়ালকট-কে ল্যাংলে স্টাম্প আউট করেছেন। ছবিতে হ্যাসেট, মিলার এবং উইক্‌স-কেও দেখা যাচ্ছে।

লেগগ্লান্স ব্যাক এবং ফরোয়ার্ড

লেগস্টাম্পের বা তার সামান্য বাইরে ফাস্ট মিডিয়াম বা স্লো বল—কিন্তু এমন ওভারপিচ নয় যে এগিয়ে অনড্রাইভ করা যায়, এমন শর্ট নয় যে পিছিয়ে গিয়ে পুল বা হুক করা যায়। এমন বলে ব্যাটসম্যান কী করবেন, কোনও মতে ঠেকিয়ে বা ব্লক করে সন্তুষ্ট থাকবেন? না, এমন বলে স্ট্রেট ব্যাটে ফরোয়ার্ড এবং ব্যাক খেলে স্কোয়ারলেগ থেকে উইকেটকীপারের বাঁ

পাশ, অর্থাৎ ডীপফাইনলেগ-এর অঞ্চলে রান করা যায়। এই দু'টি স্ট্রোকের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রথম পথপ্রদর্শক আমাদের ভারতেরই রঞ্জি। এই স্ট্রোক লেগগ্লান্স এবং লেগগ্লাইড দুটি নামেই পরিচিত। ফরোয়ার্ড গ্লান্স হবে ফরোয়ার্ড বা সামনের বা বাঁ-পা এগিয়ে ব্যাকওয়ার্ড গ্লান্স, ব্যাক বা পিছনের বা ডান-পা স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে।

ব্যাকওয়ার্ড লেগগ্লান্স

লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরে গুডলেন্থের সামান্য শর্ট, ফাস্ট বা মিডিয়াম পেস্-এর লেন্থের বলে ব্যাটসম্যান পিছনের বা ডান-পা আড়াআড়ি লেগ-স্টাম্পের দিকে পিছিয়ে নিয়ে, সামনের বা বাঁ-পা ডান-পায়ের ঠিক পাশে রাখবেন। বল বাঁ-পায়ের কাছাকাছি এলে ব্যাটসম্যান ব্যাক খেলার মতোই ব্যাট চালাবেন, কিন্তু বলের উপর ব্যাটের ফেস্ অনসাইডে একটু কাত করে। বল ইমপ্যাক্ট করলে, নিজস্ব গতিতে ফাইনলেগ অঞ্চলে যাবে। ডান-হাত হ্যাণ্ডল-এর নিচুতে নামিয়ে ব্যাট নিয়ন্ত্রণ করবে, বাঁ-হাত মাত্র গাইড। এখানেও ব্যাটের হ্যাণ্ডল ব্লেডের আগিয়ে থাকবে যার ফলে বল ব্যাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়বে, উইকেটকীপার বা শর্টলেগ বা লেগস্লিপে ক্যাচ যাবার সম্ভাবনা না থাকে।

প্রথম প্রথম অভ্যাসের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লেগগ্লান্সের টেকনিক্ মোটামুটি এই। বাঁ-পায়ের সামনে থেকে গ্লান্স, সুতরাং ব্যাটেবলে ইমপ্যাক্ট এর লাইনের সময় বাঁ প্যাড সামান্য বাঁ দিকে রাখা যুক্তিযুক্ত। খুব ফাস্ট বল বা মিডিয়াম পেস্-এর বল উঠতি বা পুরো বাউন্স-এর মাথায় ব্যাটের ইনসাইড এজ্ বা ব্যাটের ভিতর দিকের কানায় বল ছুঁয়ে, বা স্নিক হলে, উইকেটকীপারের হাতে যাবে না, বাঁ প্যাডেই বলের গতিরোধ হবে। সঠিক গ্লান্স হবে ব্যাটের প্রায় পুরো ফেস-এরই ইমপ্যাক্ট-এ। আগেই বলেছি লেগ-স্টাম্পের সামান্য বাইরের বলে লেগগ্লান্স করা বাঞ্ছনীয় কারণ ব্যাটসম্যান বল ফস্কে গেলেও বোল্ড বা লেগবিফোর উইকেট হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু লেগগ্লান্সে যাঁরা পারদর্শী তাঁরা আরও কয়েকটি জিনিষ করে থাকেন। বলেব্যাটে ইমপ্যাক্ট-এর সময় তাঁর কব্জির সাহায্যে ব্যাট ফ্লিক (বা শেষমুহূর্তে জোর দেন) করেন, যার উদ্দেশ্য বলের গতি বৃদ্ধি বা স্ট্রোকের ডিরেকশন্ নিয়ন্ত্রণ করা। ধরুণ, ডীপফাইনলেগে বাউণ্ডারীর উপর ফিল্ডসম্যান। গতানু-

গতিক ভাবে গ্লান্স করলে মাত্র এক রাণ কিন্তু ব্যাটের পুরো ফেস দিয়ে কব্জির ফ্লিক-এর ফলে বল যাবে স্কোয়ার বা লংলেগের দিকে, যাতে অন্তত চার না হলেও দু'রান পাওয়া যায়। তাছাড়া আজকাল শর্টলেগে দু'তিন জন ফিল্ডস-ম্যান রাখার রেওয়াজ, নিপুণ ব্যাটসম্যানদের তার মধ্যে গ্যাপ বা ফাঁক করে নিতে হয়, তাই রীস্ট-এর ফ্লিক-এর যথেষ্ট প্রয়োজন। লেগসাইডে ফরোয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড লেগগ্লান্সে এ ধরণের প্লেসিং করা, অথবা প্রয়োজন মতো—বল হঠাৎ লাফালে বা বেশী ব্রেক করলে অর্থাৎ সামান্য বিপদের আশঙ্কা থাকলে—বল ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে, স্যর লেনার্ড হাটনের জুড়ী দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

জ্যাক ইভারসন

লেকার

তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরের বলেই লেগগ্লান্স করা বিধেয়। কিন্তু অনেক নিপুণ ব্যাটসম্যানদের লেগস্টাম্প এমন কী লেগ এ্যাণ্ড মিডল্ স্টাম্পের বলেও লেগগ্লান্স করতে দেখা যায়, বিশেষ করে শর্ট-লেগে ফিল্ডসম্যানের ভিড় না থাকলে। দৃষ্টিশক্তি অবশ্য অতি প্রখর হতে হবে। তাছাড়া ব্যাটসম্যান যদি মনে করেন, ইনসুইং বা অফ থেকে টার্ণ বা (স্লো বোলার হলে) অফব্রেক এত বেশী যে বল ফস্কে গেলেও লেগবিফোর-উইকেট বা বোল্ড হবার সম্ভাবনা নেই, সে ক্ষেত্রে (বিশেষ ফরোয়ার্ড লেগ-গ্লান্সে) ব্যাটসম্যানের এই প্রচেষ্টা নিরাপদই বলা যেতে পারে। বলের টার্ণ-এর

অনুকূলে গ্লান্স করাই সঙ্গত, প্রতিকূলে করতে গেলে বিভিন্ন প্রকারে আউট হবার যথেষ্ট ভয়।

লেগগ্লান্স সঠিক ভাবে হলে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু আধুনিক ক্রিকেটে শর্টলেগে ফিল্ডসম্যানের আধিক্যে এবং ব্যাটসম্যানদের অত্যাধিক আত্ম-রক্ষামূলক মনোভাবের জন্য—লেগগ্লান্স বিশেষ দেখা যায় না। ফাস্ট ও মিডিয়াম পেস-এর বোলারদের কথা বলেছি, কিন্তু স্লো বলেও লেগগ্লান্স যথেষ্ট সম্ভব ও ফলপ্রদ। তবে ব্রেকের অনুকূলে করতে হবে এবং রীস্ট-এর ফ্লিক-এর এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, কার্তিক বোস; ইংলণ্ডের হাটন, কম্পটন, লোসন (ইয়র্কশায়ার); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হেডলী, স্টলমায়ার, সোবার্স; অস্ট্রেলিয়ার বিল ব্রাউন, বার্ণস, মরিস—কী ফাস্ট কী বা স্লো বলে গ্লান্সস্ট্রোকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

ফরোয়ার্ড লেগগ্লান্স

মূলত, ব্যাকওয়ার্ড গ্লান্সের উপরোক্ত টেকনিক ফরোয়ার্ড গ্লান্সেও প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য ফরোয়ার্ড গ্লান্সের বল বিভিন্ন হবে, লেগস্টাম্পের সামান্য বাইরে ওভারপিচ, এমন কি গুডলেন্থের সামান্য এগিয়ে (স্টাম্পের দিকে) হলেও ক্ষতি নেই। সামনের বা বাঁ-পা বলের লাইনে এগিয়ে বাঁ-প্যাডের সামনে থেকে, ব্যাটের ফেস অন্সাইডে সামান্য কাত করে, ডান হাত হ্যাণ্ডল-এর তলায় নামিয়ে, হ্যাণ্ডল থেকে ব্লেড সামান্য পিছনে রেখে, বল ফাইন লেগের দিকে গ্লাইড করতে হবে। মূলত ফরোয়ার্ড লেগগ্লান্স স্ট্রোকের পদ্ধতি এই।

তবে একটা কথা। ব্যাটসম্যানের মুভমেণ্ট ব্যাক লিফট, ডাউনওয়ার্ড সুইং, ফুটওয়ার্ক ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ খেলার মতোই হবে। মাত্র বাঁ-পা একটু সোজা এগোতে হবে বলের দিকে এবং ব্যাটেবলে ইমপ্যাক্ট-এর সময় ব্যাট ডেড হবে না, ব্যাটের সামান্য গতি থাকবে। পরিণত ব্যাটসম্যান অবশ্য শেষ মুহূর্তে রীস্ট এর ফ্লিকও দিতে পারেন, যার কারণ আগেই বিশদ ভাবে বলা হয়েছে। বাঁ প্যাড সোজা রাখার উদ্দেশ্য, বল প্যাডে লাগলেও লেগবিফোর উইকেট হবার ভয় নেই।

ব্যাকওয়ার্ড লেগগ্লান্সে যাঁরা পারদর্শী তাঁদের কয়েকজনের নাম করেছি, ফরোয়ার্ড গ্লান্সেও তাঁরা সুদক্ষ ছিলেন। কিন্তু লেগগ্লান্সের আবিষ্কারক, রঞ্জির খেলা চোখে দেখেনি। বইয়ে পড়েছি, এবং রঞ্জির সমসাময়িক খেলোয়াড়

সি বি ফ্রাই-এর মুখে শুনেছি, রঞ্জির এই লেগগ্লান্সে ক্রিকেট জগতে কী সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁর এই অত্যাশ্চর্য অভিনব লেগগ্লান্সে সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত বোলার—বিশেষ করে ফাস্ট বোলাররা কী ভাবে নাজেহাল হতেন দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার, রঞ্জিকে লেগস্টাম্পে বল দিয়েছেন, রঞ্জি যেন স্থাণুবৎ। বল প্যাডে বা স্টাম্পে লাগে-লাগে, শেষ মুহূর্তে ভেলকীর মতো কী হল, রঞ্জির ব্যাট বলে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কব্জি দিয়ে একটা ফ্লিক, বল তড়িৎ গতিতে গেল ফাইনলেগ বাউণ্ডারীতে!

১৯৩৫ সনে সারে এবং ইংলণ্ডের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার বিল্ হিচ-এর সঙ্গে আলাপ, রঞ্জির লেগগ্লান্সের কথা উঠল। ভুক্তভোগী বিল্ হিচ বললেন: রঞ্জির ভোজবাজীর কথা আগেই শুনেছিলাম, স্রেফ আন্দাজে মার ছাড়া আর কোনও কথা মনে হয় নি। মনে মনে ঠিক করেছিলাম সারে আর সাসেক্সের খেলায় রঞ্জিকে দেখে নেব। রঞ্জি ব্যাট করতে নামলেন, আমি বীরবিক্রমে ফাস্ট বল করলাম। আমার প্রথম বলেই রঞ্জি প্রায় আউট হতে হতে বেঁচে গেলেন, শেষ মুহূর্তে কিন্তু বল বাউণ্ডারীতে। তখনও দৃঢ় ধারণা আমার, স্ট্রোকটা ফ্লুক ছাড়া কিছু নয়—তখন সকাল সাড়ে এগারটা। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় দিনের শেষ ওভারে বল দিচ্ছি—রঞ্জি তখনও ফ্লুক করে চলেছেন! তাঁর বক্তব্য শেষ হলে, একটু বাদে বিল্ হিচ বলেছিলেন: রঞ্জি ওয়াজ এ ম্যাজিসিয়ান, নট্ এ ব্যাটস-ম্যান!—যে কথা স্বীকৃতি লাভ করেছে ক্রিকেট সাহিত্যের পাতায় পাতায়, বিশ্বের ক্রিকেট অভিজ্ঞ মহলে শুধু নয়, সাধারণ ক্রিকেটভক্তের মনেও।

সুইপ শট

সুইপ-এর অর্থ ঝাড়ু মারা, সুইপশট দেখলে সেই কথাই প্রথম মনে আসে। লেগস্টাম্পের বেশ কিছুটা বাইরে ওভারপিচ স্লো বল, সোজা ব্যাটে অন্‌ড্রাইভ করলে গোঁড়া শিক্ষকরা হয়তো খুশী হবেন, কিন্তু তাতে মারের জোর তেমন হবে না, স্ট্রোক প্লেস করাও শক্ত, অন্য ভাবে বিপদের আশঙ্কা কম নয়। যেমন ধরুন, লেগস্টাম্পের বাইরে স্লো অফব্রেক, লেগে ফিল্ড সাজানো, সোজা ব্যাটে ড্রাইভ করতে গেলে, বল অপ্রত্যাশিত ভাবে বেশী ব্রেক করলে স্ট্রোকের ডিরেকশন নিয়ন্ত্রণ তো করা যাবেই না, অনসাইডে ক্যাচ ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকবে। তাছাড়া উইকেট কভার না করে ড্রাইভ করতে হবে, বল বেশী লেগব্রেক হলে ক্যাচ ওঠার, বল ফস্কে গেলে বোল্ড হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

এমন বলে লেগে সুইপ করাই বিধেয়। সামনের বা বাঁ-পা, স্টাম্প থেকে একটা কাল্পনিক লাইন করে বলের দিকে এগিয়ে, বাঁ-হাটু ভাঁজ করে মাটিতে গেড়ে প্রায় হরাইজণ্টাল ব্যাটে বল সাপটে মারতে হবে স্কোয়ারলেগের পিছনে। স্ট্রোক মারার সময়ে বলের ফ্লাইটের লাইনের উপর থেকে বল মারতে হবে, মাটির দিকে। সেটা সম্ভব হবে যদি কব্জিটি হ্যাণ্ডল-এর উপর মুড়ে নিয়ে ব্লেডের ফেস মাটির দিকে সামান্য কাত করে নেওয়া হয়। অন্যথায় স্লো লেগব্রেকের বিরুদ্ধে সুইপশট বিশেষ বিপজ্জনক হবে, ব্যাটের আউটার এজ-এ লেগে স্কোয়ারলেগে ক্যাচ ওঠার যথেষ্ট ভয়।

ঠিক ভাবে ব্যাটের ফেস মাটির দিকে চেপে না মারার জন্য ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ারলেগে বহু ক্যাচ উঠতে দেখেছি। একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে—১৯৫৮ সনের কানপুর টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড যাঁর, সেই

ব্র্যাডম্যানের ব্যাক-লিফট

৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন
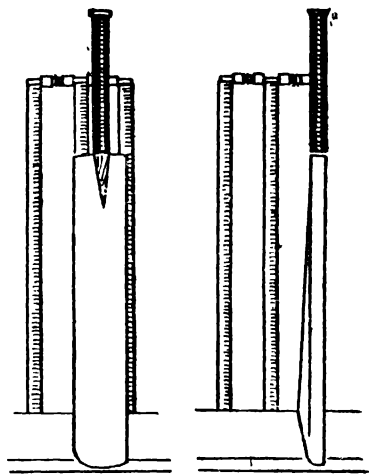
১। মিড্‌ল স্টাম্প গার্ড

২। লেগ স্টাম্প (৫০ পৃষ্ঠা)

গারফিল্ড সোবার্স সুভাষ গুপ্তের লেগের বাইরে একটি ওভারপিচ গুগ্‌লী (লেফ্‌টহ্যাণ্ড সোবার্সের লেগব্রেক) সুইপ করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের হাতে মিস-হিট্ করে লোপ্পা ক্যাচ তোলেন। আর লেগের বাইরের সুইপ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডীপ লেগব্রেক বলে ব্যাটসম্যান বোল্ড হয়েছেন—রাউণ্ড দি লেগ—অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের বাঁ পায়ের বাইরে লেগে পিচ করে বড় ব্রেক করে বল বাঁ-পায়ের বাইরে দিয়ে ঘুরে স্টাম্পে লেগেছে।

এই জন্যই বাঁ-পা এগোন উচিত স্টাম্প থেকে একটা কাল্পনিক লাইন করে বলের লাইনের দিকে , তাহলে রাউণ্ড দি লেগ বোল্ড হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

সুইপশটে বিশেষজ্ঞের মধ্যে অনেক ব্যাটসম্যান দেখেছি, যেমন ভারতে ১৯২৬-২৭ সনে আর্থার গিলিগ্যানের দলের বব্ ওয়্যাআট, দলীপসিং জী, ডেনিস কম্পটন্, ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, লিয়ারী কনস্টানটাইন, কীথ মিলার, মুস্তাক আলী প্রমুখ বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যাটসম্যান। কিন্তু এ্যালেক হোসির লেগে সুইপ আজও চোখের ওপর ভাসে , খেলাটা হয়েছিল ইডেন-গার্ডেনে। বোম্বাই তখন হোসির কর্মস্থল, ক্রীস্টমাসের ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। ভারতে সে সময় বহু বিরাট ইংরাজ কাউন্টি ক্রিকেটার, ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্টের দলের বিরুদ্ধে হোসি খেলছেন। সেঞ্চুরী করলেন লাঞ্চের আগেই, তার মধ্যে অন্তত ৪০ রান লেগসুইপ-এ তখনকার দুর্ধর্ষ ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্টের বিরুদ্ধে! আর সে সময়ে ট্যারাণ্ট—কুড মেক দি বল টক—খুশীমতো বল ফেলতে ও ছোট-বড় ব্রেক করাতে পারতেন।

সুইপশট মেরে বহু রান পাওয়া যায়, সুতরাং এই স্ট্রোক বিশেষভাবে রপ্ত করা উচিত। আজকাল লেগসাইডে একাধিক শর্টলেগ ফিল্ডসম্যান সাজিয়ে লেগে ওভারপিচ বল করা একটা অভ্যাস (বদভ্যাস ?) দাঁড়িয়ে গেছে—এমন ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান নিষ্ক্রিয় না থেকে, সাপটে ঝাড়ু বা সুইপশট মারলে শুধু রানই পাওয়া যাবে না, শর্টলেগ ফিল্ডসম্যান গোষ্ঠী ছত্রভঙ্গ হবে, বোলারেরও আত্মবিশ্বাস কমবে। অন্যান্য স্ট্রোকের মতো সুইপশট-এও রিস্ক আছে। যে কোনও স্ট্রোকেই অল্পবিস্তর ঝুঁকি থাকে, সুতরাং ব্যাট স্থাণুবৎ রাখব, এ মনোভাবের আমূল পরিবর্তন না হলে ব্যাটিং-এ সাফল্য হতে পারে না। এ কথা সদা সর্বদা মনে রাখতে হবে।

স্ট্রোকের প্লেসিং

ব্যাটিং-এ মোটামুটি যে সব স্ট্রোক অল্পবিস্তর সঠিক বর্ণনা করা যায় এবং বহুপ্রচলিত, সেই সব স্ট্রোকই ব্যাখ্যা করেছি। এই স্ট্রোকগুলির বহু তারতম্য হয়, ব্যাটসম্যানের নিজস্ব প্রতিভাগুণে, যে প্রতিভা কোনও ছক-এ বাঁধা নয়। যেমন—যাঁদের চোখে দেখেছি ব্র্যাডম্যান, নাইডু, কনস্টানটাইন, ডেনিস কম্পটন, মুস্তাক আলী, চার্লি বারনেট, হ্যারল্ড গিম্বলেট (সমারসেট ও ইংলণ্ড) ইত্যাদি। যদি কেউ মনে করেন স্বভাবতই এঁরা আনঅরথডক্স

অর্থাৎ ব্যাটিং-এর মূলনীতি শিক্ষা করেন নি, সে ধারণা হবে মস্ত ভুল। সব কিছুই তাদের নখদর্পণে, কিন্তু তাঁদের প্রতিভা সেই শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়, ব্যাটিং-এর এই সীমা যে শেষ সীমা সে কথা এঁরা মানতে চান নি এবং মানেনও নি। জগতের প্রায় সকল ক্রিকেট শিক্ষার ও ক্রিকেট সাহিত্যের বইয়ে শোভাবর্ধন করে লিয়ারী কনস্টানটাইনের হাফ-কাট-হাফ-ড্রাইভ—যাতে প্রকাশ পায় একটা বাঁধভাঙা সজীবতা, আদিম হলেও সুন্দর ও মনোহর।

সি কে নাইডু

কিন্তু এ হল অসাধারণ প্রতিভার কথা, যাঁদের কীর্তিকলাপ দেখে বিস্ময় ও পুলক জাগে, কিন্তু তাঁদের পদ্ধতির অনুকরণের চেষ্টা হবে মারাত্মক। সাধারণ ব্যাটসম্যানের কথাই বলি। ধরে নেওয়া যাক, নির্দেশমতো সব স্ট্রোক অভ্যাস করে স্ট্রোকগুলি ব্যাটসম্যানের আয়ত্তের মধ্যে এলো। অফ-এর বাইরে হাফভলী ব্যাটসম্যান কভারড্রাইভ করলেন, বল কভার পয়েন্ট ফিল্ড করলেন। লেগস্টাম্পে ওভারপিচ বল ব্যাটসম্যানের অনড্রাইভ গেল মিড অন ফিল্ডসম্যানের কাছে। উভয় ক্ষেত্রেই কানুন-মাফিক স্ট্রোক হল বটে, কিন্তু রান হল না। টেস্ট ম্যাচেও দেখেছি, এক ওভারে ছ'টা বলই ব্যাটসম্যান সপাটে মারলেন কিন্তু একটি রানও হল না। ফিল্ড সাজানো কী এমনই নিখুঁত? না, ব্যাটসম্যান স্ট্রোক প্লেস করবার চেষ্টা করছেন না, বা প্লেস করতে পারছেন না। কিন্তু ভাল ব্যাটসম্যান হতে হলে স্ট্রোক প্লেস করতেই হবে।

কভার ড্রাইভ-এর আদর্শ বল, কিন্তু কভারে ফিল্ডসম্যান যথারীতি আছেন, এক্ষেত্রে ভাল ব্যাটসম্যান সামান্য আগে বা পরে মেরে কভার-পয়েন্টের ডান বা বাঁ পাশ দিয়ে রান করবার চেষ্টা করবেন। যাকে বলে ফিল্ডে গ্যাপ বা ফাঁক বার করে নেওয়া। লেগস্টাম্পের ওপর ফাস্ট বল, মাত্র ডীপ ফাইনলেগ রাখা হয়েছে, ব্যাটসম্যান গতানুগতিক ভাবে খেললে মাত্র এক রান, কিন্তু সামান্য এগিয়ে, ব্যাট বলের ওপর জোর দিয়ে ইমপ্যাক্ট করলে, বল যাবে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীর সামান্য পিছনে, চার রান পাওয়া

যাবে। আগেই বলেছি কোন্ ফিল্ডসম্যান কোথায়, একবার দেখেই ব্যাটসম্যানের মানস পটে সেটা ধরে রাখতে হবে। মাত্র নির্ভুল ভাবে স্ট্রোক মারলেই চলবে না, ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্য হবে বুদ্ধি খাটিয়ে স্ট্রোক প্লেস করে
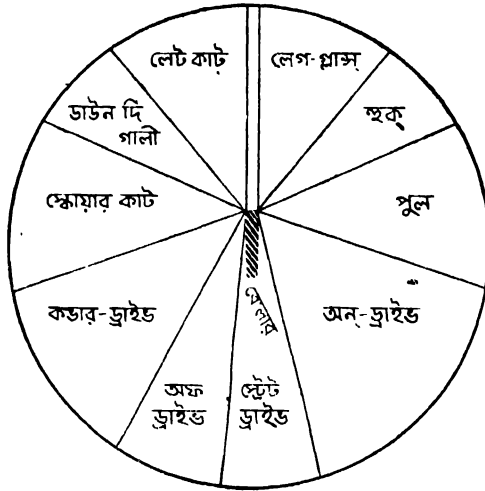
স্ট্রোকের বিভিন্ন পোজিশনের চিত্র

যত বেশী সম্ভব রান করা। মাত্র দু' একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি, কিন্তু বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে স্ট্রোক প্লেস করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে এর সম্ভাবনা প্রচুর। বড় ব্যাটসম্যানের খেলা ভাল করে নজর করলেই তরুণ শিক্ষার্থীরা সে কথা বুঝতে পারবেন।

প্রথম শ্রেণীর, এমন কী টেস্ট ম্যাচে, নাম করা ব্যাটসম্যানদেরও একটি সাধারণ ভুল করতে দেখেছি। ধরুন, স্লো বোলার বল করছেন, ব্যাটসম্যান সজোরে স্ট্রোক করছেন কিন্তু ফিল্ডসম্যানের ব্যূহ ভেদ করতে পারছেন না। এমন ক্ষেত্রে বল আস্তে পুশ করে বা ঠেলে দিয়ে এক-এক রান পাওয়া যায়। অথবা নতুন বলে ফাস্ট বোলাররা বল করছেন, ব্যাটসম্যান স্টাম্পের উপর সোজা বল ব্যাক খেলে পাঠাচ্ছেন বোলারেরই হাতে। অনেক সময় এটা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে ব্লেডের ফেস অনসাইডে একটু টার্ণ করে এক বা দুই রান নেওয়া যায়, কভারপয়েণ্টের দিকে আস্তে প্লেস করে একটা রান সহজলভ্য।

অবশ্য এমন ব্যাটসম্যান বহু দেখেছি যাঁরা এভাবে রান নিয়ে থাকেন। কিন্তু যে বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে, পলকে হব্‌স ও সাটক্লিফকে শর্ট রান নিতে

দেখেছিলাম তার জুড়ী আজ পর্যন্ত দেখিনি। তাঁদের কাছাকাছি আসতে পারতেন ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত কম্পটন ও এডরিচ। শর্ট রান নিতে হলে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আনডারস্ট্যাণ্ডিং অর্থাৎ পরস্পরের মন বোঝাপড়ার একান্ত প্রয়োজন। সব ব্যাটসম্যানদেরই সুবিধা পেলেই রান নিতে হবে, বিশেষ করে ওপনিং ব্যাটসম্যান-দের, যখন বোলিং ও ফিল্ডিং হয় বিশেষ টাইট—নতুন বলে বাউণ্ডারী করার সম্ভাবনা যখন কম। তখন শর্ট রান নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্রমশ, বোলিং ও ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ করতে এই শর্ট রান নেওয়া বিশেষ কাজে লাগে।

গুডলেন্থ বল, বা নতুন বল হলেই যে ব্যাটসম্যান বোলারকে মেডেন-এর পর মেডেন দিয়ে বাধিত করবেন, এমন কোনও কথা নেই। ফুটওয়ার্ক-এর ফলে গুডলেন্থ বল শর্ট বা ওভারপিচ করা সম্ভব। অবশ্য তার জন্য মূলত প্রয়োজন ব্যাটসম্যানের আক্রমণাত্মক মনোভাব। আগেই বলেছি, ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানে ও বোলারে সদাই বুদ্ধির লড়াই, সুতরাং ভাল ব্যাটসম্যান অনুক্ষণ চেষ্টা করবেন বোলারকে দাবিয়ে রাখতে। সেটা সম্ভব হয় যদি ব্যাটসম্যান বোলারের বলে যথেচ্ছ রান করতে পারেন। যথেচ্ছ কথাটা অবশ্য বাড়াবাড়ি, কারণ বোলারও সুদক্ষ। এ্যাগ্রেসিভ এ্যাপ্রোচ বা আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে ব্যাটসম্যান যথাসম্ভব রান করলেই হল। এক কথায় ব্যাটসম্যান সব সময়ে রান করায় সচেষ্ট থাকবেন, এটাই হল ব্যাটিং-এর বড় কথা। বিশেষ বিপাকে পড়লে, দলের যখন ভরাডুবি তখন অবশ্য আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে হতে পারে সে কথা মানব, অন্যথায় নয়। সব যুগেই, বিশেষ করে আজকের যুগে, বহু ব্যাটসম্যান খুব খারাপ বল না পেলে স্ট্রোক করতে রাজী নন। এ ধরণের ব্যাটসম্যানের জন্যই ক্রিকেটের আকর্ষণ আজ ক্রমশ কমে আসছে। আর আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন এ ধরণের

নিখুঁত স্টান্সে দাঁড়িয়ে জ্যাক হব্‌স। পৃষ্ঠা ৪৬ দেখুন

ডিফেনসিভ ব্যাটসম্যান মারবার বল পান, তখনও তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন না!

সত্যই প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান একই বল একাধিক স্ট্রোক মেরে রান করতে পারেন। শুনেছি অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টর ট্রাম্পার নাকি ঠিক একই বলে পর পর তিনটি বিভিন্ন স্ট্রোক করে বাউণ্ডারী করেছিলেন। প্রথমটি স্কোয়ার কাট, দ্বিতীয়টি স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীতে হুক এবং তৃতীয়টি, ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে বোলারের মাথার উপর দিয়ে স্ট্রেট ফিল্ডে বাউণ্ডারী! মনে হয়েছিল গল্প কথা, কিন্তু কথাটা বলেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট—তাঁর নিজের চোখে দেখা। বোলার নাকি ছিলেন ফাস্ট, বলও নতুন। ১৯৩৩

ফরোয়ার্ড ডিফেনসিভ খেলার সময় বাঁ-কব্জি ব্যাটের অনেক কাছে রয়েছে।
(পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

সনে অমৃতসরে, এম সি সি-র ফাস্ট বোলার লেফট-ক্লার্ক অফস্টাম্পের ইঞ্চি ছয়েক বাইরে একই লেন্থের দুটি সামান্য শর্ট বল পর পর দিয়েছিলেন। প্রথম বল অমরনাথ স্কোয়ারকাট করে বাউণ্ডারী, অধিনায়ক জার্ডিন স্কোয়ারলেগকে টেনে এনেছিলেন অফসাইডে। পরের বল একই, অফ-এর বাইরে সামান্য শর্টপিচ, অমরনাথ সে বল বিদ্যুৎ বেগে হুক করেছিলেন স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীতে। এটা স্বচক্ষে দেখেছিলাম। স্লো বলে—বিশেষ করে শর্টপিচ স্লো বলে—অবশ্য একই বল একাধিক স্ট্রোক সাধারণ ব্যাটসম্যানও মেরে থাকেন।

এ সব দৃষ্টান্ত অবশ্য সাধারণের পর্যায় পড়ে না। কিন্তু সাধারণ ব্যাটসম্যান অল্প বিস্তর স্ট্রোক করতে পারেন, ফুটওয়ার্ক-এর সাহায্যে ও সামান্য বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে। অন্যথায় যে কোনও বোলার যাঁর লেন্থ ও ডিরেকশন ঠিক আছে, ব্যাটসম্যানকে আটকে রাখতে পারবেন। চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে সব কিছুই সম্ভব। কিন্তু ব্যাটসম্যানের মূল প্রয়োজন এ্যাগ্রেসিভ এ্যাপ্রোচ—আক্রমণাত্মক মনোভাব।
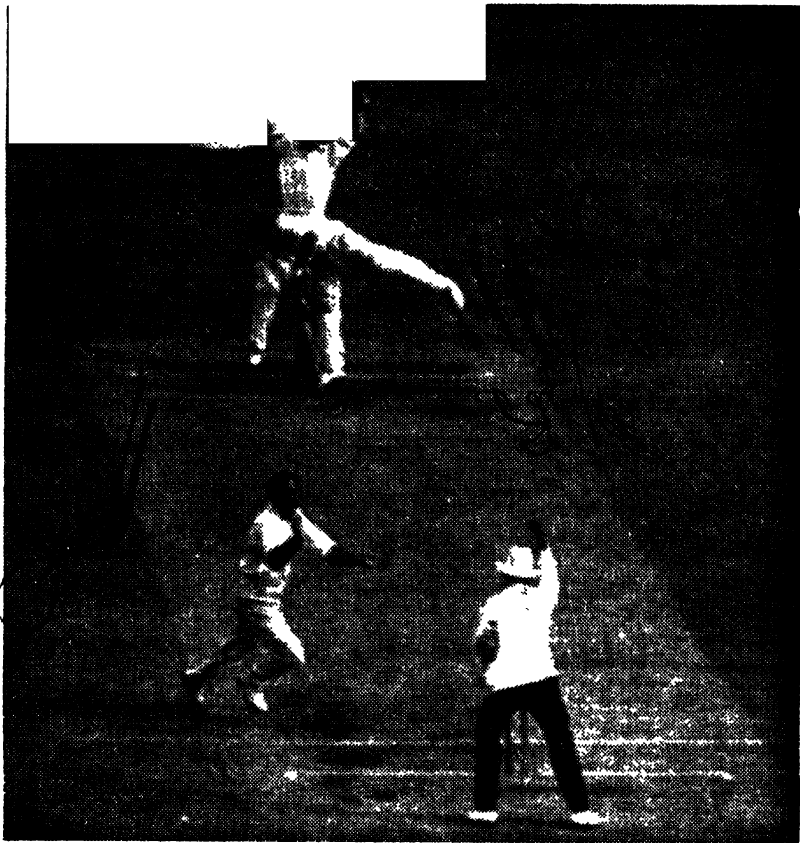
আউট সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া—
সিডনি বার্ণ অমরনাথকে লেগ বিফোর উইকেট-এ আউট করেছেন।

রানিং বিটুইন উইকেটস

স্ট্রোক বর্ণনার সময় রানিং বিটুইন উইকেটস অর্থাৎ ব্যাটসম্যান স্ট্রোক মারার পর উইকেটের মধ্যে কি ভাবে দৌড়ে রান নেবেন, সে কথার অল্পবিস্তর দৃষ্টান্ত দিয়েছি —যেমন হব্‌স এবং সাটক্লিফের শর্ট রান নেওয়া ইত্যাদি। বলেছি, তাঁদের মধ্যে নির্ভুল আনডারস্ট্যাণ্ডিং-এর কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁরা ক্রিকেটের নিয়মমতো কল করতেনও না। ইয়েস, নো বা ওয়েট।

ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান নয় প্রকারে আউট হতে পারেন, কিন্তু রানআউট হওয়ার সঙ্গে শুধু দুর্ভাগ্য নয় যেন একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকে। অথচ ব্যাটসম্যান রানআউট হন দুর্ভাগ্যবশত নয়, হন বিচারের ভুলে, নির্বুদ্ধিতা

বা সজাগ ও সতর্কতার অভাবে। আর এমনও কম দেখিনি—মায় টেস্ট ক্রিকেটেও—অত্যধিক স্বার্থপর ব্যাটসম্যান নিজের স্বার্থের জন্য অন্য ব্যাটসম্যানকে একপ্রকার বলিই দেন। দলগত স্বার্থের জন্য পার্টনারকে বলিদানের কথা বলছি না, দু'জন ব্যাটসম্যানের একজন নিশ্চিত আউট হবেন, ধরুন ব্যাট করছেন আমাদের কনট্রাকটর ও জাশু প্যাটেল, সে ক্ষেত্রে জাশু প্যাটেলকে যদি আউট করে দেন কনট্রাকটর, সেটা হবে দলগত স্বার্থের জন্য। উম্রিগড় বা আব্বাস আলী বেগকে আউট করলে সেটা হবে ব্যক্তিগত চূড়ান্ত স্বার্থপরতার জন্য।

এখানে ব্যাটসম্যানদের রান নেবার যে ক'টি প্রচলিত নিয়ম আছে সেগুলি উল্লেখ করব। প্রথমত, ব্যাটসম্যান যদি কাট বা হুক করেন, তখন নন-স্ট্রাইকার যিনি বোলারের দিকে আছেন, তিনিই কল করবেন 'ইয়েস' 'নো' বা 'ওয়েট', নন-স্ট্রাইকারের বিচারে রান সম্ভব কী না সেই হিসাবে। এই মূল নীতির তাৎপর্য এই যে উইকেটের পিছনে বল গেলে, নন-স্ট্রাইকার বলটা অপেক্ষাকৃত ভাল করে দেখতে পান এবং সাধারণত স্ট্রাইকার-এর দিকের উইকেট বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং নন-স্ট্রাইকার স্ট্রাইকার-এর দিকের উইকেটে পৌছোতে পারবেন কী না, নন-স্ট্রাইকারই সেটা ভাল ভাবে বিচার করতে পারেন বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই, এ ক্ষেত্রে রানের কল নন-স্ট্রাইকারের। স্ট্রাইকার উইকেটের সামনে ড্রাইভ ইত্যাদি করলে—এক্সট্রা কভার থেকে মিডউইকেট—অনুরূপ কারণে রানের কল সাধারণত স্ট্রাইকার-এর। কভার, বা মিডউইকেট স্ট্রাইকার-এর বিশ-পঁচিশ গজের ভিতর থাকলে স্ট্রাইকার ও নন-স্ট্রাইকার বুদ্ধি বিবেচনা করে কল করবেন, এমন ক্ষেত্রেই মিসআনডারস্ট্যাণ্ডিং বা ভুল বোঝাবুঝির পালায় রানআউট হবার বিশেষ ভয়।

কল সম্বন্ধে 'সাধারণত' কথাটি একাধিকবার ব্যবহার করেছি। পুঁথিগত নির্দেশ মতো একজন ব্যাটসম্যান বিচারে ভুল করে ইয়েস বললেন, অন্যজন সমূহ বিপদ দেখেও কলেরপুতুলের মতো চোখ বুজে দৌড়োবেন এমন কোনও কথা নেই। উইকেটের পিছনে থার্ডম্যানে কাট, থার্ডম্যান একেবারে বাউণ্ডারীতে নয়—কাছেই, নন-স্ট্রাইকার-এর স্টার্ট নেওয়া আছে—কল করলেন, বিপরীত দিকের উইকেটে তিনি পৌছোলেনও, কিন্তু ভাল ফিল্ডস-ম্যান রান আউটের জন্য বোলারের দিকের উইকেটে বল ছোঁড়েন, শর্ট

থার্ডম্যানে তেমন ফিল্ডসম্যান থাকলে স্ট্রাইকার বোলারের দিকের উইকেটে পৌঁছোতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত, বোলার বল হাত থেকে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নন-স্ট্রাইকারকে এগিয়ে যেতে হবে, রান হবেই বলে নয়, রান হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে—যাকে বলে বাকিং আপ; এর ফলে বিপরীত দিকের উইকেট বা পপিংক্রীজের ভিতর পৌঁছোতে হলে, নন-স্ট্রাইকারকে দৌড়োতে হবে মাত্র পনের ষোল গজ, যেটা সব ক্ষেত্রেই সাহায্য কে'—বিশেষ করে শর্ট রানের সময়। বোলারের রান-এর সময় নন-স্ট্রাইকার ব্যাট পপিংক্রীজের ভিতর রেখে, বাইরে দাঁড়ালেই যথেষ্ট। স্টার্ট নিতে হবে কিন্তু বোলারের রানের সময় নয়, বল বোলারের হাত থেকে বেরোবার পর। কারণ ব্যাটসম্যান যদি আগে ভাগেই ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং বোলার যদি সেটা লক্ষ্য করে বল ডেলিভারী না করে বেল তুলে নেন, তাহলে ব্যাটসম্যান রান আউট হবেন এবং সেটা হবে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। এর ভিতর বোলারের কোনও অখেলোয়াড়ী মনোভাবের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ নন-স্ট্রাইকারই অন্যায় সুযোগ নিচ্ছেন; অনেক ব্যাটসম্যানেরই এই বদ অভ্যাস আছে। এভাবে ১৯৪৭-৪৮ সনে অস্ট্রেলিয়ার সফরে ভিনু মানকাদ টেস্ট ম্যাচে একাধিকবার আউট হয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, প্রথম রান বেশ জোরে দৌড়ে নেওয়াই সঙ্গত। ধরুন, থার্ডম্যানে কাট, সাধারণত এক রান পাওয়া যায় কিন্তু ফিল্ডসম্যান যদি ক্লীন পিক্‌আপ, বা প্রথমবারেই ভাল করে বল ফিল্ড না করতে পারেন, বা স্ট্রোকের প্লেসিং তাঁর ডাইনে বা বাঁয়ে দূরে হয়, তাহলে এবং প্রথম রান জোরে দৌড়ে নিলে, দ্বিতীয় রান নেওয়া সহজ হবে। দ্বিতীয় রান নেবার সময় পপিংক্রীজের ভিতর ব্যাট মাটিতে একবার ঠেকিয়ে নিয়ে টার্ণ করলেই বা ঘুরলেই চলবে, তাতে দ্বিতীয় রান করার সময় বেশী পাওয়া যাবে। অবশ্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি রান নেবার আগে বলের এবং যে ফিল্ডসম্যান বল ফিল্ড করছেন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু কী প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি রান নেবার একবার মনস্থ করলে, পিছনে দেখা অনুচিত ও অবিবেচকের কাজ, কারণ তাতে রান নেবার গতি কমে যাবে। বেশীর ভাগ রান আউট হয় সামান্য ব্যবধানে, সুতরাং কোনও কারণে গতিহ্রাস যেন না হয় তার ওপর নজর রাখতে হবে। রানের শেষের দিকে পপিংক্রীজের দু'তিন গজ দূর থেকে

ব্যাট গ্রাউণ্ড করে বা মাটিতে লাগিয়ে ক্রীজের দিকে এগোনোই বিধেয়। ব্যাট পপিংক্রীজের ভিতরে পৌছোলেই রানআউট বেঁচে যাবে, ব্যাটসম্যানের শরীর ক্রীজের যাবার কোনও প্রয়োজন নেই। তরুণ শিক্ষার্থীদের এই ব্যাট গ্রাউণ্ড করা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হতে হবে, কারণ ব্যাট ক্রীজের ভিতরে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারত

মাদ্রাজে টেস্ট খেলার পূর্বে অমরনাথ ব্যাট পরীক্ষা করে দেখছেন।

কিন্তু শূন্যে হলে, ব্যাটসম্যান হবেন আউট। কোনও কারণে রান করার সময় ব্যাট হাত ফস্কে মাটিতে পড়ে গেলে, বিনা ব্যাটেই পপিংক্রীজের ভিতর ব্যাটসম্যানের যাওয়া উচিত। শর্ট রানের ব্যাপারে ব্যাট কুড়িয়ে নিতে যে সময় লাগবে সেটা হবে মারাত্মক।

চতুর্থত, ব্যাটসম্যানের রানআউট অব্যর্থ মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত রান-আউট বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। বহু ক্ষেত্রে উত্তেজনা বা অন্য কারণ বশত থ্রো-এর দিক বিভ্রম হতে পারে, উইকেটকীপার বা বোলার বা ফিল্ডসম্যান বল হাতে পেয়েও ফস্কে যেতে পারেন।

পঞ্চমত, ব্যাটসম্যান স্ট্রোক মেরে উইকেটের ওপর দিয়ে কদাচ দৌড়োবেন না। বুটের স্পাইক-এ উইকেট জখম হবে এবং সেটা ব্যাটসম্যানের পক্ষেই ক্ষতিকর। ডান হাতে ওভার দি উইকেট বোলার, দু'জন ব্যাটসম্যানই ডান হাতে খেলেন, সে ক্ষেত্রে সচরাচর কোনও সমস্যা নেই। স্ট্রাইকার উইকেটের বাইরে ডান দিকে দৌড়োবেন, নন-স্ট্রাইকার উইকেটের অন্য দিকে। নন-স্ট্রাইকার সাধারণত দাঁড়াবেন রিটার্ন ক্রীজের কাছাকাছি, স্ট্রাইকার-এর থেকে উইকেটের একটু দূর দিয়েই দৌড়োবেন, বিপরীত দিকের পপিংক্রীজের (যতটা দাগ দেওয়া থাকে) বাইরে ব্যাট গ্রাউণ্ড করলেও ক্ষতি নেই, কারণ দাগ না থাকলেও পপিংক্রীজ সীমাহীন। সমস্যা দেখা যায় যখন ডান হাতের বোলার রাউণ্ড দি উইকেট বল দিচ্ছেন, স্ট্রাইকার ডান হাতে ব্যাট করছেন, নন-স্ট্রাইকার দাঁড়িয়েছেন ওভার দি উইকেটের রিটার্ন ক্রীজের কাজে। ধরুন ব্যাটসম্যান অফড্রাইভ করলেন, তিনি উইকেটের বাঁ পাশ দিয়ে দৌড়োতে পারবেন না, ডান পাশ দিয়েই দৌড়োতে হবে। এক্ষেত্রে স্ট্রাইকার যদি উইকেটের সামান্য বাইরে দিয়ে দৌড়োন, এবং নন-স্ট্রাইকার উইকেটের সেই দিকেই কিন্তু বেশ তফাৎ রেখে, তাহলে সমস্যার সমাধান হবে। অবশ্য এক্ষেত্রেও বাঁধা ধরা কোনও নিয়ম নেই। স্ট্রাইকার যদি অনড্রাইভ করেন তাহলে উইকেটের বাঁ দিক দিয়ে দৌড়োনই স্বাভাবিক এবং সেটাই ঠিক।

ষষ্ঠত, ব্যাটসম্যানের মনে রাখতে হবে সাবস্টিটিউট রানার ভুল করলেও আউট, প্রকৃত স্ট্রাইকার বা নন-স্ট্রাইকার ভুল করলেও আউট। সুতরাং সাবস্টিটিউট রানার অভিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। উত্তেজনার বশে প্রকৃত স্ট্রাইকারকে মনে রাখতে হবে বদলি দৌড়োনোর জন্য লোক আছে, কিন্তু স্ট্রোক মেরে তাঁকে ক্রীজের ভিতর থাকতে হবে, অন্যথায় রান না হলে তিনি পপিংক্রীজের বাইরে থাকলে, তাঁর সাবস্ট্রিটিউট রানার ক্রীজের ভিতর থাকলেও তিনি হতে পারেন স্টাম্প আউট।

স্ট্রোকের প্লেসিং ও রানিং বিটুইন উইকেটস ভাল হলে ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা এবং সেইটেই সর্বসময় হবে ব্যাটসম্যানের

লক্ষ্য। রানিং বিটুইন উইকেটস ভাল না হলে দলের বিশেষ বিপর্যয় হয় বহুক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু যে বিপর্যয় দেখেছিলাম ১৯৫৫ সনে পেশাওয়ারে ভারত ও পাকিস্তানের টেস্টম্যাচে, তার জুড়ী দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভারতের ব্যাটিং চমৎকার হচ্ছে, পাকিস্তান থরহরিকম্প, ভারতের চার চার জন ব্যাটসম্যান হলেন রানআউট! কত তফাৎ প্রৌঢ় বয়সেও ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্টের সঙ্গে—যিনি স্ট্রোক প্লেস করেই বলতেন: কাম, টু—মে বী থ্রি—চলে এসো, দুটো রান হবেই, তিনটেও হতে পারে। সেদিন পেশাওয়ারে আমাদের ব্যাটসম্যান যেন 'বেলে খেলার'—ওয়ান্ ফর দি থ্রো নিতে গিয়ে আউট হয়েছিলেন।

রান নেবার মূল কথা, স্পষ্টভাবে বলা: ইয়েস, নো বা ওয়েট—কোনও সন্দেহ থাকলে গোঁজামিল দিতে গেলেই আউট!

আধুনিক ক্রিকেটের জনক ডবল্যু জি গ্রেস

বোলিং

ক্রিকেট জগতে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়ঃ বোলিং উইনস ম্যাচেস—অর্থাৎ খেলায় জয়লাভ নির্ভর করে বোলিং-এর (ভাল বা শক্তিশালী কথাটা অবশ্য উহ্য) উপর। আর একটা কথাও শোনা যায়ঃ গুড ফিল্ডিং মেকস মিডিওকার বোলিং লুক ফার্স্ট ক্লাস; ব্যাড ফিল্ডিং মেকস ফার্স্ট ক্লাস বোলিং লুক পুওর—অর্থাৎ ভাল ও নির্ভুল ফিল্ডিং-এর গুণে মাঝারি ধরণের বোলিং মনে হয় যেন দুর্দান্ত; কিন্তু ফিল্ডিং খারাপ হলে দুর্দান্ত বোলিংও মনে হবে অতি দুর্বল। এই দুটি কথা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। শেষোক্ত কথার সম্বন্ধে বিশদভাবে বলব ফিল্ডিং-এর পরিচ্ছেদে, এখানে মাত্র প্রথমোক্ত মন্তব্যের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মুলত এ মন্তব্য যথার্থ, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ, ফিল্ডিং ভাল হলে এবং দলের ব্যাটসম্যানরা মোটামুটি ভাল রান করলে। দুদান্ত বোলিং, কিন্তু ব্যাটিং-এ অতি অল্প রান, তায় ফিল্ডসম্যানরা হরদম ক্যাচ ছাড়ছেন, এমন ক্ষেত্রে স্পফোর্থ, টেট, ও'রাইলী, গ্রিমেট, ভেরিটী একই দলে বল করলেও তাঁদের দল জয়লাভ না করতে পারে। অন্য পক্ষে, ব্রাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যান যে দলে—যিনি নিয়মিতভাবে একাই দু'তিন শ' রান করেন এবং তড়িৎ গতিতে, সে দলের বোলিং ও ফিল্ডিং ত্রুটিপূর্ণ হলেও ব্যাটিং-এর জোরে জয়লাভ হতে পারে।

কিন্তু এ দুটি উদাহরণই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। যে দলে বোলিং অসাধারণ, সে দলের ব্যাটিং ও ফিল্ডিং অন্তত সাধারণ হবে ধরে নিলে অন্যায় হবে না। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ব্যাটিং ও ফিল্ডিং প্রায় সমান হলে, যে দলের বোলিং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, সে দলের জয়লাভের আশা স্বভাবতই বেশী। কারণ, বোলিং শক্তিশালী হওয়ার দরুন অন্য দলের ব্যাটিং অপেক্ষাকৃত কম রানে নামিয়ে দেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ক্রিকেট খেলাকে ল অব এ্যাভারেজেস—গড়পড়তা ধরলে, ক্রিকেট খেলায় জয়লাভ সচরাচর ভাল বোলিং-এর উপর নির্ভর করে।

তাই, মাত্র আজ নয়, ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে যে জয়মাল্য ও প্রশংসা একমাত্র ব্যাটসম্যানদের জন্যই তোলা থাকে, সেটা সত্যই বিস্ময়কর।

ব্যাটসম্যান স্ট্রোক মেরে বাউণ্ডারী বা ওভারবাউণ্ডারী করলে ঘন ঘন করতালি, সেঞ্চুরী করলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, কিন্তু বোলার দুর্দান্ত বল করে চার পাচটি উইকেট নিলে সাধারণত তার সিকি ভাগ প্রশংসাও দর্শকদের কাছে মেলে না।

এর কারণের মধ্যে, বোধ হয়, ব্যাটসম্যানের স্ট্রোক দর্শনীয় ও উপভোগ্য হয়ে থাকে সাধারণের চোখেও, মাত্র সমঝদারের চোখে নয়। স্ট্রোক দেখা যায় মাঠের সব অংশ থেকে (অবশ্য মোটামুটি ভাবে) এবং স্ট্রোক হয় প্রায়ই। বোলারের যথার্থ কৃতিত্ব ভালভাবে বুঝতে হলে কিন্তু প্রয়োজন দর্শকের রীতিমত শিক্ষা এবং শিক্ষা থাকলেও বোলারের কলাকৌশল দেখতে হলে, সেটা সম্ভব হয় মাঠের বিশেষ কয়েকটি অংশ থেকে—হয় বোলারের পিছন বা সামনে থেকে, অর্থাৎ দু'দিকের সাইটস্ক্রীন-এর দু'দিকে প্রায় কুড়ি পঁচিশ গজের মধ্যে দর্শকের আসন হলে। তা ছাড়া, ব্যাটসম্যানের স্ট্রোকের ফ্রিকোয়েনসির সঙ্গে তাল রেখে, বোলারের যে অত দ্রুত লয়ে উইকেট ফেলা সম্ভব নয় সে কথা না বললেও চলে।

অন্তত আধুনিক টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট সচরাচর ব্যাটসম্যানের সহায়, সারাদিনে পাচ ছ'টি উইকেট পড়লেই সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু দর্শক মহলে বোলারদের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে হলে ব্যাটসম্যানদের কচুকাটা করতে হবে, যেমন করেছিলেন ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওল্ড ট্র্যাফোর্ড (ম্যানচেস্টার) মাঠে ইংলণ্ডের জিম লেকার, একটি টেস্ট ম্যাচে ১৯টি উইকেট নিয়ে, বা ১৯৫৯ সনে কাণপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে ভারতের জাশু প্যাটেল।

বিশ্ব ক্রিকেটের বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি—রঞ্জি, ট্রাম্পার, হব্‌স, ব্র্যাডম্যান প্রমুখ ব্যাটসম্যান—দুঃখ করেছেন বোলারদের এই অল্পাদর বা অনাদরে (যদিও তাঁরাই ছিলেন বোলারদের দুঃখের বিশেষ কারণ!) এবং বিষয়টি বিশ্লেষণ করে একাধিক কারণ দেখিয়েছেন, যেগুলির সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমার দৃঢ় ধারণা, বোলারদের এই অল্পাদরের মূল কারণ এই যে, পৃথিবীর কোনও মাঠেই দর্শকের শতকরা আশীভাগ বোলিং-এর বিশেষ কিছুই দেখতে পান না (সুইং, ব্রেক ইত্যাদি)। উচ্চাঙ্গের বোলিং-এর গুণগ্রহণ করার শিক্ষাও তাঁদের নেই, কখন একটা উইকেট পড়বে তার জন্য যথোচিত ধৈর্য্যও নেই—আর, বোধ করি, সবের বড় কথা যুগ যুগ ধরে উচ্চাঙ্গ বোলিং-এর যথোচিত এ্যাপ্রিশিয়েসনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ দর্শক পান নি, আজও পান না।

অবশ্য, আজ টেলিভিশন-এর যুগে এ শিক্ষার কিছুটা সুযোগ হয়েছে, কিন্তু মাঠে উপস্থিত দর্শকদের কথাই বলছি। এ মন্তব্য ব্যাটিং সম্বন্ধেও অবশ্য খাটে, কিন্তু মোটামুটি মাঠের সব দর্শক ব্যাটসম্যানের টেকনিক ভালভাবে বুঝতে না পারলেও, স্ট্রোকের পর বলের গতি দেখতে পান, বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী, ফলে তুমুল হর্ষধ্বনি, ব্যাটসম্যান হয় বিজয়ী, বোলার বিজীত, এবং জয়মাল্য পড়ে সচরাচর ব্যাটসম্যানের কণ্ঠে, বোলারের নয়।

শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ক্রিকেট মাঠে, সময়ে সময়ে স্বেচ্ছায় গিয়েছি স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীর কাছাকাছি দর্শকের ভিড়ের সঙ্গে মিশে, শুনেছি তথাকথিত ওয়াকিবহাল দর্শক মণ্ডলীর মুখে এমন জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য : 'লিণ্ডওয়াল এক-হাত আধ-হাত কী দুর্দান্ত ইনস্যুইং দিচ্ছে দেখছ, লেন (হাটন্) সামলাতে পাচ্ছে না, আউট হল বলে।'

অবশ্যই, লিণ্ডওয়াল ইনস্যুইং দিতে পারতেন, কিন্তু আউট স্যুইং-ই তাঁর মারণাস্ত্র ছিল। বল তখন বেশ পুরোনো, এক হাত, আধ হাত স্যুইংএর প্রশ্নই ওঠে না। দর্শক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্য ফলে গিয়েছিল, হাটন আউট হলেন—কিন্তু স্লিপে, ইনস্যুইং-এ নয়, বলটা সামান্য লেগ থেকে টার্ণ করেছিল! এমন নজীর বহু আছে, দর্শক ও সমালোচক সম্বন্ধে বিশেষ পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করব।

সাধারণের চোখে ব্যাটিং-এর মতো দর্শনীয় ও চিত্তাকর্ষক না হলেও, ক্রিকেটখেলায় বোলিং-এর স্থান যে অপরিহার্য সে কথা বলা অবান্তর। ব্যাটসম্যানের আদর সাধারণের কাছে বেশী হলেও, বোলার হওয়া সহজ কথা নয়, উচ্চাঙ্গের বোলার হতে হলে শুধু ভগবান-দত্ত ক্ষমতাই সহায় হবে না, সেই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরিশ্রম করতে হবে অনুক্ষণ। ভাল বোলার, উচ্চাঙ্গের বোলার হতে হলে সস্তায় কিস্তি মাৎ হবে না। সিদ্ধি লাভ হবে সাধনায়, অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে। বলা বাহুল্য, খেলায় উৎসাহ ও খেলার প্রতি যথার্থ ভালবাসা না থাকলে, বোলিং-এ সাফাল্য লাভ করা সম্ভব নয়।

মহম্মদ নিসার তখন শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের ক্রিকেট জগতে প্রখ্যাত ফাস্টবোলারদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৩ সনের গ্রীষ্মকাল, গুলমার্গ যাবার পথে লাহোরে দু'একদিনের জন্য নেমেছি, টেমপারেচার ১১০ ডিগ্রির কাছাকাছি, লাহোরে তখন হটুওয়েদার ক্রিকেট টুর্ণামেণ্ট—সকাল ও বিকালে খেলা, দুপুরে অবশ্য নয়।

সেই দুর্দান্ত গরমে, ইংলণ্ডের সাফল্যময় সফর থেকে সদ্য প্রত্যাগত নিসারকে দেখলাম সামান্য খেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করছেন। বিরাট দেহ, আম্পায়ারের কাছে তাঁর গচ্ছিত একটা বিরাট তোয়ালে, প্রতিটি বল দেবার পর ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল মুছে নিচ্ছেন, কিন্তু সমান বোলিং-রান নিয়ে, প্রতিটি বলের পিছনে তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে বল করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, শুনলাম ম্যাচ খেলা যেদিন থাকত না, সেদিনও নিসার সকাল-সন্ধ্যায়, মাত্র একটি স্টাম্প পুঁতে, সকালে একঘণ্টা, সন্ধ্যায় আর এক ঘণ্টা, সেই একটি স্টাম্প তাক্ করে বল করতেন। তার ফলেই নিসারের বলের লেন্থ এবং ডিরেকশন এত ভাল ছিল।

বহু বোলারকে এই কঠিন পরিশ্রম করতে দেখেছি, ক্রিকেট জগতে সর্বত্র। ভারতে নিসার, অমর সিং, স্থঁটে ব্যানার্জি, ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁ, সি কে নাইডু (পরিণত বয়সেও), প্রোফেসর শৈলজা রায়—ইত্যাদি। শুনেছি—চোখে দেখিনি—যৌবনে ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট প্রতি শীতকালে ভারতে পাতিয়ালা, কোচবিহার প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজা মহারাজার আমন্ত্রণে শিক্ষক হিসাবে এলেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেই বল করতেন। শুনেছি, ট্যারাণ্টের সঙ্গে বাজী রেখে স্বর্গত কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ গুডলেন্থের জায়গায় আট দশটি হাফ সভারেন্ (সাইজ আমাদের আধুলির থেকে ছোট) ছড়িয়ে দিতেন, এবং ট্যারাণ্ট মহারাজার নির্দেশ মতো মুদ্রাগুলির উপর বল ফেলে সেগুলি পকেটস্থ করতেন। প্রথম যুদ্ধোত্তর কালের কথা, সুতরাং কথাটি সত্য হলে ট্যারাণ্ট সাহেবের উপরি রোজগার ভালই হত, কারণ এক-একটি হাফ সভারেন-এর মূল্য ছিল সাত আট টাকা—টাকার যখন দাম ছিল। সেকালে ধনী ব্যক্তিদের স্ত্রীদের গিনির মালা উপহার দেওয়া রেওয়াজ ছিল, ট্যারাণ্ট-জায়ার কণ্ঠে গিনির মালা শোভা পেয়েছিল কী না সে কথা জানা যায় নি।

উত্তরকালে ট্যারাণ্টের প্র্যাকটিশে যে নিষ্ঠা, যে নিখুঁত লেন্থ, ডিরেকশন এবং ফ্লাইট দেখেছি, তাতে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে জন্মগত প্রতিভার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম না থাকলে উচ্চাঙ্গের বোলার হওয়া অসম্ভব। মোহরের উপর বল নাই বা পড়ল, ক্রমাগত চেষ্টায় তার কাছাকাছি পড়লেই যথেষ্ট, ধৈর্য ধরে চেষ্টাই আসল কথা—বোলিং-এ সাফল্যের সোনার কাঠি।

ন্যাচরল গিফ্‌ট বা প্রকৃতিদত্ত, সহজাত গুণ না থাকলে হাজার চেষ্টা করলেও

বোলার হওয়া যায় না ; রঞ্জি-ট্রামপার-ব্র্যাডম্যান শত চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম করলেও ফাস্ট বোলার হতে পারতেন না। কিন্তু বোলিং এর গিফ্‌ট থাকলেই হবে না, রীতিমত সাধনা বিনা সে গিফ্‌ট যাবে মাঠে মারা। তরুণ শিক্ষার্থীদের এ দু'টি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। বাল্যে ও কৈশোরে ইনস্টিংক্ট, সহজাত প্রবৃত্তি, বল হাতে পেলেই জোরে বল করার চেষ্টা ; হয়তো এব পিছনে আদিম একটা মনোভাবও আছে। কিন্তু জন্মগত, প্রকৃতিদত্ত অল্পবিস্তর বোলিং-এর গিফ্‌ট না থাকলে বোলার হবার আশা থাকে না। সেটা অহরহ দেখা যায় মাঠে ময়দানে, নেট প্র্যাকটিশে। ছ ফুট লম্বা তরুণ, শরীরও মজবুত দৌড়ে এসে বল দেওয়া হল যথারীতি—কিন্তু বল একবার লেগের দিকের নেটে, পরের বার অফ-এর দিকের। এক নজরেই বোঝা যায়, এমন তরুণের অন্য সব কিছু সম্ভব হলেও বোলিং তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

সাধারণত, বোলাদের শরীর মজবুত ও স্বাস্থ্য ভাল হওয়া অপরিহার্য। ক্রিকেট খেলায় তাঁদের বীস্ট-অব-বারডেন বললে অত্যুক্তি হবে না, কারণ যা কিছু বোঝা ঐ বোলারদের উপরই। বিশেষ করে, আজকের টেস্ট উইকেটে। এমন প্রায় দেখেছি, সারাদিন অর্থাৎ পাঁচ-ছ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বোলারদের ভাগ্যে একটি উইকেটও জুটল না।

শরীর মজবুত ও স্বাস্থ্য ভাল মানে এ নয় যে মুষ্টিযোদ্ধা অথবা মল্লবীর চেষ্টা করলেই ভাল ফাস্ট বোলার হবেন। বোলারের পেশী কুস্তিগীরের মতো হলে চলবে না, শোলডার বা কাঁধ পেশীর আধিক্যে, যাকে ইংরেজীতে বলে মাস্‌ল-বাউণ্ড, সচরাচর হাত ভালভাবে ঘুরবে না ! বহু বিশ্ববিখ্যাত ফাস্ট বোলারদের হাত (শোলডার থেকে) দেখেছি, কিন্তু পেশীর আধিক্য কদাচিত নজরে পড়েছে। বিভিন্ন টাইপের বোলারদের—ফাস্ট এবং মিডিয়াম পেস, স্লো স্পিনার—বিভিন্ন বিশেষত্ব, কিন্তু সকলের আর্ম সচরাচর সুগঠিত ও সবল, পেশীবহুল না হয়েও। নামকরা স্পিনারদের—যেমন সুভাষ গুপ্তে, সানী রামাধীন, জর্জ ট্রাইব (অস্ট্রেলিয়া), এ্যালফ্রেড ভ্যালেনটাইন্, ব্রুশ্ ডুল্যাণ্ড ইত্যাদির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার চেষ্টা করে বুঝেছি তাঁদের কব্জিতে কী শক্তি, আঙ্গুল কি ভীষণ কড়া। যে ধরণের বোলিং-এ যে কব্জি বা আঙ্গুল বেশী ব্যবহার হয়, সেগুলির শক্তি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মল্লবীরের পেশীবহুল বাহু ফাস্ট বোলিং-এ কাজে আসে না।

বোলিং-এর গিফ্‌ট থাকলে, তরুণদের বেছে নিতে হবে কী ধরণের বোলার

ফাস্ট, মিডিয়াম বা স্লো—হলে তাঁরা সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হবেন। আগেই বলেছি, বাল্যে ও কৈশোরে সচরাচর ঝোঁক ফাস্ট বোলার হওয়ার। কিন্তু

লেগব্রেক ও গুগলী-বোলার ডুল্যাণ্ড।

দীর্ঘাকৃতি ও সুগঠিত শরীর হলেই সে ব্যক্তি ফাস্ট বোলার হবেন এমন কোনও কথা নেই। আর অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি হলে ফাস্ট বোলার হতে পারবেন না সে কথাও সত্য নয়। সমসাময়িক ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি রয় গিলক্রীস্ট এবং এবং ভারতের রামাকান্ত দেশাই ফাস্ট বা ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার হিসাবে এবং ক্রিকেটের ইতিহাসে দীর্ঘাকৃতি উইলফ্রেড রোডস্, বিল্ ও'রাইলী, জে সি হোয়াইট (ইংলণ্ড), জ্যাক আইভার্সন (অস্ট্রেলিয়া) অসামান্য স্পিন বোলার হিসাবে সে কথা প্রমাণ করেছেন।

বোলিং-এ গিফ্‌ট থাকলে, এ ক্ষেত্রেও সেই মডেল বা আদর্শের কথা ওঠে। তার সঙ্গে স্থানীয় উইকেটেরও প্রভাব। কথাটা সরল করে বলি। তখন

পাঞ্জাবে মডেল হিসাবে সাজীর আলি, মহম্মদ নিসার, সাহাবুদ্দিন (লাহোর) ডঃ জাহাঙ্গীর খাঁ—সকলেই ফাস্ট বা ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার। উইকেটও ফাস্ট টার্ফ বা ম্যাটিং (অর্থাৎ উইকেটে বল পড়ে জোরে আসে), বড় ছোট প্রায় সব দলেই দেখতাম, বোলার বেশীর ভাগই ফাস্ট বা তথাকথিত ফাস্ট। ভাল স্লো স্পিন বোলার খুবই কম। ১৯৩৩-৩৪ সনে জার্ডিনের অধিনায়কত্বে এম সি সি দল তখন ভারত সফরে, পাঞ্জাবের স্লো বোলার বলতে মাত্র আমীর ইলাহী। ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্ট তখন পাতিয়ালায়, মহারাজা ভূপীন্দ্র সিং-এর ক্রিকেট দলের কোচ। মনে আছে অমৃতসরে এম সি সি-র সম্মানে ডিনারে পাতিয়ালার মহারাজা বক্তৃতায় এ সমন্ধে ক্ষোভ করে বলেছিলেন, পাঞ্জাবের তরুণ ক্রিকেটাররা স্লো বোলিং-এর দিকে যেন নজর দেন তার জন্য আবেদন করেছিলেন। তেমনই বম্বের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামের বছরের পর বছর নিস্প্রাণ,
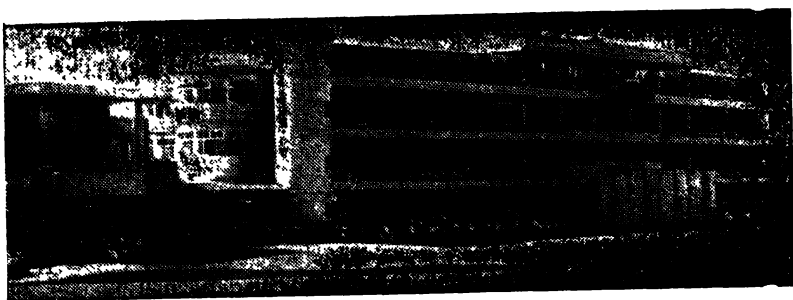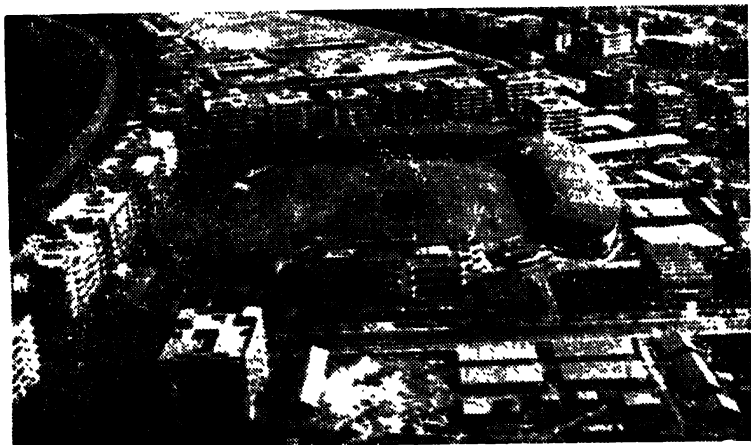
ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়াম—বম্বে। নীচে ক্রিকেট ক্লাবের বাড়ী।

নির্জীব হওয়ার ফলে, এবং সামনে সুভাষ গুপ্তের মতো মডেল থাকায় গত দশ বছরে স্লো স্পিন বোলারেরই আধিক্য। যথার্থ ফাস্ট বোলার নাম মাত্র।

যাহোক, কী ধরণের বোলার হলে ভাল হয়, সে বিচার তরুণদের নিজেদেরই করতে হবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত কাজে লাগবে। ভিনু মানকাদ শুরুতে ফাস্ট বল করতেন, দলীপ সিং-জীর উপদেশে স্লো স্পিন বোলার হন। অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত লেফ্‌ট আর্ম বোলার বিল জনস্টন স্লো স্পিনার হিসাবে শুরু করেন, কিন্তু ১৯৪৮ সনে ইংলণ্ডে ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁকে নতুন বলে ফাস্টমিডিয়াম বল করতে দেখেছি, মাঝে মাঝে বল পুরোনো হয়ে গেলে স্লো স্পিন। ১৯৫৩ সনে আবার ইংলণ্ডে দেখলাম জনস্টনকে, সেবার হ্যাসেটের নেতৃত্বে নিয়মিত ভাবে নতুন বলে মিডিয়াম পেস, পরে স্লো বোলিং করতে দেখেছিলাম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকেও। কিন্তু এঁরা ছিলেন অসাধারণ। বহু ক্ষেত্রে দেখেছি, অন্যান্য বোলারদের এই দ্বি-মূর্তি ধারণ করার প্রয়াস, তাঁরা শেষ পর্যন্ত দু'কূলই হারিয়েছেন। যুগটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞের, সুতরাং তরুণ শিক্ষার্থীদের এক টাইপ-এর বোলিং-ই ভাল করে রপ্ত করা বিধেয়।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

বাল্যে ও কৈশোরে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ধারণা হয় যে জোরে বল দিলেই ব্যাটসম্যানের স্টাম্প ছিটকে যাবে, অথবা বল বিরাট সুইং বা ব্রেক করাতে পারলেই ব্যাটসম্যান স্টাম্প সামলাতে পারবেন না। অর্থাৎ উইকেট ফেলতে হলে একমাত্র উপায় বল স্টাম্পে মারা। এ ধারণার মূলে হয়তো বাল্যের ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা, ব্যাটসম্যানের টেকনিক রপ্ত হয়নি, জোর বলেই হয় স্টাম্প কাত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ক্রিকেটে ন' রকম আউট হবার নিয়মের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

টেকনিক ভাল হলে ব্যাটসম্যানদের বোল্ড আউট করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। অন্য বহু প্রকারে আউট হবার নিয়ম প্রবর্তনের পিছনে সেটা একটা কারণ। ক্রিকেট খেলায় মনস্তত্ত্বের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে; এ খেলা মগজ খাটিয়ে বুদ্ধির খেলা। ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান সকলেরই এটা প্রয়োজন, কিন্তু

অত্যাবশ্যক উচ্চাঙ্গের বোলিং-এ, এবং বলা বাহুল্য, ক্যাপটেনসিতে বা নেতৃত্বে আউট করবার বিভিন্ন উপায় আছে, মাথা খাটালে বোলার সেগুলি দেখতে পাবেন—জানতে পারবেন কী করে ব্যাটসম্যানকে ঠকানো যায়। তার ফলেই সুইং, ব্রেক, ফ্লাইট্ (বল কম-বেশী উঁচু করে দেওয়া), পেস বা গতির তারতম্য। ব্যাটসম্যান এক ভেবে খেললেন, বল কিন্তু কার্যত অন্যরকম—ব্যাটসম্যান সামান্য ভুল করে হলেন আউট।

সাধারণত ধারণা, মাত্র স্লো স্পিন বোল'র বল ফ্লাইট্ করে, ব্রেকের তারতম্য করে ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে পারেন। ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্টকে হরদম দেখেছি ব্যাটসম্যানদের নাস্তানাবুদ করতে। আপাত দৃষ্টিতে ব্যাটসম্যান দেখলেন বল বেশ উঁচু, দু'পা এগিয়ে মারলে মাঠ পার হয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চার পা এগিয়েও দেখলেন বল ব্যাটের মধ্যে আসছে না, ফরোয়ার্ড খেলে বল ব্লক করবার চেষ্টা করলেন, বল ব্রেক করে উইকেটকীপারের হাতে, স্টাম্পড্ আউট—ব্যাটসম্যান তখন উইকেটের মাঝপথে হাবুডুবু খাচ্ছেন। রামাধীনকে দেখেছি ব্যাটসম্যানকে বোকা বানাতে, অফব্রেক হিসাবে ব্যাটস-ম্যান খেললেন, বল কিন্তু হল লেগব্রেক। এ ধরণের অনেক নজীর দেওয়া যায়। ফাস্ট বা মিডিয়াম পেসের বোলার যে পেস্ ও সুইং-এর তারতম্য করে ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে পারেন সেটা বিশেষ করে দেখেছিলাম ১৯৫৩ সনের ইংলণ্ড—অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে। লিণ্ডওয়াল বলের গতি এবং সুইং-এর কম বেশী করে কত ব্যাটসম্যানকে ঠকিয়ে ছিলেন এবং এলেক্ বেডসার ইনসুইং দিতে দিতে হঠাৎ একটা লেগকাটার দিয়ে কত ব্যাটসম্যানকে কাবু করেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। মাত্র জোরে বল, ভাল সুইং, বড় ব্রেক ইত্যাদি দিতে পারলেই উচ্চাঙ্গের বোলার হওয়া যায় না, মাথা খাটিয়ে এবং ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা লক্ষ্য করে, ব্যাটসম্যানকে আউট করতে হবে।

এই মাথা খাটিয়ে ফিল্ডও সাজাতে হবে। সাধারণত প্রতি টাইপ-এর বোলারের জন্য মোটামুটি একটা ফিল্ড সাজাবার রীতি আছে। কিন্তু উইকেটের তারতম্য, ব্যাটসম্যানের শক্তি বা দুর্বলতা, খেলার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন কারণ অনুযায়ী সেই ফিল্ডের অদল বদল করতে হবে। যন্ত্রের মতো মাত্র বল করে গেলেই চলবে না। বোলার সচরাচর ফিল্ড সাজান—কী বল করছেন সেটা বোলার সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন বলে—তবুও যথারীতি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরামর্শ করে। বিশেষ কারণ বিনা ক্যাপ্টেন এ বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু যখন করবেন তখন বোলারের সোৎসাহে ক্যাপ্টেনের প্ল্যান মতোই বল করা উচিত। বস্তুত, খেলার আগেই ক্যাপ্টেন ও বোলারদের একটা প্ল্যান ঠিক করে নেওয়া বিধেয়। এবং মূলত সেই প্ল্যান আক্রমণাত্মক হওয়া আবশ্যক।

যে কোনও ক্রিকেট শিক্ষার বইয়ে বোলিং সম্বন্ধে সর্ব প্রথম উপদেশ—লেন্থ ও ডিরেকশন্ প্রথম রপ্ত করতে হবে। এটা অবিংশবাদিত সত্য। বোলারের হাতে যত জোর বল, ভাল স্থইং, বড় ব্রেক, ফ্লাইট্-এর কারদানি ইত্যাদি থাক না কেন, বিনা লেন্থ ও ডিরেকশন্-এ বোলারের সব চেষ্টাই হবে ব্যর্থ। শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি কৈশোরে একটা ঝোঁক, শুরু থেকেই বল স্থইং বা ব্রেক করার—রাতারাতি লারউড, অমরসিং, ভেরিটি, লিণ্ডওয়াল, বেডসার, বেনো হবার চেষ্টা। কিন্তু হাঁটি হাঁটি পা পা পর্যন্ত হল না,একেবারেই উইলমা রুডল্ফ, ওটিস ডেভিস, হার্ব এলিয়ট? গোড়ায় হাতে-খড়ি, তবে তো পাওয়া যাবে সরস্বতীর আশীর্বাদ?

বোলিং করছেন এ্যালেক বেডসার

লেন্থ ও ডিরেকশন—এই দু'টি কথা সর্বদাই শোনা যায় কারণ এই দু'টিই বোলিং-এর মূলমন্ত্র। কিন্তু এই দু'টি বস্তু কী?

ডিরেকশন অর্থে দিক। বোলিং-এর প্রসঙ্গে যখন ব্যবহার হয়, তখন সাধারণের মনে ধারণা স্টাম্পের উপর সোজা বল দেওয়া। কিন্তু এ ধারণা ভুল। ক্রিকেট সংজ্ঞায় ডিরেকশন-এর মানে বোলারের ফিল্ড অনুযায়ী দিক নির্ণয় করে সেই মতো নির্ভুল বল করা। বল আর তেমন নতুন নয়, একটু আধটু স্থইং করছে, মিডিয়াম পেস আউটস্থইং ও অফব্রেক বোলার অফসাইডে বেশীর ভাগ ফিল্ড সাজিয়ে বল

করছেন, ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যেই মারমুখো, সে ক্ষেত্রে সোজা স্টাম্পের উপর বল দিলে ভাল ব্যাটসম্যান নির্ঘাত মেরে বলের চামড়া তুলে দেবেন। তেমনই, স্লো মিডিয়াম বা মিডিয়াম স্লো অফব্রেক বোলার লেগ থিয়োরী করে বল দিচ্ছেন, অফসাইডে ফিল্ডসম্যান নেই বললেই চলে, উককেটে কিন্তু তখনও তেমন বিপজ্জনক ব্রেক করছে না, সে ক্ষেত্রে অফস্টাম্প এমন কি মিডলস্টাম্পে সোজা বল করা হবে মারাত্মক। সুতরাং বোলিং-এ ডিরেকশন মানে ফিল্ড অনুযায়ী যথাসম্ভব নির্ভুল দিক বজায় রেখে বল করা।

লেন্থ মানে যাকে বলা হয় গুডলেন্থ, অর্থাৎ বোলার এমন জায়গায় বল পিচ করবেন, যাতে ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড না ব্যাক খেলবেন সেটা এক নজরে সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে ; ব্যাটসম্যান স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে না খেলতে পারবেন ফরোয়ার্ড, না ব্যাক। গুডলেন্থে বল পিচ করার উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানকে সিদ্ধান্ত করতে যথাসম্ভব অল্প সময় দেওয়া, ব্যাটসম্যানের ক্ষণিকের ভুলের সুযোগ নিয়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করা। বলা বাহুল্য, মেপেজোখে গুডলেন্থের কোনও সঠিক জায়গা কিছু নেই। ছ' ফুট আর সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেললে তাঁদের নাগালের উপর ফাস্ট বা মিডিয়ামপেস-এর গুডলেন্থ নির্ভর করবে। স্লো বলের সম্বন্ধেও একই কথা খাটে, তবে লম্বা ফার্ম ফুটেড ব্যাটসম্যানের থেকে অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি ব্যাটসম্যানের ফুটওয়ার্ক যদি ভাল হয়, শেষোক্ত ব্যাটসম্যান যদি রানিং আউট ড্রাইভ-এ বিশেষ পারদর্শী হন, স্লো বোলারকে এ সব বিচার করে গুডলেন্থ বল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তেমনই, একটা উইকেট ফাস্ট, অন্য উইকেট স্লো ; উইকেট ভিজে বা শক্ত—এরকম বহু কারণের উপর গুডলেন্থ নির্ভর করে।

মোট কথা, আবার বলি, গুডলেন্থ এমন বল যেটা ফরোয়ার্ড বা ব্যাক খেলতে ইতস্ততঃ করতে ব্যাটসম্যান বাধ্য হবেন। বোলারের অন্যান্য গুণাবলী যতই হোক না কেন, লেন্থ এবং ডিরেকশন ব্যতিরেকে সব গুণই যাবে মাঠে মারা। অতএব অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে যাতে লেন্থ এবং ডিরেকশন যথাসম্ভব ত্রুটিহীন হয়। বোলিং-এর প্রথম দুটি কথা লেন্থ এবং ডিরেকশন—ভিত শক্ত ও ত্রুটিহীন হলে, এবং অন্যান্য গুণাবলী থাকলে বড় ইমারত বানাতে —উচ্চাঙ্গের বোলার হতে—সহজসাধ্য হবে। অন্যথায় সব প্রচেষ্টাই হবে বিফল।

তরুণ শিক্ষার্থীদের ঠিক করতে হবে কী ধরণের বোলার হলে তাঁদের সাফল্যমণ্ডিত হবার আশা সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু বোলার মাত্রেরই নজর রাখতে হবে দু'টি জিনিষের উপর। প্রথমত, বল হাত থেকে ছাড়বার সময় হাত যেন যথাসম্ভব উঁচুতে থাকে, যাকে ইংরাজিতে বলে হাই ডেলিভারী। কারণ, বল যথাসম্ভব উঁচু থেকে ছাড়লে পিচ পড়ার বল বেশী বাউন্স করে বা লাফায় যেটা খেলতে ব্যাটসম্যানদের অসুবিধা, বিশেষ করে বল ফাস্ট বা মিডিয়াম হলে। দ্বিতীয়ত, বোলারের বাঁ বা সামনের পায়ের টো বেশ শক্ত করে গেড়ে কভারপয়েণ্টের দিকে, বাঁ-কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকে। কারণ, এই পোজিশন থেকে বল করলে হাত ঘুরবে সোজা যার ফলে ডিরেকশন ঠিক থাকবে; বল ছাড়ার সময় বাঁ-পায়ের উপর শরীরের ওজন থাকায় এবং তার সঙ্গে ফলো-থ্রু ঠিক হলে বল পিচ পড়ে জোরে যাবে।

ব্যাটসম্যানের দিকে বোলারের বুক এবং বাঁ-পায়ের টো বিপরীত দিকের উইকেটে হলে, হাত সোজা ঘুরবে না, তার ফলে ডিরেকশন ভুল হবে এবং ঐ পোজিশনে বল ছাড়লে বাঁ-পায়ে শরীরের ওজন ভাল করে পড়া সম্ভব নয়, যার ফলে পিচ পড়ে বলের গতি হ্রাস হবে। তরুণ বোলাররা সাধারণত এই দু'টি ভুলই করে থাকেন, তাই এ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ সাবধান হতে হবে। যাঁরা বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়ামফাস্ট বোলার স্বর্গত অমরসিংকে বল করতে দেখেছেন তাঁরা হয়তো প্রশ্ন করবেন, ব্যাটসম্যানের দিকে বুক চিতিয়ে বল করা সত্ত্বেও অমরসিং-এর এই অসামান্য সাফল্য কী করে সম্ভব হয়েছিল? তার উত্তর অমর সিং ছিলেন অসাধারণ। কিন্তু অমরসিংকে মডেল করে বল দিলে, তরুণ শিক্ষার্থীরা হয়তো দেখবেন যে বল একবার অফ-এর বাইরে ওয়াইড—একবার লেগের বাইরে। বাঁ-পায়ের টো কভারপয়েণ্টের দিকে রাখার তাৎপর্য এই যে বল ছাড়বার সময় শরীরের পোজিশন এমন হবে যে শোলডারের হিন্‌জ বা কব্জি সোজা ভাবে ঘুরবে, বল ছাড়ার ত্রুটিতে ফুলপিচ, শর্টপিচ ইত্যাদি পড়তে পারে, কিন্তু ডিরেকশনে ভুল হবে না। অন্যান্য বাধা অসুবিধার কথা তো আছেই।

হাই ডেলিভারীর কথা বলেছি (বলা বাহুল্য, রাউণ্ড আর্ম বোলিংএর আলোচনা করছি), কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিখ্যাত বোলাররা যাঁদের হাই ডেলিভারী ছিল, কালক্রমে তাঁদের হাত বল ছাড়ার সময় আর উঁচু নয়, ক্রমশ নিচু হয়ে যায়। সাম্প্রতিক উদাহরণ পাকিস্তানের ফজল মামুদ।

১৯৫০-৫১ সনের ভারত সফরে যাঁর ডেলিভারী রাউণ্ড আর্ম তো নয়ই, সেমি রাউণ্ড আর্ম—অর্থাৎ বল ছাড়ার সময় হাত কায়-ক্লেশে কোনও মতে কাঁধের সামান্য উঁচুতে উঠত! বোলারের পড়তি অবস্থার এটা চূড়ান্ত প্রমাণ।

অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত স্পিন বোলার (ডান হাতে), গ্রিমেটকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, বোধ করি, ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সনে দিল্লিতে, বিশ্ব ক্রিকেটের আকাশ হতে অস্তমিত হবার পরেই। কলেজের ক্রিকেটারদের বল করছিলেন, খর্বাকৃতি পুরুষ, তাঁর চিরাচরিত সেমি রাউণ্ড আর্ম ডেলিভারী। তবু লেন্থ, ডিরেকশন, ফ্লাইট ও স্পিনের উপর কী অসামান্য কনট্রোল! কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই অসাধারণত্ব, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের কথা। স্বনামখ্যাত সি কে নাইডুর অনুজ, সি এস নাইডু স্পিন বোলার ছিলেন, শুরুতে তাঁর হাই ডেলিভারী, পরে গ্রিমেটের অনুকরণে সেমি রাউণ্ড আর্ম এ্যাকশন; তার ফলে একটি মাত্র বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম সি এস নাইডুর—প্রতি ওভারে অন্তত একটা, কখনও দু'টো লং হপ, বাংলায় চলতি ক্রিকেটের ভাষায় হাফপিচ! আবার সেই একই কথা—গ্রিমেটের তুলনা গ্রিমেটই, কিন্তু মডেল হিসাবে হানিকর, এমন কী বিপজ্জনক।

বোলিং-এ বলের গ্রিপ-এর কথা পরে বলব স্বতন্ত্র ভাবে (বিশেষ টাইপ-এর বোলিং অনুযায়ী), এখানে মাত্র বলব বোলারের রান আপ, বা বল ডেলিভারির আগে দৌড়ানোর সম্বন্ধে। এটাও বোলিং এ্যাকশন-এর মধ্যে পড়ে, যার কথা অব্যবহিত পূর্বেই আলোচনা করছি। কী টাইপ-এর বোলার তার উপর বোলারের রান আপ অবশ্য নির্ভর করে, কিন্তু বোলারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৌড়ানো অর্থহীন। ফাস্ট বোলারের সচরাচর রান-আপ ১৭-১৮ গজ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়েসলী হল ও গিলক্রিস্ট ২২-২৩ গজও নেন। এই লম্বা রান আপ-এর তাৎপর্য দৌড়ে এসে পূর্ণ মোমেণ্টাম বা ভরবেগের মাথায় বল ছাড়া, যার ফলে বলের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। কিছু বোলার বল ছাড়বার ঠিক আগেই ছোট খাট একটা লাফও দেন।

অনেকের ধারণা, অসাধারণ ফাস্ট বোলারের পক্ষেও ১৭-১৮ গজ রান-আপ যথেষ্ট, অবশ্য যদি দৌড় হয় সচ্ছন্দ, স্বাভাবিক এবং গতি ক্রম বর্ধমান। ১৯৫২ সনে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালের দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার ফ্র্যাঙ্ক টাইসনকে প্রথম দেখি নরর্দাম্পটনে। তখনও টাইসনের নাম হয় নি, ইংলণ্ড টেস্ট দলে অন্তর্ভুক্তিও নয়; রান আপ ঐ ২২-২৩ গজ। নরর্দাম্পটনের

ক্যাপ্টেন ও ইংলণ্ডের প্রাক্তন ক্যাপটেন, ফ্রেডি ব্রাউন তাঁর গাড়ীতে আমাকে হোটেলে লিফ্‌ট দিচ্ছেন, ব্রাউন বললেনঃ মার্ক মাই ওয়ার্ডস, দিস বয় টাইসন উইল প্লে ফর ইংল্যাণ্ড বিফোর লং। স্বচক্ষে টাইসনের অসামান্য পেস দেখেছিলাম, ব্রাউনের কথা মনে ধরল, কিন্তু রান-আপ যেন একটু বাড়াবাড়ি। কথাটা বলেছিলাম ব্রাউনকে, তিনিও সায় দিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সনে অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় হাটনের উপদেশে ও নির্দেশে, টাইসন রান আপ ৫৬ গজ কমান যার ফলে তাঁর স্পীড কমে নি, কিন্তু কনট্রোল অনেক বেশী হয়েছিল, সে কথা উত্তরকালে টাইসন নিজেই স্বীকার করেছেন।

ব্রাউন বলেছিলেন ট্রুম্যানের দেখাদেখিই নাকি টাইসনের প্রথমের ঐ রান আপ, অবশ্য আরও খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে! তরুণ শিক্ষার্থীদের এই ঝোঁক, বোধ করি, মজ্জাগত। এর বহু উদাহরণ দেশেবিদেশে দেখেছি। স্কুল কলেজ থেকে আমাদের রঞ্জি ট্রোফী প্রতিযোগিতায়ও প্রায় দেখা যায়, তথাকথিত তরুণ ফাস্টবোলার সাইট স্ক্রীন থেকে রানআপ শুরু করলেন, যেন ১০০ মিটার স্প্রিন্টিং, উইকেটের কাছে এসে কিন্তু গতিবেগ একদম কমে গেল, হয়তো বা থেমে গেলেন, তারপর হল বল ডেলিভারী। বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে এই রান আপ বোলিং এ্যাকশন-এর সম্পর্কবর্জিত, সুতরাং খামকা, অকারণ। বৃথাই এই দৌড়, বোলারের দম নষ্ট, খেলার সময় নষ্ট।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, রান আপ প্রয়োজনের বেশী বা কম যেন না হয়। নিজ অভিজ্ঞতার ফলে রান আপ শুধরে নিতে হবে। অনেক স্লো বোলারকে দেখা যায় একপ্রকার দাঁড়িয়েই বল করছেন, এক-আধটা স্টেপ নিয়ে, যেমন ভারতীয় দলের ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ (বিশেষ করে ১৯৩৬শে) সনের ইংলণ্ড সফরের দলে লেফট আর্ম বোলার পি ই পালিয়া। এও মডেল হিসাবে বাতিল করে দেওয়াই উচিত। তাঁর পেস অনুযায়ী অমর সিংএর রান আপ অত্যল্প ছিল। স্লো স্পিন বোলার হিসাবে ইংলণ্ডের ডগলাস রাইট-এর রান আপ অত্যধিক ছিল (অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান্ জনসন-এরও)। বল ডেলিভারীর সময় অমরনাথ রং ফুট-এ অর্থাৎ সামনের পা নয় একপ্রকার পিছনের পায়ে ভর করে বল ছাড়তেন—এ ধরণের দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যায়। বোলার হিসাবে সকলেই বড় ছিলেন, কিন্তু মডেল হিসাবে নয়।

রান আপ সোজা হওয়া বিধেয় এ কথা সব ক্রিকেট শিক্ষার বই, সব ক্রিকেট কোচ বলবেন। কিন্তু এ্যালেক বেডসার মিডঅফ-এর কাছ থেকে স্টার্ট

নিতেন, বহু লেফট আর্ম বোলার রাউণ্ড-দি-উইকেট বল করার সময় মিডঅফ-এর দিক থেকে ডায়েগোন্যাল বা কোণাকুনি ভাবে আম্পায়ারের পিছন দিয়ে এসে রাউণ্ড-দি-উইকেট (ডান হাতের বোলারের ওভার-দি উইকেট) বল করতেন এবং করেন। এ ক্ষেত্রে বোলারের সুবিধা-অসুবিধার কথাই বড়, অত্যধিক গোঁড়ামির অন্তত আমি ভক্ত নই।

ভাল বোলাররা অর্থাৎ যাঁরা মাথা খাটিয়ে বল করেন, তাঁরা অনেক সময় বোলিং ক্রীজের একটু পিছন থেকে বল করেন তাছাড়া বোলিং ক্রীজে কখনও স্টাম্প ঘেঁসে, কখনও ঠিক মধ্য থেকে, কখনও বা রিটার্ণ ক্রীজের কাছ থেকে বল করেন ; দু'ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানকে ঠকানো। প্রথমোক্ত কারসাজির উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানকে ফ্লাইট-এ ঠকানো (স্লো বোলারই এই কূট-কৌশলের আশ্রয় বেশী নিয়ে থাকেন, ফাস্ট বোলারদের ইয়র্কার বল করতে এটা সাহায্য করে) এবং দ্বিতীয়োক্ত কৌশল করা হয় যাতে ব্যাটসম্যানের বল বিচারের সময় দিক নির্ণয়ে ভুল হয়। এটা সহজবোধ্য, কারণ বোলিং ক্রীজের প্রস্থ ৪ ফুট, স্টাম্প ঘেঁসে বল করলে এবং বোলিং ক্রীজের শেষ সীমান্ত বা রিটার্ণ ক্রীজ থেকে বল করলে, বলের এ্যাঙ্গল এর পার্থক্য হবে, যার ফলে ব্যাটসম্যান সতর্ক না হলে ভুল হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত, নতুন বলে অমরসিং সচরাচর ইনসুইং দিতেন স্টাম্প ঘেঁসে, আউটসুইং রিটার্ণ ক্রীজের কাছ থেকে, যেহেতু বল সুইং করলেও সোজা স্টাম্পের ভিতরেই থাকত। ১৯৫৩ সনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লিণ্ডওয়ালকেও ঠিক এমনই করতে দেখেছি।

মোট কথা, বোলিং এ্যাকশন—গ্রিপ, রান আপ, ডেলিভারীর সময় পা ফেলা, ডেলিভারীর পর ফলো থ্রু স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ যাতে হয় সেটাই আসল কথা। ফলো থ্রু, অথবা বল ডেলিভারীর পর যে টুকু দৌড় অপরিহার্য, সেটা সব সময়ই উইকেট বাঁচিয়ে করতে হবে। প্রথম কারণ, ঐ একই উইকেটে নিজেদের ব্যাট করতে হবে, সুতরাং বোলারের বুটের স্পাইকে উইকেট ড্যামেজ বা ক্ষতি করে নিজেরাই যেন খাল কেটে কুমীর ডেকে না আনেন (যে কারণে ব্যাটসম্যানরা উইকেটের উপর দিয়ে না দৌড়ে, পাশ দিয়ে দৌড়োন ; অবশ্য ব্যাটসম্যান বা বোলারের ত্রুটি যাতে না হয় সে সম্বন্ধে আম্পায়ারদের কড়া নজর রাখার পূর্ণ অধিকার আছে)। দ্বিতীয় কারণ, ফলো থ্রু-র পর যদি বোলার আম্পায়ারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন (অনেকেই যা করে থাকেন), তাহলে লেগ বিফোর উইকেট বা

উইকেটে ক্যাচ-এর সিদ্ধান্ত বোলারের অনুকূলে হলেও, সে সিদ্ধান্ত বোলারের প্রতিকূলে যাবে, কারণ বোলারের দোষে আম্পায়ার অনসাইটেড হলে বা দেখতে না পেলে, আম্পায়ার মীমাংসা করতে পারবেন না। সে ক্ষেত্রে বোলারের-ই নিজের ভুলের জন্য হাত কামড়ানো ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না।

ফাস্ট বোলারের প্রয়োজন মজবুত শরীর, অসীম স্ট্যামিনা (ক্লান্ত না হয়ে বহুক্ষণ ধরে বল করার ক্ষমতা) এবং লম্বা হওয়া। যদিও আগে গিলক্রিস্ট ও রামাকান্ত দেশাই-এর (দেশাইকে বড় জোর ফাস্ট-মিডিয়াম বলা যেতে পারে) উদাহরণ দেখিয়ে বলেছি, খর্বাকৃতি হয়েও ফাস্ট বোলার হওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে ৬ ফুটের উপর লম্বা বোলার হাই ডেলিভারী-তে বল করলে, বলের লিফট হবে বেশী—অর্থাৎ পিচ পড়ে বল লাফাবে বেশী এবং যে বল অপেক্ষাকৃত বেশী লাফায়, সে বল খেলতে ব্যাটসম্যানদের অসুবিধা বেশী। সুতরাং ফাস্ট বোলার দীর্ঘাকৃতি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ফাস্ট বোলার বিনা কোনও ক্রিকেট দলই সম্পূর্ণ হয় না; ফাস্ট বোলারের কাজ, বিরুদ্ধ দলের ব্যাটসম্যানকে তড়ি-ঘড়ি আউট করা। জোর বল, সুতরাং ব্যাটসম্যানদের তাড়াহুড়ো করে খেলতে হয়; এবং সে ক্ষেত্রে ব্যাটস-ম্যানদের ভুল করার সম্ভাবনা বেশী, বিশেষ করে বল নতুন হলে। তা ছাড়া বাম্পার তো আছেই; বাম্পার ক্রিকেটের আইনে নিষিদ্ধ নয়, পরিমিত হলে।

ফাস্ট বোলারের রান আপ সমেত বোলিং এ্যাকশন-এর কথা পূর্বেই বিশদভাবে বলেছি। রান আপ অত্যধিক লম্বা না হয়ে ১৫-১৬ গজ হলেও, রান আপ ও ডেলিভারীর সময় একটা মারমুখো, যুদ্ধং দেহি ভাব থাকলে ফাস্ট বোলারের সাহায্যই হয়। ভারতের স্বনামধন্য ফাস্ট বোলার রামজী ও নিসারের বিরুদ্ধে একাধিকবার খেলেছি, কিন্তু রামজীর রান-আপ-এর সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি, মনে আতঙ্ক না হলেও বেশ একটা অস্বস্তি বোধ হত। এটা কাপুরুষের কথা নয়, মানুষের স্বভাব-ধর্মের; বম্বে জিমখানার তৎকালীন স্পোর্টিং উইকেটে কোয়াড্রাঙ্গুলারে ইয়োরোপীয়ন দলের এ্যালেক হোসি, হিন্দু দল তথা দুর্ধর্ষ রামজীর বিরুদ্ধে প্রথম ২০০ রান করে বম্বে কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্টে রেকর্ড করেন ১৯২৪ সনে। আমরা ১৯২৮ সনে দিল্লির রোশনারা গ্রাউণ্ডের ম্যাটিং উইকেটে রামজীর বিরুদ্ধে খেলতে যাচ্ছি শুনে সেই হোসি বলেছিলেন: আই উড নট্ লাইক টু ফেস রামজী অন এ ম্যাটিং উইকেট
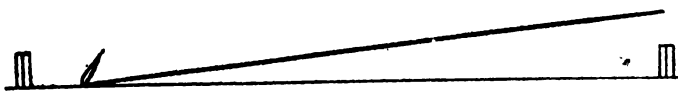
ইয়র্কার ॥ এ ক্ষেত্রে বল পিচ পড়ে ব্যাটসম্যানের গার্ড বা ব্লক-হোলের ঠিক পিছনে, স্টাম্পের দিকে।

লং-হপ ॥ লং-হপে ব্যাটসম্যান প্রচুর সময় পান ধীরে সুস্থে পুল বা হুক করার। বল লাফালেও ব্যাটসম্যানের কোন ক্ষতি হয় না।
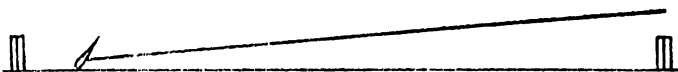
ফুল-টস ॥ এ ক্ষেত্রে বল কোন পিচ না পড়ে সোজা ব্যাটে এসে আঘাত করে।
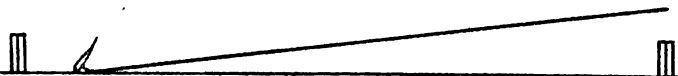
হাফ-ভলি ॥ হাফ-ভলিতে বল বাউন্স করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাটে আঘাত করে।

গুড-লেন্থ ॥ বোলার এ ক্ষেত্রে এমন জায়গায় বল পিচ করবেন, যাতে ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড না ব্যাক খেলবেন সেটা একনজরে সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে। ব্যাটসম্যান স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে না খেলতে পারবেন ফরোয়ার্ড, না ব্যাক।

ফর এনিথিং ইন দি ওয়ার্ল্ড, নট্ সো মাচ ফর হিজ ন্যাষ্টি বাম্পার্স বাট ফর হিজ ফ্রাইট্নিং রান আপ!—অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু মহার্ঘ জিনিষের বিনিময়েও, ম্যাটিং উইকেটে হোসি রামজীর বিরুদ্ধে খেলতে রাজী নন, রামজীর বেয়াড়া, বিশ্রী বাম্পারের জন্য নয়, রামজীর রান-আপ-এর সময় ভীষণ ও ভীতিকর মূর্তির জন্য!

সাধারণত নতুন বলে সুইং হয়, এবং ফাস্ট বোলাররা স্বভাবতই বল সুইং করার চেষ্টা করেন, তবে সেটা বল গ্রিপ করার উপর নির্ভর করে। সুইং বোলিং-এর পরিচ্ছেদে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আজও একাধিক ফাস্ট বোলার সচরাচর বল সুইং করান না, করাবার চেষ্টাও করেন না, যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়েসলী হল্। ফাস্ট বোলারের দু'টি মহাস্ত্র ইয়র্কার এবং বাম্পার। ইয়র্কার অর্থে এমন বল যেটা পিচ পড়ে ব্যাটসম্যানের গার্ড বা ব্লক-হোলের ঠিক পিছনে (স্টাম্পের দিকে); অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের ব্যাটের আগা বলের উপর দিয়ে চলে যায়, যে ভুল সম্ভব বলের স্পীড বা গতিবেগের জন্য।

নতুন বলে ইয়র্কার ব্যাটসম্যানের পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু ইয়র্কার আয়ত্তে আনা বিশেষ সাধনার ব্যাপার; কারণ সামান্য ভুল হলেই ফুল-টস্ অর্থাৎ ফুল পিচ পড়ার বিশেষ ভয় এবং ফুল পিচ-এ রান ওঠে। তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে ইয়র্কার বল সোজা মিডল স্টাম্পে লক্ষ্য করতে হবে, স্টাম্পের বাইরে হলে কোন কাজেই লাগবে না। বল বরঞ্চ ওভার পিচ ফেলা ভাল, আণ্ডার পিচ অর্থাৎ শর্ট পিচ কখনও না; কারণ ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়েই ব্যাটসম্যানের ভুলচুক হয় বেশী, এবং অনেক সময় বল শেষ মুহূর্তে আউট সুইং বা ইন সুইং করে যার ফলে উইকেটকীপারের হাতে, স্লিপ অথবা শর্ট লেগে ক্যাচ ওঠে।

ফাস্ট বোলারের অস্ত্রের মধ্যে একটি হল বাম্পার; অর্থাৎ যে বল মাটিতে পিচ পড়ার পর বেশ লাফায়, বুকের বা মুখের দিকে—ব্যাটসম্যানকে সামলাবার সময় না দিয়ে। লং হপ অর্থাৎ যাকে চলতি ভাষায় হাফ-পিচ বলা হয়, ফাস্ট বোলার মাটিতে ঠুকে দিলে সে ধরণের বল মাথার সমান লাফালেও ব্যাটসম্যানের কিছু এসে যায় না; বেমক্কা লাফালেও বল ছেড়ে দেবার, বা তেমন না লাফালে এবং বাগে পেলে ধীরে-সুস্থে পুল বা হুক করার যথেষ্ট সুযোগ ব্যাটসম্যান পাবেন। যথার্থ বাম্পার বলতে, বল হবে স্টাম্পের উপর

সোজা, সামান্য শর্ট পিচ থেকে বল বুক বা মুখের দিকে বিপজ্জনক ভাবে লাফাবে, যেটা সময়াভাবে ব্যাটসম্যান বিচার করে ছাড়তে পারবেন না, মারতেও পারবেন না, খেলতে বাধ্য হবেন আত্মরক্ষামূলক ভাবে, অথবা ভাল করে না দেখে শুনে ব্যাট ঘোরাতে হবে—লাগে তুক না লাগে তাক। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যানদের আউট হবার বিশেষ ভয়। অবশ্য বিষস্য বিষৌষধম্—উঁচুদরের ব্যাটসম্যান উঁচুদরের বোলারদের যথার্থ বাম্পার কী করে খেলতে পারেন তার আলোচনা ব্যাটিং সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে করেছি।

যথার্থ বাম্পার বহু ফাস্ট বোলারকে দিতে দেখেছি—রামজী, লারউড, বিল বোওস (ইংলণ্ড), ক্লার্ক (ইংলণ্ড), কনস্টানটাইন, লিণ্ডওয়াল, মিলার, ট্রুম্যান, স্টেথাম, ওয়েসলী হল, গিলক্রীস্ট, পাকিস্তানের খাঁ মহম্মদ ও মামুদ হোসেন (বিশেষ করে কয়ের ম্যাটিং-এ), নিসার, সুঁটে ব্যানার্জি, রামাকান্ত দেশাই ইত্যাদিকে। কিন্তু আমার চোখে রামজী, কনস্টানটাইন, মিলার-এর বাম্পার-ই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক লাগত। মিলারের রান আপ ও ডেলিভারী মোটেই ভয়ঙ্কর ছিল না, মাত্র দশ এগারটি স্টেপ, কিন্তু কী তড়িৎ-গতিতে প্রায় গুডলেন্থ থেকেই বেমক্কা ভাবে মিলারের বাম্পার উঠত। আর একটি নাম করব খর্বাকৃতি রামাকান্ত দেশাই-এর। ১৯৫৮ সনে নয়াদিল্লিতে শেষ টেস্ট, পরে ইংলণ্ডে এবং ভারতে তাঁর বাম্পারের জুড়ী মেলা ভার।

সুঁটে ব্যানার্জি

হয়তো মিলারের অত অল্প রান আপ-এর পর ব্যাটসম্যানরা অমন দুর্দান্ত বাম্পার সম্ভব বলে মনে করতেন না, অতর্কিতে বাম্পার এলে হত বিপদ। অনুরূপ কারণে, অর্থাৎ দেশাই-এর খর্বাকৃতির জন্য ব্যাটসম্যানরা হন অসাবধান, সে কারণেই হয়তো দেশাই-এর বাম্পারে এই সাফল্য। অতর্কিতে বাম্পার এলে ফল

হয় বেশী, সে হেতু বিশেষ কারণ না থাকলে, এক ওভারে এক আধটি বাম্পার দেওয়াই বিধেয়। হরদম বাম্পার দিলে, ব্যাটসম্যান সতর্ক হবেন, কাজ বিশেষ হবে না।

প্রসঙ্গত, নাম করা ফাস্ট বোলাররা সকলেই ইয়র্কার বল অল্পবিস্তর ভালই করতেন বা করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও স্থইংইং ইয়র্কার বল করার কৃতিত্ব বিশেষ করে চোখে পড়েছে লিণ্ডওয়াল ও নিসারের। স্থইংইং ইয়র্কার অর্থে যে বল বাতাসে স্থইং করার পর ব্যাটসম্যানকে ইয়র্ক করে; বলা বাহুল্য স্থইংইং ইয়র্কার বল করা বিশেষ কঠিন, বোলারের আবহাওয়া, বায়ুবেগ ইত্যাদির উপর নজর রেখে সঠিক ডিরেকশন রেখে ব্যাটসম্যানকে ইয়র্ক করার জন্য প্রয়োজন অসামান্য কনট্রোল।

ফাস্ট বোলারের অসম্ভব পরিশ্রম, শরীরের উপর ধকলও যথেষ্ট, বিশেষ করে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন বল মাটিতে ঠুকে বাম্পার দিতে হয়। সামনের পায়ের উরু এবং কুঁচকিতে মাসল-এ টান পড়ার বিশেষ সম্ভাবনা, শিক্ষার্থীদের সেটা মনে রেখে শরীরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

ফাস্ট বোলিং সম্বন্ধে আর একটি কথা শোনা যায়—বীমার—যার মানে সোজা বাঙ্গলা ভাষায় সজোরে ব্যাটসম্যানের বুক, মুখ, মাথা টিপ করে ফুল পিচ বল দেওয়া। এই বীমার-এর বিভৎসতা প্রকট করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল ও গিলক্রীস্ট। সাহসী ব্যাটসম্যান বীমার মেরে রান করতে পারেন অবশ্য, কিন্তু এটা বডি লাইনের মতোই, হয়তো তার থেকে বেশী বিপজ্জনক। ক্রিকেটে বীমার-এর স্থান থাকা বিধেয় নয়।

দলে দু'জন যথার্থ ফাস্ট বোলার সাধারণত বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু থাকলে যে নতুন বলে দুজনকেই একসঙ্গে ব্যবহার করা হয় সেটা বলার প্রয়োজন হয় না। এটাও বলা বাহুল্য যে সে ক্ষেত্রে একজনকে উইণ্ড বা হাওয়ার প্রতিকূলে বল করতে হবে যাতে শরীরে উপর ধকল আরও বাড়বে। যুদ্ধপূর্ব ও যুদ্ধোত্তর কালে বরাবরই দেখেছি এক স্পেল-এ ৫।৬ ওভারের বেশী ফাস্ট বোলারকে দিয়ে বল করান হত না। পর পর উইকেট পেলে অন্য কথা, কিন্তু সাধারণত শর্ট স্পেল-এ বল করানো বিধেয় সেটা তরুণ বোলারদের ও অধিনায়কদের মনে রাখতে হবে। কারণ ফাস্ট বোলার পূর্ণ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে তাঁর প্রতি-ডেলিভারীর পিছনে থাকতে হবে পূর্ণ সতেজতা, সক্রিয়তা।

কিন্তু গিলক্রীস্ট, হল্, স্টেথাম ইত্যাদি আধুনিক ফাস্ট বোলারকে একসঙ্গে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বল করানো হয় যেটা অনুচিত। কখন কখন রান আটকানোর জন্য ফাস্ট বোলারকে রাখা হয়—এক আধটা উইকেট পেলে ভালই, রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হল। রান আটকানো সম্ভব কারণ ফাস্ট বোলারদের রান আপ-এ সময় বেশী লাগে, যার ফলে খেলার সময় নষ্ট হয়; আর ওভারে দু' একটি বল বাম্পার বা স্টাম্পের বাইরে হলে ব্যাটসম্যান সাধারণত সে বলের নাগাল পান না। এটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

মিডিয়াম পেস

মিডিয়াম পেস বলতে ফাস্ট মিডিয়াম (মরিস টেট্, অমর সিং, এবং আজকের রামাকান্ত দেশাই-এর মতো) থেকে স্লো মিডিয়াম, অর্থাৎ স্লো বোলিং-এর থেকে সামান্য জোর, যেমন ভারতের গুলাম আমেদ। কিন্তু মিডিয়াম বলতে যথার্থ ফাস্ট বোলারের থেকে কিছুটা স্লো, এই রূপই মনে উদয় হয়, যেমন এলেক বেডসার, ফজল মামুদ ইত্যাদি। ঠিক বেডসার বা ফজল মামুদের মতো কৃতী না হলে, মিডিয়াম পেস-এর বোলারই যথার্থ বীস্ট অব বারডেন্, বোলিং-এর বোঝা তাঁদেরই ঘাড়ে; বেডসার ও ফজলের উপরও ঝক্কি কম ছিল না। দলের প্রয়োজন মতো তাঁরা নতুন বল পান, না হলে আধা নতুন অথবা পুরানো। কখনও সুইং বলে এ্যাটাকিং বা আক্রমণাত্মক বোলিং, কখনও পুরানো বলে ব্রেক দিয়ে আক্রমণ, আর কখনও বা স্রেফ রান আটকে রাখার ভূমিকা (অন্য দিকে হয়তো কোনও ফাস্ট বা স্লো বোলার উইকেটে সাহায্য পেয়ে উইকেট নিয়ে যাচ্ছেন)—এ সবই মিডিয়াম পেস বোলারকে করতে হয়।

মিডিয়াম পেস বোলিং-এ কৃতী হতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিখুঁত লেন্থ ও ডিরেকশন। ফাস্ট বোলারের থেকে মিডিয়াম পেস-এর বোলার বল বেশী সুইং করাতে পারেন, তাঁদেরও নতুন বলে ব্যাটসম্যানকে ফরোয়ার্ড খেলাতে হবে। সাধারণত (ডান হাতের) আউট সুইং বোলার অফ ব্রেকও করাতে পারেন, ইন সুইং বোলার লেগ ব্রেক। ক্বচিৎ কদাচিত এমনও হয় (সাধারণত বোলারের অজান্তে) যে বল সুইং করার পর ব্রেকও করল, এমন বল কর্ক-স্ক্রু বলে পরিচিত।

সুইং হয় অন্য কারণে—স্পিনের জন্য নয়—সুইং নির্ভর করে নতুন বলের

ফাস্ট ও ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার বিশেষজ্ঞ। এ আয়ত্ত করার কোনও সহজ পন্থা নেই, সীম নির্দেশ অনুযায়ী রেখে বল সঠিক গ্রিপ করে প্র্যাকটিসের ফলে লেট সুইং আয়ত্তাধীন করা যায়।

সুইং বোলারদের স্মরণে রাখা উচিত নতুন বলে খালি সুইং করলেই কিছু হবে না, কতটা বল সুইং করবে সেটা বাদ দিয়ে। শেষ পর্যায় যাতে বল স্টাম্পের উপর বা খুব কাছাকাছি থাকে যাতে ব্যাটসম্যান বলটি খেলতে বাধ্য হন, সেটা আয়ত্ত করতেই হবে। বড় টেস্ট খেলাতেও শোনা যায়ঃ হি ইজ ওয়েষ্টিং দি নিউ বল— অর্থাৎ নতুন বল কোনও কাজে লাগাতে পারছে না। নষ্ট করছে। বোলার খুব সুইং করালেন, ব্যাটসম্যান কাঁধের উপর ব্যাট তুলে ওয়াচ করলেন, ওভারে একটি বলও কিন্তু খেলতে হল না, এটাই হচ্ছে —ওয়েষ্টিং দি নিউ বল।

শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, মিডিয়াম পেস্-এর বোলারদের তুলনায় ফাস্ট বোলারদের সুইং অপেক্ষাকৃত কম হয়। কিন্তু বলের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭৫—৮০—৮৫ মাইল, সে ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে লেটসুইং ৩-৪ ইঞ্চি হলেও ব্যাটসন্যানের বিপদ যথেষ্ট।

সীম বিশেষ না থাকলেও যতক্ষণ বলের এক পাশে সামান্য শাইন থাকে, ততক্ষণ অনেক বোলার সুইং করাতে পারেন। ক্রিকেট মাঠের রেওয়াজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বল পেলেই একবার ট্রাউসারসে ঘষে নেওয়া ; কিন্তু সব সময়ই বলের একটি দিক ঘসা হচ্ছে, অন্য দিক রাফ বা এবড়ো, খেবড়ো যে দিকে শাইন সেই দিকেই বল ঘুরবে।

নতুন বলে সুইং করার পর মাটিতে পিচ্ পড়ার পরও সুইং-এর দিকে কখন কখন বল সুইং-এর ডিরেকশন্-এ বা বিপরীত দিকেও টার্ণ বা ব্রেক করে থাকে ; কর্ক-স্ক্রু বলের কথা আগেই বলেছি আউট সুইং হয়ে অফ্ ব্রেক, অথবা ইন সুইং হবার পর পিচ্ পড়ে লেগব্রেক। এটা সচরাচর সম্ভব গ্রীন উইকেটে, এবং নির্ভর করে মাটিতে পিচ্ পড়ার সময় সীম-এর এ্যাঙ্গল-এর উপর। এ-ধরণের বল কম দেখিনি, কিন্তু এটা হয় দৈবাৎ, বলে বলে এমন কর্ক-স্ক্রু বল ফেলতে পারেন, এমন বোলার আমার জানা নেই।

সীম বোলার—কথাটা শোনা যায়, বিশেষ করে ইংলণ্ডে—কারণ ঐ গ্রীন উইকেটের প্রাচুর্য। মুভিং অফ দি সীম—এ-কথা প্রায়ই শোনা যায়—অর্থাৎ সীম-এর উপর পিচ পড়ে বল মুভ বা বেঁকে যাচ্ছে। সাধারণত মিডিয়াম পেস্

বলেই এই মুভিং অফ দি সীম হয়ে থাকে। বল এতে বিশেষ বেশী মুভ করে না, তবুও যতটা হয় তাতে অনেক সময় বেশ কাজ হয়।

তাই শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে হাত থেকেই বল সুইং করানো অর্থাৎ কার্টহুইল্ সুইং-এ বোলার আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, কিন্তু ব্যাটসম্যানের তাতে কিছু আসে যায় না; সুইং করাতে হলে লেট সুইং করাতে হবে যাতে ব্যাটসম্যানের সমূহ বিপদ। অনেক দিন আগের কথা, কলকাতার বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে তখন গ্রীন পিচ, ক্রীস্টমাসের ছুটিতে খেলা, মেঘলা দিন, উচ্চাঙ্গের ফাস্টমিডিয়াম বোলার স্বর্গত স্ট্যানলী বেরেণ্ড দুর্দান্ত ইন-সুইং দেন, একটা বল পপিং ক্রীজের সামান্য আগেও মনে হয়েছিল অফ-এর বাইরে ওয়াইড। নড়িচড়ি নি এমন কী উইকেট কভার পর্যন্ত না, সেই বল সুইং করে আমার প্যাডে লেগে হয়েছিলাম বোল্ড আউট—বল আমার প্যাডে না লাগলে ফাইন লেগে বাউণ্ডারীতে হয়তো যেত! একেই বলে লেট সুইং। তাই কয়েকটা ডায়গ্রাম দেখতে বলব—তাতে বোঝা যাবে কার্টহুইল্ ও লেট-সুইং-এর পার্থক্য।
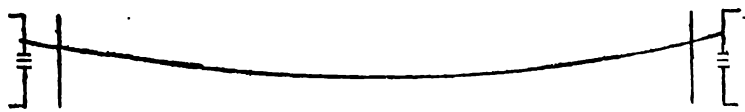
কার্ট হুইল সুইং। এ ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যান ওয়াচ বা লক্ষ্য করার যথেষ্ট সময় পাবেন এবং সুইং—এর ব্যর্থ উদ্দেশ্য হবে।

লেট আউট-সুইং। বল সোজা গিয়ে, ব্যাটসম্যান খেলতে যাবার মুখে সুইং করবে। এ অবস্থায় ব্যাটসম্যান নিশ্চয়ই বিপদে পড়বেন।
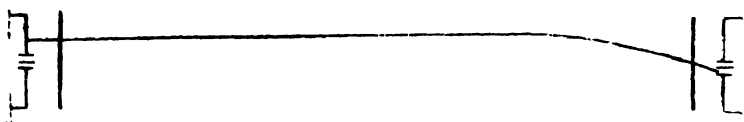
লেট ইন-সুইং। লেট ইন-সুইং বোলার বহু ব্যাটসম্যানের বোল্ড অথবা লেগ-বিফোর—উইকেটের কারণ হয়ে দাঁড়ান।

বিশুদ্ধ লেগ ব্রেক বোলার হিসাবে রিচি বেনো বা সুভাষ গুপ্তের জুড়ি দেখিনি।

লেফট আর্ম স্পিন

রাইট আর্ম বা ডান হাতের বোলারের প্রথম আঙ্গুল বা তর্জনীর জোরে অফ স্পিন যেমন ন্যাচরল বা স্বাভাবিক বল, যে অফ স্পিন-এর কনট্রোল অপেক্ষাকৃত সহজ তেমনই লেফট্-আর্ম বা বাঁ হাতের (ন্যাটা) বোলারের তর্জনীর শক্তিতে অফ স্পিন (ডান হাতের ব্যাটসম্যানের পক্ষে লেগ ব্রেক) সহজাত, এবং লেন্থ ও ডিরেকশন-ও ভাল হয়। কিন্তু জগতে ডান হাতের ব্যাটসম্যানেরই আধিক্য এবং যে হেতু লেগ ব্রেক বল খেলায় ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিপদ অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই কারণে লেফট আর্ম বোলারের বোলিং-এ একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ব্যাটসম্যানের পক্ষে ভাল, ফার্ম বা শক্ত উইকেটে তর্জনীর শক্তিতে স্পিন ছাড়া রাইট আর্ম বোলারের যে সকল গুণ থাকা দরকার, সে সব কিছুই লেফট্ আর্ম বোলারদের থাকতে হবে।

যদিও অস্ট্রেলিয়াতে লেফট্ আর্ম বোলার সাধারণত ওভার-দি-উইকেট অর্থাৎ আম্পায়ারের ডান দিক দিয়ে বল করেন, তবু রাউণ্ড-দি-উইকেট অর্থাৎ আম্পায়ারের বাঁ দিক দিয়ে বল করা বিধেয়, বিশেষ করে যে উইকেটে স্পিন হচ্ছে। প্রথম এবং মূখ্য কারণ, রাউণ্ড-দি-উইকেট বল করলে বল স্টাম্পের উপর পড়ে যথোপযুক্ত ব্রেক করলে উইকেটের ভিতর সোজা হয়ে গিয়ে লেগব্রেক লেগ বিফোর উইকেট পাওয়া যাবে ; তাছাড়া ব্যাটসম্যানকে সব বলই খেলতে হবে। অধিকন্তু, লেফট্ আর্ম বোলারের জোর বল—আর্মার—অফ-এর বাইরে পিচ পড়লেও, বোলারের চেঞ্জ অব পেস্ যদি অতর্কিত হয়, তাতেও লেগ বিফোর উইকেট অথবা শর্ট ফাইন লেগ-এ ক্যাচ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

যে উইকেট স্টিকী ডগ বলে পরিচিত (শক্ত মাটির উইকেট বৃষ্টিতে ভেজার পর প্রখর সূর্যের তাপে যে উইকেটে স্পিন বেশ জমছে, বল হঠাৎ লাফাচ্ছে), এমন উইকেটে বল লোয়ার ট্র্যাজেক্টরি-তে অর্থাৎ নিচু রেখে যথাসম্ভব জোরে (যাতে ব্যাটসম্যান বেশী সময় না পান) লেগব্রেক করানো অত্যাবশ্যক। এ ধরণের উইকেটে উচ্চাঙ্গের লেফট আর্ম বোলার বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াতে পারেন যা প্রমাণ করেছেন রোডস, হার্স্ট, ব্লাইদ প্রভৃতি—এবং আমার দেখা ট্যারাণ্ট, ভেরিটী এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যালফ্রেড ভ্যালেন্টাইন। সব ক্ষেত্রে অবশ্য

ষ্টিকী ডগ ছিল না, শুকনো (ফার্ম) এবং ভাঙ্গা বা ক্রামব্লিং উইকেটেও, ব্যাটসম্যানের একই বিপদ।

ব্যাটসম্যানের সহায়ক উইকেটে ফ্লাইট ও চেঞ্জ অব পেস-এ মানকাদ দুর্দান্ত ছিলেন, ষ্টিকী-ডগ বা ড্রাই ক্রামব্লিং উইকেটেও মানকাদের জোর বল

অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের খেলা—১৯৪৭—৪৮ সনে
ব্রাডম্যানকে এল বি ডবল্যু-তে আউট করা হয়েছে।

ছিল আর্মার, জোর বল নিচু রেখে তিনি ব্রেক করাতে তেমন পারতেন না। মানকাদ অপেক্ষা টার্ণিং উইকেটে ডান হাতের বোলার অমরনাথ অনেক বেশী মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছিলেন ভারতের অষ্ট্রেলিয়া সফরে (১৯৪৬-৪৮)।

বলা বাহুল্য, যে কোনও উইকেটে লেফট্ আর্ম স্পিন বোলারের বল স্টাম্পের সোজা রাখতে হবে (ফার্ম উইকেটে অফ স্টাম্প নাগাৎ) এবং উইকেট অনুয়ায়ী ফিল্ড সাজাতে হবে। ফার্ম উইকেটে লেফট আর্ম বোলারের

ধৈর্য রাখতে হবে, কিন্তু উইকেট সাহায্য করলে তাঁদের মূর্তি হতে পারে এবং হবে মারাত্মক!

স্লো লেফট আর্ম স্পিন বোলার অবশ্যই লেগ ব্রেক (ডান হাতের ব্যাটস-ম্যানের পক্ষে অফব্রেক), টপ স্পিন, ও গুগলী (যেটা চায়নাম্যান বলে পরিচিত) করাতে পারেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভাল হাতের লেগব্রেক বোলারদের মতো লেফট আর্ম বোলারদেরও কনট্রোল বিশেষ কঠিন। রাইট-আর্ম বোলারের মত একই গ্রিপ, উচ্চাঙ্গের বোলার হতে হলে আর যে সব জিনিষ প্রয়োজনীয় সবই দরকার। রাইট আর্ম বোলারের তুলনায় লেফট আর্ম অনেক কম, লেফট আর্ম উচ্চাঙ্গের লেগব্রেক (আবার স্মরণ করিয়ে দেব ডান হাতের ব্যাটসম্যানের পক্ষে অফব্রেক, এবং গুগলী বা চায়নাম্যান লেগব্রেক) বোলার সারা বিশ্বে হাতে গোনা যায়, তাও না। ডেনিস কম্পটনকে এ-বল করতে দেখেছি, কিন্তু নাম করতে গেলে, বোধ করি, এক মাত্র অষ্ট্রেলিয়ার জর্জ ট্রাইব। ট্রাইব সাধারণত অফ-স্টাম্পের সামান্য বাইরে বল করতেন।

কাটার—অফ এবং লেগ

বেডসার, ফজল মামুদ প্রমুখ বোলার সংক্রান্ত মিডিয়াম-পেস্ বোলারের কথা উঠলেই লেগকাটার কথাটা শোনা যায়। কিন্তু অফ্‌কাটার ও হয়। এই দু'টি কথাই আজকাল বেশী শোনা যায়, তবু এই দু'টি বল হয়তো বরাবরই ছিল, মাত্র কাটার বলে পরিচিত ছিল না। মিডিয়াম পেস লেগব্রেক বা অফব্রেক বোলার বলা হত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় একজনের নাম করতে পারি (প্রায় ২৫-৩০ বছর আগেকার কথা) পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির স্বর্গত বাকা জলানী যিনি ১৯৩৬ সনের ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলে ছিলেন। বেশীর ভাগ লেগব্রেক গ্রিপ-এ বল করতেন, অনেক সময় বল কাট-ও করতেন, কারণ এমন বল বাকা জিলানীর হাতে শুধু দেখিনি, নিজে খেলেছি।

বেডসার লেগকাটার বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ; তাঁর জুড়ী ছিলনা কেউ। তর্জনী সীম-এর উপরে বাঁ দিকে সামান্য আড়াআড়ি ভাবে, দ্বিতীয় আঙ্গুল সামান্য ফাঁক দিয়ে সীম-এর ডান দিকে, বলের তলায় ডান দিকের সীম-এর উপর তৃতীয় ও চতুর্থ (কড়ে) আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল বলের তলায় বাঁ দিকের সীম-এর উপর। আলতো ভাবে এই গ্রিপ-এ বল ধরে, বল ডেলিভারীর

সময়, বিশেষ করে দ্বিতীয় আঙ্গুলের জোরে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সীম কাট করলে, বল লেগ থেকে অফ-এ বেঁকবে, যাকে বলা হয় লেগকাটার। আগেই বলেছি কাটার-এর জন্য বল জোরে করা প্রয়োজন। স্পিন অর্থে, আঙ্গুলের জোরে বল ঘোরানো; কাট অর্থ কথায় ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু স্পিন করানোর সময়ের মতো কব্জি অতটা ঘুরবে না, দ্রুতগতিতে আঙ্গুলের চাপে, বলটা প্রয়োজন মতো লেগ থেকে অফ-এ, বা অফ থেকে লেগে কাট করতে হবে। এও ঠিক সন্তোষজনক হল না, কিন্তু ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্যক্ষেত্রে কাট কথার সম্যক অর্থ বুঝতে পারে'ন।

বোলিং-এর কথা এখানেই শেষ করলাম। শুধু বলব যে সব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারও বহু রকমফের হয়। সব বোলারদেরই মাথা খাটিয়ে বল করার প্রয়োজন, বিশেষ করে স্লো বোলারদের। ফিল্ডিং সাজাতে হবে মাত্র বাঁধা ধরা নিয়মে নয়, প্রকৃতির আবহাওয়া, উইকেটের অবস্থা, ব্যাটসম্যানের কোথায় বা বিশেষত্ব কোথায় বা দুর্বলতা, খেলার পরিস্থিতি—এ-সব বিচার করে। কিন্তু সবের উপর সেই এক কথা—গোড়ার কথা এবং শেষের কথাও লেন্থ এবং ডিরেকশন রপ্ত না করতে পারলে অসামান্য প্রতিভাও যাবে মাঠে মারা। তাই, মনে রাখতে হবে এই দু'টি জিনিষ আয়ত্ত করা—যেটা সম্ভব হবে অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্র্যাকটিশের ফলে—অবশ্য বোলিং-এর উপযোগী কিছুটা প্রতিভা থাকলে। আর একটি কথা, বোলিং হতে হবে এ্যাট্যাকিং—আক্রমণাত্মক—পারতপক্ষে ডিফেনসিভ—আত্মরক্ষামূলক—কদাচ নয়। এই বই-এর উপক্রমণিকায় এ-সম্বন্ধে বলেছি, উপসংহারেও আর দু'এক কথা বলব।

ফিল্ডিং

সাধারণত তরুণ শিক্ষার্থীরা ব্যাটিং ও বোলিং এর ভক্ত ও অনুরাগী, ফিল্ডিং মনে হয় অনর্থক পরিশ্রম, একটা বোঝা-বিশেষ; সে কারণেই, বোধ করি, ফিল্ডিং অবহেলা করা হয়। সচরাচর প্র্যাকটিশে ব্যাটিং ও বোলিং করেই যেন ক্রিকেটের অনুশীলন শেষ হয়ে গেল, ফিল্ডিং—ওটা তো মাঠে নামলেই হল। এর থেকে বড় এবং বেশী মারাত্মক ভুল ক্রিকেট খেলায় হতে পারে না।

এই বইয়ের অন্যত্র ভাল, নির্ভুল ফিল্ডিং কী ধরণের অসাধ্য সাধন করতে পারে তার দু'একটা নজীর দিয়েছি। ভাল ফিল্ডিং যে ব্যাটিং এবং বোলিং-এর মতোই অপরিহার্য—হয়তো বেশী—সে কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর একটা কথা, কিছুটা সহজাত ট্যালেন্ট না থাকলে ভাল ব্যাটসম্যান বা বোলার হওয়া অসম্ভব, কিন্তু সবল ও সুস্থ তরুণ পরিশ্রমের ফলে বেশ ভাল ফিল্ডসম্যান দাঁড়িয়ে গেছেন এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

একটি মাত্র উল্লেখ করব। সুরুতে বিজয় মার্চেন্টকে ভাল ফিল্ডসম্যান বলা যেত না; কিন্তু নিয়মিত দৌড়ে এবং ফিল্ডিং প্র্যাকটিশ করে তিনি শেষ পর্যন্ত মাত্র চলনসই নয়, ভালই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এখানেও অবশ্য সেই রিফ্লেকস-এর কথা, যেটার বিশেষ প্রয়োজন ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি ফিল্ডসম্যানদের—যেমন স্লিপ, গালী; শর্টলেগ প্রভৃতির—এবং অপেক্ষাকৃত দূরের মধ্যে কভার পয়েন্টের। কিন্তু যাঁরা কানট্রি বা ডীপ ফিল্ডসম্যান—অর্থাৎ যাঁরা উইকেট থেকে দূরে বাউণ্ডারীর কাছাকাছি ফিল্ড করেন, যেমন থার্ড-ম্যান, ফাইনলেগ, লং-অন, লং-অফ ইত্যাদি—তাঁদের রিফ্লেকস অসামান্য না হলেও, পরিশ্রমের ফলে তাঁরা ভাল ফিল্ডসম্যান হতে পারেন। এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে ফিল্ডিং ভাল না হলে তাঁরা কোনও শক্তিশালী দলে নির্বাচিত হবেন না—অন্তত হওয়া উচিত নয়।

ফিল্ডিং এ উন্নতি করতে হলে এ কথা বলা বাহুল্য যে ফিজিক্যাল ফিটনেস সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে, যেটা কিছুটা দৌড়, স্কিপিং ইত্যাদিতে সম্ভব হবে। ফিল্ডিং-এ অলরাউণ্ড—অর্থাৎ কানট্রি, কভার এবং ব্যাটের কাছে সমান কৃতিত্ব—হওয়া সচরাচর সম্ভব নয়, যেমন ধরুন লিয়ারী কনস্টানটাইন ছিলেন। দূরে ফিল্ডিং করেন তাঁরাই যাঁরা বেশ জোরে দৌড়োতে পারেন, এবং জোরে ছুঁড়তে পারেন; কাছের ফিল্ডসম্যান সাধারণত বেমক্কা ক্যাচ ধরার জন্য, সুতরাং

তাঁদের রিফ্লেকস ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, অবশ্য তাঁদেরও ৩০-৪০ গজ অনায়াসে এবং জোরে থো করতে বা ছুঁড়তে হবে।

দৌড়ান এবং জোরে বল ছোঁড়ার সহায়ক সরঞ্জাম
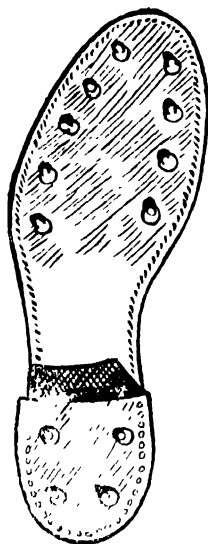
স্পাইক লাগান বুট—পৃষ্ঠা ২৯
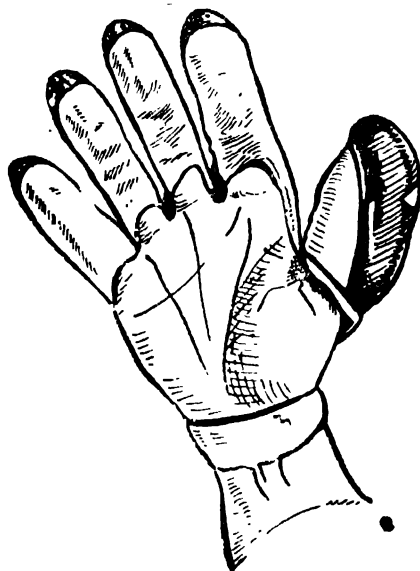
গ্লাভস—পৃষ্ঠা ২৮

বোলার বল করার সময় স্লিপ, শর্টলেগ ইত্যাদি ব্যাটের কাছাকাছি ফিল্ডসম্যান একদম নড়বেন না, বল ডেলিভারী-র সঙ্গে সঙ্গে বলের উপর তির্যক দৃষ্টি রাখতে হবে কারণ তাঁদের কাজ হচ্ছে ক্যাচ বা দ্রুতগতিতে ব্যাট থেকে যে কোনও বল ধরা বা আটকানো। সুতরাং তাঁদের দু'পা একটু ফাঁক করে, দু'পায়ে সমান ভর রেখে (যার ফলে ব্যাটসম্যানের স্টান্স-এর নীতিতে যে কোন দিকে এক লহমায় দ্রুত গতিতে নড়তে পারেন), একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোই (যার ফলে নিচু বল ধরতে সুবিধা হবে, উঁচু হলে সোজা হতে সময় লাগবে না) বিধেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখেছি—এমন কী টেস্ট ম্যাচেও—স্লিপ ফিল্ডসম্যান সোজা দাঁড়িয়ে আছেন, হাঁটুর সামান্য নিচুতে ক্যাচ, ফিল্ডসম্যান কিন্তু নিচু হতে পারলেন না। এটা অমার্জনীয় অপরাধ।

উইকেটের কাছাকাছি ফিল্ডসম্যানদের যথার্থ উচ্চাঙ্গের হতে হলে—যেমন আমার দেখা কনস্টানটাইন, সি কে নাইডু, হামণ্ড, মিচেল (ইয়র্কশায়ার), লক্ বেনো ইত্যাদি ইত্যাদি—রিফ্লেকস ছাড়াও প্রয়োজন এ্যানটিসিপেশন, অর্থাৎ ক্যাচ বা বল কি ভাবে আসবে আগে থেকেই সেটা বুঝে নেবার ক্ষমতা।

অন্য সব ফিল্ডসম্যানদের কভার পয়েন্ট, মিডঅফ, মিডঅন সমেত—বোলারকে রান আপ-এর সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে হবে, যার ফলে ব্যাটসম্যানের স্ট্রোকের সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন মতো বলের দিকে দৌড়োতে
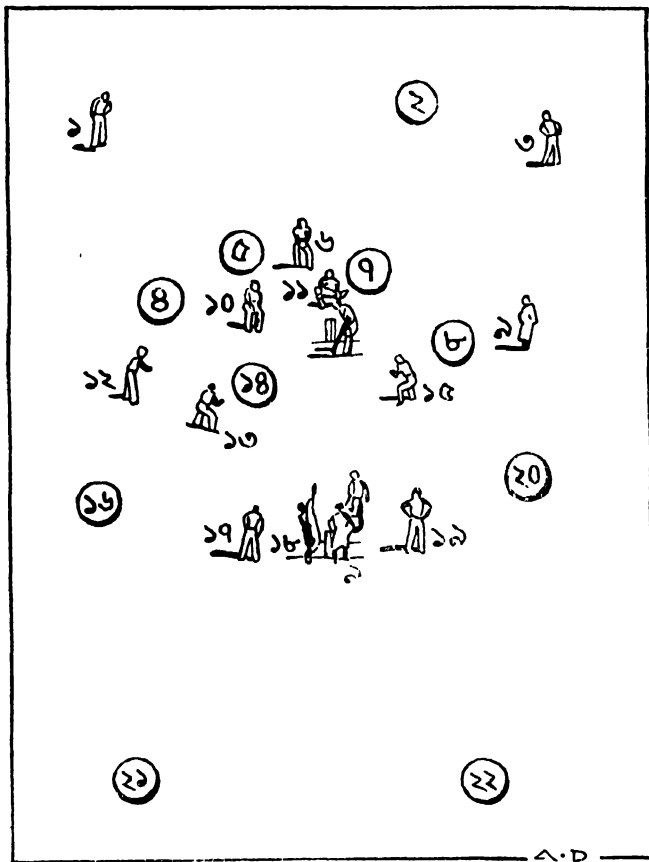
বিশেষভাবে সাজানো ফিল্ড।

১। থার্ডম্যান ২। ডীপ ফাইন লেগ ৩। লং লেগ ৪। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ৫। সেকেণ্ড স্লিপ ৬। ফার্স্ট স্লিপ ৭। শর্ট ফাইন লেগ ৮। স্কোয়ার লেগ ৯। আম্পায়ার্‌স ১০। গালী ১১। উইকেটকীপার ১২। কভার পয়েন্ট ১৩। শর্ট এক্সট্রা কভার ১৪। সিলি মিড অফ ১৫। সিলি মিড অন ১৬। এক্সট্রা কভার ১৭। মিড-অফ ১৮। বোলার ১৯। মিড অন ২০। মিড-উইকেট ২১। লং অফ ২২। লং অন।

পারেন; খোঁটার মতো গোড়ালীতে ভর দিয়ে ফিল্ডসম্যান দাঁড়িয়ে আছেন, স্ট্রোক হবার পর নড়লে কতটা সময় নষ্ট এবং তার ফলে কত রান বিরুদ্ধ

দলকে গিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে সেটা সহজেই বোধগম্য। এক নজরেই ভাল ফিল্ডিং দল বুঝে নেওয়া যায়; বোলারের রান-আপ সুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে আউট ফিল্ডার সকলেই ব্যাটসম্যানের দিকে এগোচ্ছেন, ক্লোস বা কাছের ফিল্ডসম্যানরা সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে (হাঁটুর উপর হাত না রেখে অবশ্য) তির্যক দৃষ্টিতে বলের উপর চোখ—এ দৃশ্য চোখে পড়লে বোঝা যায় ফিল্ডিং সাইড ভাল, অন্তত ভাল করার চেষ্টা সে দলের আছে।

ক্লোস ফিল্ডসম্যানদের প্রস্তুতির সম্বন্ধে সাধারণ নির্দেশ দিয়েছি। বাউণ্ডারীর কাছে দূরের ফিল্ডসম্যানদেরও বল এবং তার পরে ব্যাটসম্যানের ষ্ট্রোকের উপর নজর অবশ্যই রাখতে হবে, বোলারের রান আপ-এর সঙ্গেই স্টার্ট নিতে বা এগোতে হবে। বাউণ্ডারীর ফিল্ডসম্যান ঠিক বাউণ্ডারী লাইনে দাঁড়ান না (ক্যাপটেনের নির্দেশ থাকলে অবশ্য অন্য কথা, বিশেষ করে লং অফ, লং অন, ডীপ মিড উইকেট, ডীপ স্কোয়ার লেগ, ডীপ ফাইন লেগে), ৫-৭ গজ লাইনের ভিতরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ; কারণ ক্যাচ উঠলে মাথার উপর দিয়ে পিছনে হলেও সামলে নিতে পারবেন, কিন্তু ক্যাচ ফিল্ডস-ম্যানের একটু বেশী সামনে পড়লেও, সামনের দিকে জোরে দৌড়ে সে ক্যাচ ধরার সম্ভাবনা থাকে বেশী। এ ক্ষেত্রেও এ্যানটিসিপেশন ভাল হলে অনেক অসম্ভব ক্যাচ ধরা বা বাউণ্ডারী বাঁচানো সম্ভব হয়।

অফ সাইডে পয়েণ্ট থেকে থার্ড ম্যান ফিল্ডসম্যানের মনে রাখতে হবে যে, কাট বা ড্রাইভ-এ (বিশেষ করে বল স্লো হলে) একটা স্পিন থাকে, বলটা মাটিতে পড়ে কার্ল বা ডান দিকে ঘুরে যায় (ফিল্ডসম্যানের বাঁ দিকে) এবং বল ফিল্ড করার সময় সেটা খেয়াল রেখে একটু বাঁ দিক চেপে এগোনই সঙ্গত। দূরে লেগের ফিল্ডসম্যানদের পক্ষে বল কার্ল করে বাঁ দিকে, অর্থাৎ ফিল্ডসম্যানের ডান দিকে; বহু লফটেড হুক শট্ (শূন্যে হুক) লং লেগ বা ডীপ ফাইন লেগ ফিল্ডসম্যানের কাছে মনে হয় একটা বিরাট লম্বা আউট সুইং, ফিল্ডসম্যান তৈরী না থাকলে দেখবেন শেষ মুহূর্তে তাঁর প্রসারিত ডান হাতের নাগাল ছাড়িয়ে বল বাউণ্ডারী বা ওভার বাউণ্ডারী হল। আর ক্যাচ না হয়ে যদি ফিল্ডস-ম্যানের সামনে পড়ে, সে বল লেগ ব্রেক করবে, ফিল্ডসম্যান সতর্ক না থাকলে তাঁর ডান হাতের নাগালের বাইরে দিয়ে বাউণ্ডারী হবে। কথাটা অল্প বিস্তর উইকেটের সামনে হাফ ভলীতে ড্রাইভ (বিশেষ করে মিডিয়াম বা স্লো বোলিং-এ) সম্বন্ধেও বেশ খাটে।

কভার পয়েণ্টে ফিল্ডিং স্পেশ্যালিস্ট-এর পর্যায় পড়ে, তাঁর রিফ্লেকস ও এ্যানটিসিপেশন উচ্চাঙ্গের হতে হবে, দৌড়ের মাথায় বল পিক আপ বা নির্ভুল ভাবে তুলি নিয়ে (বহু সময়ে এক হাতে) কালক্ষেপ না করে একই মোশন-এ বা গতিতে যেদিকে রান আউটের সম্ভাবনা বেশী, সেই দিকে ফুল পিচ-এ স্টাম্পের উপর বল থ্রো করতে হবে। উচ্চাঙ্গের কভার-পয়েণ্টের মধ্যে আমার দেখা আই পি এফ ক্যাম্পবেল, স্যার জ্যাক হব্‌স, ওয়াশব্রুক, নীল হার্ভে (যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ৬-৭ বছর), ভারতের ডি কে গাইকওয়াড ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত, কভার পয়েণ্ট, মিড অফ, মিড অন ইত্যাদি অর্থাৎ না দূরে না কাছে এমন ফিল্ডসম্যানদের কোথায় দাঁড়াতে হবে, অর্থাৎ কত দূরে বা কাছে, সেটা নির্ভর করবে উইকেটের পেস, আউট ফিল্ডের অবস্থা এবং ব্যাটসম্যানের খেলার ধরণের উপর। এ সব বিচার করে যাতে সহজে এক রান না নিতে পারা যায়, কিন্তু বাউণ্ডারীর মারও ধরার আশা থাকে এমন ভাবেই ফিল্ড সাজানো বিধেয়। কিন্তু স্লিপ ফিল্ডসম্যান বরং কাছে থাকা ভাল, দূরে নয় ; বেশী কাছে থাকার দরুন দু'একটা ক্যাচ পড়তে পারে, কিন্তু বেশী দূরে থাকলে ক্যাচ হাতেই আসবে না !

সব ক্ষেত্রেই ফিল্ডসম্যানের উইকেটকীপার বা বোলারকে বল রিটার্ণ করা বা ফেরৎ দেওয়া উচিত ফুল পিচ এ ; থার্ডম্যান বাউণ্ডারী থেকে। অ্যাণ্ডি স্যাণ্ডহাম (ইংলণ্ড), লিণ্ডসে হ্যাসেট যে ভাবে বল নিচু রেখে, বেশ জোরে সোজা উইকেটকীপারের হাতে বল রিটার্ণ করতেন সেইটাই আদর্শ হওয়া উচিত, যেটা আজকাল অনেক আন্তর্জাতিক দলেই দেখা যায়। উঁচু করেও বল উইকেটকীপারের হাতে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে সময় বেশী লাগে, যেখানে রান আউটের সম্ভাবনা সেখানে এমন উঁচু থ্রো কোনও কাজে লাগে না।

থ্রো ওভার আর্ম, রাউণ্ড আর্ম, বা আণ্ডার আর্ম হতে পারে। ওভার আর্ম এ সময় বেশী লাগে, বল ধরেই একই মোশন-এ থ্রো করা সম্ভব হলেও আণ্ডার আর্ম-এ থ্রো সচরাচর তেমন জোর হয় না। সেই কারণে, রাউণ্ড আর্ম থ্রো প্র্যাকটিশ করাই উচিত। বল পিক আপ করেই হাত বেশী না তুলে কব্জি ও কনুইয়ের শক্তিতে (অবশ্য বডিওয়েট্ পিছনে রেখে) থ্রো করলে, থ্রো জোরও হয়, ডিরেকশনও ঠিক থাকে।

বাউণ্ডারী খুব বেশী বড় হলে, এক পিচ-এ বল রিটার্ণ করাই সঙ্গত, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লং হপ থ্রো-ই বিধেয়। বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে বল উইকেট

কীপারের বা বোলারের পায়ের গোড়ায় বা অন্যরকম বেমক্কা ভাবে পড়ে তাঁদের বিপর্যস্ত না করে, তা ছাড়া রান আউটের সম্ভাবনা নষ্ট না হয়।

প্রসঙ্গত, ওভার আর্ম থ্রো-র সমর্থন বিশেষ করি না, তাতে শুধু সময় নষ্ট হয় বলে নয়, মাথার উপর হাত উঁচু করে বল ছুঁড়তে গেলে অনেক সময় খালি কব্জি নয়, শোলডার-এর জয়েণ্ট-ও এসে যায়, তার ফলে সেই শোলডার-এর জয়েণ্ট খচকে যায়—যেমন ভারতের মুস্তাক আলীর হয়েছিল। পরের দিকে দূর থেকে থ্রো করতে গেলে আণ্ডার আর্ম থ্রো মুস্তাককে করতে হত যা কোনও কাজে লাগত না। দূরের ফিল্ডসম্যানদের অনেক সময় খানিকটা দৌড়ে বল ধরতে হয়, ব্যাটসম্যানদের যখন ২।৩ রান সুনিশ্চিত এমন ক্ষেত্রে যেদিকে রান-আউটের সম্ভাবনা বেশী সেই দিকেই থ্রো করতে হবে। এমন ফিল্ডসম্যানও দেখেছি ব্যাটসম্যানদের একটা রান বাঁধা জেনে, খুব ধীরে ধীরে বল ফিল্ড

বাউণ্ডারী থেকে বল থ্রো করা

সব চেয়ে দ্রুত এবং শ্রেষ্ঠ প্রণালী—ডাইরেক্ট থ্রো

হাই ট্রাজেক্টরী—এ ভাবে কদাচিৎ রানআউট করা যায়

এ ভাবে থ্রো করলে বাহুর উপর কম ধকল পড়ে কিন্তু থ্রো খুব দ্রুত ও নির্ভুল হয়

করতে এগোলেন, ভান করলেন বলটা যেন ফস্কে গেছে, ব্যাটসম্যানদ্বয় দ্বিতীয় রান নিতে গেলেন, তড়িৎ বেগে তখন সেই ফিল্ডসম্যানই বল ফিল্ড করে রান আউট করলেন!

ফিল্ডিং সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। সময় থাকলে সব বলই দু'হাতে ফিল্ড করা বিধেয়। বল ধরবার সময় হাতের তালু নরম এবং আঙ্গুলের টিপ বা আগাগুলি আলতোভাবে মাটির দিকে (বলের দিকে কদাচ নয়) রাখতে হবে। বলের দিকে আঙ্গুল এবং হাতের তালু ও আঙ্গুল শক্ত করে রাখলেই চোট জখমের বিশেষ ভয়। বলের জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে এসে দু'টি পা পিছনে রেখে, ডান বা পিছনের বুটের সামনে থেকে বল পিক আপ

করে, যে দিকে বল ছোঁড়া হবে সেই দিকে সামনের বা বাঁ-পা এগিয়ে তার উপর ভর দিয়ে কব্জি ও কনুইয়ের জোর দিয়ে, রাউণ্ড আর্ম থ্রো করলে (টেনিসে ফোর হ্যাণ্ড ড্রাইভ-এর মতো), থ্রো জোর হবে, ডিরেকশনও ঠিক থাকবে। দূর থেকে সব সময় জোরে থ্রো করাতে আপত্তি নেই (রানআউটের সম্ভাবনা থাক বা নাই থাক) ; কিন্তু রানআউটের কোনও আশামাত্র নেই, কভার বা মিড অফ ইত্যাদি কাছের পোজিশন থেকে সজোরে উইকেটকীপারের হাতে বল ছোঁড়া শুধু অবান্তর নয় উইকেটকীপারের অকারণ আঘাত পাবার যথেষ্ট আশঙ্কা—এ কথা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখা উচিত।

উঁচু ক্যাচ ধরার সময় দু'টি জিনিষ মনে রাখতে হবে। প্রথমত, হাত দু'টি জোড়া করে কাপ-এর (চায়ের কাপের ভিতর যেমন হয়) মতো করতে হবে, হাত এবং আঙ্গুল নরম ও অনড় করে রাখলে (শক্ত বল হাতের ভিতর পড়েও লাফিয়ে উঠবে) বলটা তালু দু'টির মধ্যে নিয়ে, বলের উপর আঙ্গুল মুড়ে নিয়ে খুব সামান্য নিচুর দিকে টেনে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বলটা চোখের লেভেল-এর সামান্য উপরে ধরতে হবে। বলা বাহুল্য মাথা (ব্যাটিং করার মতো) যথাসম্ভব স্থির রাখতে হবে, বলের গতি নিখুঁতভাবে দেখার জন্য। অবশ্য সব ক্ষেত্রে এত সময় পাওয়া যাবে না, যেমন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে ক্যাচ করার সময় ; তবু যথাসম্ভব এই নীতি অনুসরণ করা বিধেয়।

অন্যান্য বহু রকম ক্যাচ ওঠে যেমন স্লিপ বা শর্ট লেগে বল যখন বিনা নোটিশে ডাইনে বাঁয়ে মাথার উপর বা বুটের টো ঘেঁসে। এমন ক্ষেত্রে দু'হাত কেন এক হাত ক্যাচের দিকে এগোবার সময় থাকে না, মাথার উপর হাত বা তলা থেকে ক্যাচ ধরতে হয়। তখনও, ক্রমাগত অভ্যাসের ফলে দু'টি জিনিষে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য। মাথা যথাসম্ভব স্থির, হাত নরম রাখতে হবে, এবং আঙ্গুলের টিপ বলের দিকে থাকবে না।

অনবরত প্র্যাকটিশ করলে এ সবই সহজ হয়ে যাবে। নেট প্র্যাকটিশের সময় অফ সাইড খোলা রেখে ফিল্ডিং রপ্ত করা যায়। প্র্যাকটিশের শেষে মাঠের মধ্যখানে একটা স্টাম্প পুঁতে দু'দিকে চার পাঁচ জন করে ফিল্ডসম্যান মাটিতে বল ছুঁড়ে, তার পর অন্য দিক থেকে সেই বল ফিল্ড করে স্টাম্পের উপর থ্রো করে, সকলেরই বেশ ভাল ফিল্ডিং প্র্যাকটিশ, এবং তার ফলে উন্নতি হবে। উঁচু ক্যাচের জন্য একজন ব্যাটে মেরে এক সঙ্গে অনেককে ক্যাচ প্র্যাকটিশ করাতে পারেন, স্লিপ ক্যাচ প্র্যাকটিশ করার জন্য একরকম বোর্ড আছে

তাতেও প্র্যাকটিশ ভাল হয়। আসল কথা, সত্যই চেষ্টা করলে ফিল্ডিং ভাল
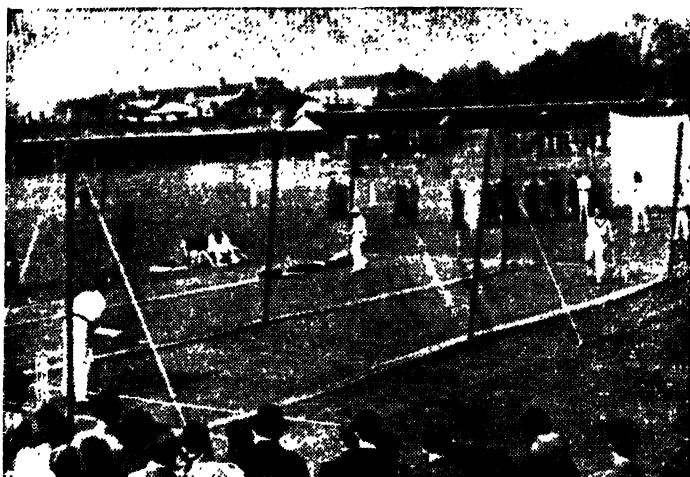
ওভাল মাঠে নেট প্র্যাকটিশ।

হতে বাধ্য—এবং ফিল্ডিং ভাল না হলে উচ্চাঙ্গের ক্রিকেট দলে কারও স্থান হয় না।

উইকেট কীপিং

ফিল্ডিং-এর অংশ হলেও উইকেট কীপিং সম্বন্ধে বিশেষ এবং স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। উইকেটকীপারের কাজ বিশেষ দায়িত্বশীল, তাঁর কনসেনট্রেট্ করার প্রয়োজন সব সময়, মুহূর্তের জন্য তাঁর বিশ্রাম নেই। হাতে পুরু গ্লাভস, পায়ে প্যাড, এবং প্রোটেক্টর থাকে সত্য, কিন্তু তবু উইকেট কীপার হতে হলে সাহস অত্যাবশ্যক; ফাস্ট বা স্পিনিং বল খারাপ উইকেটে বেমক্কা লাফিয়ে আঙ্গুল জখম তো বটেই, শারীরিক আঘাত পাবার বিশেষ আশঙ্কা। বিপদের সম্ভাবনা জেনেও, প্রতি মুহূর্তে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে কখন হঠাৎ স্টাম্প বা ক্যাচ বা রানআউটের সুযোগ আসে এবং সে গুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। না হলেই উইকেটকীপারের ঘাড়ে পড়বে সব দোষ। উভয়ত ঝামেলা, সুতরাং উইকেটকীপারকে একটু বেপরোয়া ও ডানপিটে গোছের হতে হবে।

উইকেটকীপিং-এর জন্য মুখ্য প্রয়োজন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব। হাঁটু-ভেঙ্গে নিচু হয়ে বসে দু'পায়ে সমান ভর দিয়ে (অনেকে টো এর উপর বেশী ভর

দেন), যার ফলে এক লহমায় ডাইনে বাঁয়ে, প্রয়োজন মতো সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়, অফ স্টাম্প নাগাৎ বাঁ-পা রেখে, বোলারের দিকে ছু'টি হাতের তালু কাছা কাছি রেখে (অবশ্য গ্লাভসের মধ্যে) আঙ্গুলগুলি মাটির দিকে করে, উইকেটকীপারের স্টান্স।

এভাবে স্টান্স নিতে হলে শরীরের ব্যালান্স-এর যথেষ্ট প্রয়োজন। অফ সাইডে দাঁড়ালে বল ভাল করে দেখা যায়—শুধু অফ-এর বল নয়, লেগের বলেরও ফ্লাইট্ দেখা যাবে, সেই মতো লেগে সরে যাওয়ার সুবিধা হবে, যদিও লেগে বল ধরার সময় বহুক্ষেত্রেই উইকেটকীপার অন্ধ—কারণ সেখানে রয়েছে ব্লাইণ্ড স্পট।

উইকেটের ঠিক পিছনে উইকেটকীপারের স্টান্স-এর কথা বলছি, যদিও পিছনে বেশ দূরে দাঁড়ালেও স্টান্স একই। তবে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে সুবিধা হবে, উইকেটের অফ সাইডে সামান্য উনিশ বিশ সেটা উইকেটকীপারের উপর নির্ভর করবে। অনেক সময় বোলার আউট সুইং বা লেগব্রেক বেশী করাচ্ছেন ; অথবা ইনসুইং বা অফব্রেকের আধিক্য—এমন ক্ষেত্রে উইকেট কীপার প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে একটু বাঁ পাশ চেপে দাঁড়ানোই বিধেয়। এ ব্যাপারে বাঁধা ধরা কোনও নিয়ম ঠিক নেই। মাত্র ছু'টি বিষয়ে গতিবিধি হয় সেটাই আসল উদ্দেশ্য। উচ্চাঙ্গের উইকেটকীপারের তিনটি গুন থাকতেই হবে ; ফুটওয়ার্ক, এ্যানটিসিপেশন এবং বল স্ন্যাচ বা খামচানোর বদঅভ্যাস না থাকা।

ভারতের (স্বর্গত) হিন্ডলেকার, গডফ্রে এভান্স, ডন ট্যালন (অস্ট্রেলিয়া) প্রমুখ উচ্চাঙ্গের উইকেটকীপার লেগ-সাইডে (অর্থাৎ ব্লাইণ্ড স্পট-এ) বল ধরেছেন, মনে হয় কী সোজা। নিম্ন স্তরের উইকেটকীপার হয়তো সেই বল আটকালেন, কিন্তু হুমড়ি খেয়ে কোনও মতে, বল বুকে, প্যাডে ইত্যাদিতে লাগল। প্রথমোক্ত উইকেটকীপারের এ্যানটিসেপশন ভাল অর্থাৎ এক নজরে বলের প্রথম ফ্লাইট দেখে নিয়ে বুঝে নিয়েছেন ব্যাটসম্যান ব্যাটেবলে করতে না পারলে (বা করলেও), বলটা ঠিক কোথায় এবং কত উঁচুতে আসতে পারে এবং সঠিক ও ক্ষিপ্র ফুটওয়ার্ক-এর সহায্যে অনায়াসে বা অল্পায়াসে যথাস্থানে ইতি মধ্যেই, সুতরাং তাঁদের লেগ সাইডে বল বা ক্যাচ ধরা অত সহজ মনে হয়। শেষোক্ত উইকেটকীপারের দলের এসব কোনও গুণই নেই সুতরাং তাঁরা হাবডুবু খান।

বল বিচারে, ফুটওয়ার্ক ইত্যাদিতে ভাল উইকেটকীপারের ভাল ব্যাটসম্যানের সব গুণই থাকা চাই; অবশ্য উইকেটকীপারের ফুটওয়ার্ক স্বতন্ত্র—আড়াআড়ি ভাবে। মনে রাখতে হবে আড়াআড়ি কথাটা, আড়াআড়ি কিন্তু পিছনে হটে গিয়ে নয়, বল লেগ সাইড হলেও। প্রায়ই দেখা যায়—কী অফ সাইডে কী বা লেগ সাইডে—তরুণ উইকেট কীপাররা ডান বা বাঁ দিকে নড়া চড়ার সময় সামান্য পিছনেও যাচ্ছেন; এমন ক্ষেত্রে স্টাম্প করার সম্ভাবনা থাকবে না কারণ উইকেট হবে উইকেটকীপারের নাগালের বাইরে, ব্যাট থেকে ক্যাচ হলেও ডিফ্লেকশন বেশী হবার সম্ভাবনার দরুণ, ক্যাচ ঠিক হাতের মধ্যে আসতে না পারে।

ভাল উইকেটকীপারের বল ধরা দেখে মনে হবে ব্যাপারটা কত সহজ; দু'টি গ্লাভসের কাপ-এর ভিতর বল ঠিক জমছে। এর জন্য প্রয়োজন নিখুঁত টাইমিং। জোর বোলার হলে বলটা একটু টেনে নিতে হবে, সচরাচর সব বলই; কিন্তু চকিতে স্টাম্পিং-এর সম্ভাবনা, বিশেষ মিডিয়াম বা স্লো বলে, সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বল না টেনে—অথচ না স্ন্যাচ করে বা খামচে—স্টাম্প করা উচিত।

বল ধরে অফ ও লেগ থেকে একই মোশন-এ স্টাম্পের উপর বল নিয়ে যাওয়া সহজ হবে প্র্যাকটিশের ফলে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে ক্ষতিকর হয়, সুতরাং আধিক্যের দোষে দুষ্ট না হয় সেট। দেখতে হবে। ব্যাটসম্যান ব্যাক খেলছেনে বা কাট্ মারতে যাচ্ছেন (স্টাম্পিং-এর যেখানে কোনও প্রশ্ন নেই), উইকেটকীপারের হাত দু'টি, বল হাতে বা বল হাতে না থাকলেও, নাগাড়ে স্টাম্পের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে; এ ক্ষেত্রে ব্যাটে বল লাগলে সচরাচর বল আরও অফ-এর দিকে যাবে, এবং উইকেটকীপার এই বদভ্যাসের ফলে ক্যাচ ফস্কাতে বাধ্য। সুতরাং ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলার সময়ই বল এক মোশন্-এ স্টাম্পের উপর নিয়ে যেতে হবে যেটা অত্যাবশ্যক, কারণ তখনই স্টাম্প আউট করার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

বল ফাস্ট এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বাম্পার বল করা হলে, উইকেটকীপারের স্টাম্পের বেশ পিছনে দাঁড়ানো; ঠিক কতটা দূর যেটা মুখ্যত উইকেটের উপর নির্ভর করবে, সচরাচর এমন পোজিশন-এ দাঁড়ানো সঙ্গত যেখানে বল (বাম্পার না হ'লে) সাধারণত হাঁটু বা তার কিছু উপরে উইকেটকীপার ধরতে পারেন। পিছনে দাঁড়ালে লেগ সাইডে অনেক সময়ে ডাইভ বা

শুয়ে পড়ে বাঁদিকে এক লাফে (ফুটবলের গোলকীপারের মতো) যেতে হয়, শুধু বল থামাবার জন্য নয়, ক্যাচ (লেগ-গ্লান্স) ইত্যাদি ধরার জন্য। এভান্স, ট্যালন্, সোয়েটম্যান (ইংলণ্ড), লিভিংস্টোন (অস্ট্রেলিয়া, পরে ইংলণ্ড), ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), ক্যামেরন (সাউথ আফ্রিকা) এবং ভারতের পি (খোকন) সেনকে অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুত লেগ-সাইডে উঁচু বা নিচু ক্যাচ ধরতে দেখেছি। কিন্তু লেগসাইড ক্যাচে ট্যালন্ (৬ ফুটের উপর লম্বা) এবং এভানসের জুড়ী দেখিনি। মনে রাখতে হবে লেগ সাইডে ডাইভ প্রশংসনীয়, অফ সাইডে নয়; কারণ অফ সাইডে স্লিপ থাকে। অনর্থক ডাইভ করার ফলে স্লিপ-এর সোজা ক্যাচ নষ্ট হয়েছে এমন বহু দেখেছি।

অনেকে স্টাম্পের উপর দাঁড়িয়ে বেশ ভাল উইকেট কীপিং করেন, কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমন সুবিধা করতে পারেন না। দূরে দাঁড়িয়েও বল হরদম ফস্কে যাচ্ছেন, এমন দেখা যায় প্রায়ই। এটা সেই টাইমিং এর প্রশ্ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রথম প্রথম স্যুটে ব্যানার্জির বলে স্টাম্পের উপর দাঁড়িয়েই উইকেট কীপ করতাম, বহু ব্যাটসম্যানকে স্টাম্পও করেছি। কিন্তু বাম্পারের অত্যধিক বল হবার পর, এবং নিসার, নাজীর আলি, স্যুঁটে ব্যানার্জি ও দেবরাজ পুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম। সুরুতে বল ভাল ভাবে গ্যাদার করতে অসুবিধা হত, ক্রমশ অভ্যাসের ফলে টাইমিং সঠিক হয়। প্রসঙ্গত, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বলে বিশেষ সতর্ক হতে হবে; উইকেটের কাছে (যাকে চলতি ভাষায় বলা হয় স্টাম্পের উপর) দাঁড়ালে যেন ডান দিক বা বাঁদিকের বল ধরে সহজেই বলটি টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া যায় এক লহমায়। কিন্তু এত কাছে নয় যাতে শুধু হাত নয়, উইকেটকীপারের শরীরের কোনও অংশ, বুটের টো, মাথা এমনকি ক্যাপের বীক্ বোলিং ক্রীজের ভিতরে না থাকে; বল বোলিং ক্রীজ পাস বা অতিক্রম করে। কিন্তু ব্যাটসম্যান যদি বলটি খেলেন বা বল তাঁর শরীরের কোনও অংশে লাগে, অথবা ব্যাটসম্যান বল না খেলেই রান নেবার চেষ্টা করেন, সে ক্ষেত্রে উইকেটকীপারের বোলিং ক্রীজের সামনে বল ধরার কোনও বাধা থাকবে না।

কথাটা আর একটু পরিস্কার করে বলার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাটসম্যান ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়ে বল ফস্কালেন (ব্যাটসম্যানের পক্ষে রান নেবার কোনও চেষ্টা নেই) স্টাম্প আউট করার সুযোগ দেখে উইকেটকীপার অত্যধিক তাড়াহুড়ো করে বল বোলিং ক্রীজের সামনেই ধরে স্টাম্প করলেন, ব্যাটসম্যান

তখনও পপিং ক্রীজের বাইরে, তবু আম্পায়ার ব্যাটসম্যানকে আউট দেবেন না, আইনানুযায়ী দিতে পারেন না। সাধারণত, স্লো বোলারের বলেই এমন অঘটন ঘটে, ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের বাইরে হাবুডুবু খাচ্ছেন, বল স্লো উইকেটও স্লো, বল যেন আসতেই চায় না, উইকেটকীপারের ধৈর্যের বাঁধ হারিয়ে গেল, বোলিং ক্রীজের আগেই বল ধরলেন—আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নট আউট।
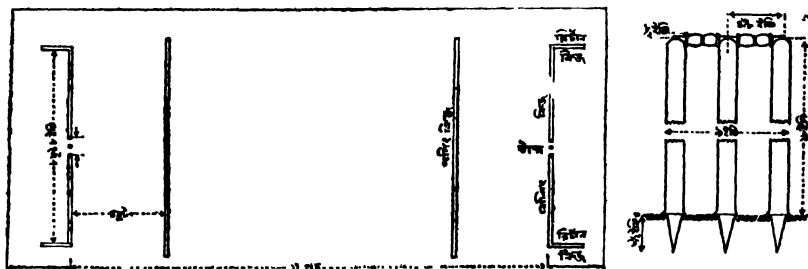
পিচ, উইকেট,বোলি, পপিং ও রিটার্ণ ক্রীজের ডায়গ্রাম

তেমনই ব্যাটসম্যানদের মনে রাখতে হবে যে ফরোয়ার্ড খেলার সময় পিছনের পা পপিং ক্রীজের লাইনের উপরে থাকলে আউট, পা লাইনের পিছনে রাখতে হবে। কারণ পপিং ক্রীজের লাইন প্রায় দেড় ইঞ্চি হয়, স্টাম্প থেকে পপিং ক্রীজের দূরত্ব ৪ ফুট, সেটা ধরা হয় স্টাম্পের ঠিক মধ্য এবং বোলিং ক্রীজের (এই লাইনও প্রায় দেড় ইঞ্চি চওড়া) বাইরের দিকের (অর্থাৎ বোলারের দিকের) লাইন থেকে পপিং ক্রীজের লাইনের ভিতরের দিক (অর্থাৎ ব্যাটসম্যানের দিক) পর্যন্ত। তাই ব্যাটসম্যানের পিছনের পা অন্ দি লাইন হলে হন আউট এবং বোলারের পিছনের পা বোলিং ক্রীজ কাট করলে হয় নো বল।

উইকেটকীপারের স্টান্স সম্বন্ধে বলেছি, কিন্তু ঠিক উপু হয়ে বসেন না এমন উচ্চাঙ্গের উইকেটকীপারও কম দেখিনি। আবার বলব এখানেও গোঁড়ামির স্থান নেই, যে পোজিশন থেকে উইকেটকীপারের স্বচ্ছন্দ লেফটহ্যাণ্ড বা ন্যাটা ব্যাটসম্যান হলে উইকেটকীপারের সুরুতে বেশ অসুবিধা হয় পরে অভ্যাসের ফলে ঠিক হয়ে যায়। সচরাচর ডান দিক থেকে বাঁয়ে বল নিয়ে যাওয়া সহজ ডান হাতের উইকেট কীপারের পক্ষে। সুতরাং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে স্টাম্পের উপর বল এক মোশন-এ নিয়ে যাওয়া অভ্যাস করতে হবে—অর্থাৎ দু'দিক থেকেই সমান সহজ ভাবে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের কয়েকটি জিনিষ বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে। হয় স্টাম্পের একদম উপর নয় বেশ দূরে (উপরোক্ত নির্দেশ মতো)—এর কোনও মধ্য পথ নেই; ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে মাঝামাঝি দাঁড়ালে (ভয়ই তার আসল কারণ), বল রাইজ-এর বা উঠতির মাথায় ধরতে হবে, হয়তো বুকের কাছে, যার ফলে ক্যাচ ধরার অসুবিধা, স্টাম্প করার প্রশ্নই ওঠে না। হাতের আঙ্গুল পারতপক্ষে মাটির দিকে রাখতে হবে যাতে আঙ্গুলের আগায় চোট জখমের সম্ভাবনা হয় কম। তাড়াহুড়োতে অনেক ভাবেই বল ধরতে হয়, সে কথা স্বতন্ত্র। আর কোনও ক্ষেত্রেই বল স্ন্যাচ করা বা খামচানো চলবে না।

আর একটা কথা। উইকেটকীপার দূরে দাঁড়ালে, ব্যাটসম্যান বল খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্টাম্পের কাছে যেতে হবে; শর্ট রান নিলে রান আউটের সম্ভাবনা পলকে ঘটে, তাছাড়া রান না হলেও ফিল্ডম্যানরা স্টাম্পের উপরই বল রিটার্ণ করবেন। ব্যাটসম্যানের মার দূরে হলে, ফিল্ডসম্যানদের উচিত, হয় ফুল পিচ-এ নয় লং হপ থ্রো করা স্টাম্পের উপর, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে থ্রো হয় বেমক্কা মাথার উপর দিয়ে পায়ের গোড়ায় ইত্যাদি, সেজন্য বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে সদাই। বেমক্কা থ্রো হলে রাগারাগি না করে মানিয়ে নিয়ে বল ধরাতেই ভাল উইকেটকীপারের বিশেষ কৃতিত্ব প্রমাণ হয়। উইকেটকীপারের মূখ্য কাজ ব্যাটসম্যানকে আউট করা, বল কোনও রকমে আটকে বাই রান বাঁচানো নয়, এ সত্য সর্বদা মনে রাখতে হবে। তাই বলেছি, উইকেটকীপার সব সময়ই ব্যস্ত—তিনি শুধু ডানপিটেই হবেন না, তাঁকে হতে হবে সদাই প্রফুল্ল, একটা চান্স ফসকে গিয়ে মন মরা হলে বিপদের অন্ত থাকবে না।

যথারীতি গ্লাভস, প্যাড, প্রোটেক্টর পরে নিতে হবে দলে বেশ ফাস্ট বোলার থাকলে আঙ্গুলের জয়েণ্টগুলি এ্যাঢেসিভ প্লাস্টার দিয়ে মুড়ে নিলে আঙ্গুলে বেমক্কা বল লাগলেও চোট গুরুতর হবে না। নিসারের বলে উইকেট কীপ করার সময় অনেক সময় ইনার গ্লাভসের ভিতর মাখা ময়দা পাতলা করে রাখতাম যার ফলে হাতের উপর বিশেষ ধকল পড়ত না। আজকাল উইকেট কীপিং গ্লাভস অনেক উন্নত, বোধ হয় তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নতুন আনকোরা গ্লাভস ব্যবহার করা সমীচিন নয়। দোরস্ত না করে নিয়ে। গ্লাভসের পাম বা তালু বেশী শক্ত বা মসৃণ হলে বল জমবে না। ইউক্যালিপটাস অয়েলের ব্যবহার বিধেয় কিন্তু কোনও কারনেই যেন অত্যধিক না হয়। তাতে হবে হিতে বিপরীত। বলে—বিশেষ করে নতুন বলের সীম-এ কালো-

কালো রাবার জাতীয় জিনিষ লেগে গেলে বোলারেরা কোনও ক্রমেই এমন উইকেটকীপারকে ক্ষমা করবেন না। তাই আগেই বলেছি উইকেটকীপারের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল, তেমনই পান থেকে চূণ খসলে তাঁর রেহাই নেই।

শেষের কথা এই যে উইকেটকীপার বোলাররা কী ধরণের বল করছেন সেটা অন্য সকলের থেকে ভাল দেখতে পান, সুতরাং দলের ক্যাপটেন তাঁর থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়ে থাকেন সেটা যথেষ্ট কাজে লাগা উচিত এবং লাগেও।

ক্যাপটেন্‌সি

ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এবং উইকেট কীপিং সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা হয়েছে, তাই ক্যাপটেন বা অধিনায়ক যিনি দলের কর্ণধার তাঁর ভূমিকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলার প্রয়োজন। ক্যাপটেন নির্বাচনের সময় প্রথম দেখে নিতে হবে নিঃসন্দেহে তিনি দলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। কিন্তু দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ই ক্যাপটেন হবেন এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। প্রথমত, শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হলেই উচ্চাঙ্গের নেতা হবেন এমন কোনও কথা নেই; দ্বিতীয়ত ক্যাপটেনের মাথা বা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন, যার পিছনে সাধারণত থাকে অভিজ্ঞতা; তৃতীয়ত, ক্যাপটেনের অত্যাবশ্যক শুধু বিচার বুদ্ধি নয়, সাহসী

(কৃতী ক্রিকেটার)

পিটার মে
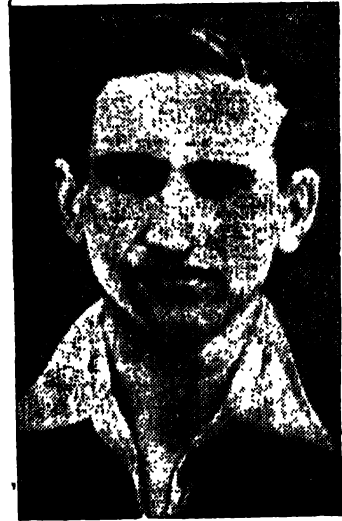
।তৌদির নবাব

মনোভাব, নিরপেক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা সামাজিকতার সহজ প্রবৃত্তি। হয়তো আমার মনের কোনে রয়েছে উচ্চাঙ্গ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কথা। কিন্তু সকল স্তরের ক্রিকেটেই কথাগুলি অল্পবিস্তার খাটে। দলের নেতার উপর তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা, ভাল খেলোয়াড় এবং সজ্জন হিসাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকলে দলের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, অনেক সময় ভাঙ্গন ধরে।

ক্যাপটেনের উপর দলের কৃতিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে। আমার ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতায় দু'জন শ্রেষ্ঠ ক্যাপটেন (স্বর্গত) ডগলাস জার্ডিন এবং স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। দু'জনেরই সঙ্গে ক্রিকেটের আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের অসামান্য ধী-শক্তি, বিশ্লেষণ এবং দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমার দেখা অন্যান্য উচ্চাঙ্গের ক্যাপটেনের মধ্যে মনে পড়ে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, রিচি বেনো, পাকিস্তানের হাফিজ কারদার, ভারতের সি কে নাইডু এবং লালা অমরনাথ।

সাধারণতঃ ব্যাটসম্যান ক্যাপটেন হওয়াই বিধেয়। তার উপর যদি তিনি উচ্চস্তরের ফিল্ডসম্যান হন তা হলে দলকে একাধিক ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। শুধু বোলার হলে, ক্যাপটেন হয় অত্যধিক বোলিং করেন, না হলে অত্যল্প অর্থাৎ, উভয়ত দলের পক্ষে বিপদ। উইকেটকীপার সাধারণত অতি ব্যস্ত থাকেন, উপরন্তু ক্যাপটেনসির বোঝা তাঁর কাঁধে না চাপানোই ভাল এ কথা অনেকেই মনে করেন। অবশ্য ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই আছে, তবু ক্যাপটেন ব্যাটসম্যান হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কী ভাবে ব্যাটিং অর্ডার, বোলিং চেঞ্জ বা ফিল্ড সাজানো উচিত সে সম্বন্ধে এই বইয়ের অনত্র খাপছাড়া ভাবে হলেও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, এখানে মোটামুটি দু'এক কথা বলব।

যে কোনও স্তরের ক্রিকেটে জয়লাভের মনোভাব নিয়ে ক্যাপটেন মাঠে নামবেন। সেটা করতে হলে মাঠের বাইরেই দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এবং নির্দেশ দিয়ে, একটা প্ল্যান করতে হবে। ব্যাটিং অর্ডার এমন ভাবে করতে হবে যাতে ওপনিং ব্যাটসম্যানের দু'জন না হলেও অন্তত একজন নতুন বলের বিরুদ্ধেও স্ট্রোক করতে পারেন যার ফলে বিরুদ্ধ দলের বোলাররা পেয়ে না বসেন। ক্রিকেটে মনস্তত্ত্বের প্রভাব যথেষ্ট সে কথা বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। ৩ নং ব্যাটসম্যান এমন হবেন যিনি নতুন বলও খেলতে পারবেন, কিন্তু মারার বল ছাড়বেন না ; ৪নং ব্যাটসম্যানও অনুরূপ হবেন। তারপর ৭ বা ৮ নং পর্যন্ত ব্যাটসম্যান এমন ভাবে পাঠাতে হবে যার ফলে একজনের ডিফেন্স ভাল হলেও অন্য জন মারের বল পেলে একেবারেই ছাড়বেন না। দলে বাঁহাতের ব্যাটসম্যান একাধিক থাকলে এবং মারনেওয়ালা হলে তো কথাই নেই কারণ একজন ডান হাত অন্যজন বাঁ হাতে ব্যাট করলে ফিল্ডিং অনেক সময়ে ছত্রভঙ্গ হয় এবং বিরুদ্ধ পক্ষের বোলারদের লেন্থ ও ডিরেকশন নিখুঁত রাখা শক্ত হয়। মোট কথা, যথাসম্ভব দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করতে

হবে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ডিফেনসিভ সাময়িক ভাবে খেললে দোষের হবে না। কিন্তু লক্ষ্য হবে রান তোলা এবং সেটা যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

তেমনই বোলিং পরিচালনা এবং ফিল্ডিং সাজানো আক্রমণাত্মক হতে হবে। অন্তত একজন যথার্থ ফাস্ট বোলার ব্যতিরেকে কোনও প্রথম শ্রেণীর দল সম্পূর্ণ হয় না ; ক্যাপটেনকে বোঝাতে হবে এবং প্র্যাকটিশ করাতে হবে যাতে নতুন বলের বোলারের ওভারের প্রত্যেকটি বল ব্যাটসম্যানকে খেলতে হয়। নতুন বলের সীম শক্ত থাকে যে কারণে প্রথমের দিকে বল অপেক্ষাকৃত বেশী লাফায় শাইন বা গ্লাস-এর জন্য বল সুইং করে। সুতরাং নতুন বলে ফাস্ট বোলারদের আক্রমণের মহাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে ৫-৬ ওভার বল করতে দিয়ে, কিছু বিশ্রাম দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনাই সঙ্গত ; অবশ্য ক্রমাগত উইকেট পেলে অন্য কথা কারণ ক্রিকেটে আর একটি কথাও সত্য যে বোলার যতক্ষণ উইকেট পাচ্ছেন ততক্ষণ তাঁদের ক্লান্তি আসে না। এটাও মনস্তত্ত্ব বা ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার।

আজকাল দেখা যায় ফাস্ট বোলারদের এক ঘণ্টা এমন কী দেড় ঘণ্টাও এক সঙ্গে বল করানো হয়। যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হল বা গিলক্রীস্ট, যেটা অসামান্য শক্তি বা স্ট্যামিনার পরিচায়ক হলেও নিয়মের নিছক ব্যতিক্রম, আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হবে মস্ত ভুল।

বোলিং চেঞ্জের গতানুগতিক একটা নিয়ম আছে—সুরুতে ফাস্ট বা মিডিয়াম, তার পরে স্লো স্পিন। শুনলে মনে হবে রহস্য করছি কিন্তু তা নয়। ক্লাব ক্রিকেটে শুধু নয়, আন্তর্জাতিক বেসরকারী ক্রিকেটেও দেখেছি, ক্যাপটেন বোলিং চেঞ্জ করছেন যেন একটা আগে থেকে তৈরী করা ছক মতো। বিশেষ করে একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছি. বোলার হিসাবে দলে নির্বাচিত হয়েছেন কোনও খেলোয়াড়, অতএব উইকেট তাঁর উপযুক্ত না হলে (যেমন অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির পর), ক্যাপটেন তবু সে বোলারকে বল করার আমন্ত্রণ জানালেন। অথচ ক্রিকেটের ইতিহাসে বহু নজীর আছে, কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সুদক্ষ ক্যাপটেনের অধিনায়কত্বে ভেরিটী, মানকাদ, হিউ টেফিল্ড ইত্যাদির মতো দুর্দান্ত বোলারকে এক আধ ওভারও বল করতে দেওয়া হয়নি। অথচ নেতৃত্বের গুণে সে দল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

তাই, ক্যাপটেনের দু'টি বিশেষ গুণ থাকা উচিত। প্রথমত, সঠিক ভাবে না হলেও মোটামুটি উইকেট কেমন সেটা বুঝতে হবে ; দ্বিতীয়ত, বিপক্ষ দলের

ব্যাটসম্যানের খুঁত কোথায় সেটা এক নজরে না হলেও যথাসম্ভব শীঘ্র নির্ধারণ করতে হবে। উইকেটের সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বিচার করা খুবই শক্ত, কিন্তু অল্পবয়সে উইকেট তৈরী করার হাতে কলমে শিক্ষা থাকলে, এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন উইকেটের অভিজ্ঞতা থাকলে, পূর্বাহ্নেই উইকেট প্রায় সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায় বলেই আমার বিশ্বাস কিন্তু এ বিচার যে বিশেষ কঠিন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ব্যাটসম্যানের স্টান্স, গ্রিপ ইত্যাদি দেখে কী ধরণের ব্যাটসম্যান সেটা আঁচ করা যায়, আগে একাধিকবার দেখা থাকলে তো কথাই নেই। কোন্ স্ট্রোক ভাল মারেন, কোন্ স্ট্রোক-এ দুর্বল ফাস্ট বোলিং-এ না স্পিন বোলিং-এ— কোন্ বোলিং-এ ব্যাটসম্যান রপ্ত, সেটা নজর করে বোলিং চেঞ্জ এবং ফিল্ড সাজাতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উচ্চাঙ্গের ব্যাটসম্যানের কথা ধরুন, যেমন অস্ট্রেলিয়ার নরম্যান ও'নীল, ইংলণ্ডের ব্যারিংটন, পাকিস্তানের বাকি ও মুস্তাক মহম্মদ; ফাস্ট ও মিডিয়াম বোলিং-এর বিরুদ্ধে তাঁরা দক্ষ, কিন্তু সুরুতে ভাল স্পিন বোলিং-এর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত; এমন ক্ষেত্রে সুরুতেই (বলে অত্যাধিক শাইন না থাকলে) স্পিন বোলিং এবং কাছাকাছি ফিল্ডসম্যান সাজিয়ে আক্রমণ করতে হবে। একবার হাত জমে গেলে—এবং ছক বাঁধা বোলিং চেঞ্জ করে সেট হবার সুযোগ যদি ক্যাপটেন তাঁদের দেন—তখন জগতের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলাররাও বিশেষ কাজে লাগবেন না।

যে ব্যাটসম্যান বাম্পার পেলে উঁচু করে হুক করবেনই জানা কথা, যেমন ইংলণ্ডের ওয়াশব্রুক, বা পাকিস্তানের মুস্তাক আমেদ, সে ক্ষেত্রে সুরুতেই ব্যাটসম্যানকে বাম্পার দিয়ে ফীড করে, অর্থাৎ গিলিয়ে দিয়ে, আউট করার চেষ্টা করা উচিত। এর উদাহরণ ব্যাটিং-এর হুক-এর পরিচ্ছেদে দিয়েছি, যেখানে লং লেগ বাউণ্ডারীতে লিণ্ডওয়ালের বাম্পারে হ্যাসেট্, ওয়াশব্রুকের পর পর দু'টি ক্যাচ ফেলেন! সি কে নাইডু লেগ ব্রেকের বিরুদ্ধে পিচ-এর মাথায় মিড উইকেটে ওভার বাউণ্ডারী মারতে ওস্তাদ ছিলেন, সে কথা জাডিনের অজানা ছিল না; কিন্তু জাডিন বোলারদের সেই বলই নাইডুকে ফীড করার নির্দেশ দিয়েও মিড উইকেট বাউণ্ডারীতে কখনও ফিল্ডসম্যান রাখতেন না। মিড উইকেটে (ব্যাটসম্যানের থেকে ৩৫--৪০ গজ দূরে), মিস হিট-এর জন্য এবং প্রায়ই নাইডু ঐ কাছের মিড উইকেটেই শেষ পর্যন্ত ক্যাচ দিতেন। পরে জাডিনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার ব্যক্তিগত ধারণার সমর্থনের

জন্য ; জার্ডিন বলেছিলেন, বাউণ্ডারীতে ফিল্ডসম্যান রাখলে নাইডু ঐ স্ট্রোক চেষ্টাই করতেন না, ফিল্ডসম্যান না রাখায় কিছু রান হত বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা মিস হিট্ হলেই আউট। এ হচ্ছে উচ্চাঙ্গের স্ট্র্যাটেজী।

মোট কথা, মাথা খাটিয়ে ক্যাপটেনসি করতে হবে, বোলিং চেঞ্জ, ফিল্ড সাজানো, ইত্যাদি—উইকেট এবং ব্যাটসম্যানের শক্তি ও দুর্বলতা লক্ষ্য করে। ফিল্ড সাজানোর ব্যাপারে যে ফিল্ডসম্যান যে পোজিশন-এ পারদর্শী, সেখানেই রাখতে হবে। অত্যধিক দৌড়োদৌড়ির সম্ভাবনা যেখানে নেই, সেখানে বোলারদের, এমন কী ফাস্ট বোলারদের ডীপ ফিল্ড-এ রাখাতেও আপত্তি নেই। জার্ডিনই প্রথম এই পথ দেখিয়েছিলেন ; ভারতের মাঠে নিকোল্‌স, ক্লার্ক ও ভেরিটী ডীপ ফাইন লেগে ফিল্ড করেছেন সে কথা অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে। তাঁর মতে, ফাস্ট বোলাররাও বল করার পর কাছে ফিল্ড করলে সেই ক্রাউচ বা নীচু হয়ে দাঁড়াতে হয়, সদাই তটস্থ, যার ফলে তাঁরা মানসিক বিশ্রাম মোটেই পান না। দূরে দাঁড়ালে কখন সখন দৌড়োতে হয় বটে, কিন্তু প্রতি বল ডেলিভারীর সময় টেনসন অপেক্ষাকৃত কম হয়। পরে ব্র্যাডম্যানকেও অনেক সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখেছি। কী ফাস্ট, কী স্লো—ক্লোস ফিল্ডে স্পেশ্যালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ ফিল্ডসম্যানের কথা আলাদা, যেমন কীথ মিলার, টোনি লক্ ইত্যাদি।

ক্যাপটেনের সমস্যা সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। প্রথম, টস্ জিতে কিংকর্তব্যম্—ব্যাটিং না ফিল্ডিং ? এ সিদ্ধান্তে প্রয়োজন টস্ করার পূর্বাহ্নে উইকেট সম্বন্ধে যথাসম্ভব সঠিক ধারণা। ডঃ ডব্লিউ জি গ্রেস বহু যুগ আগে বলে গিয়েছিলেন : ফার্স্ট ব্যাটিং ফর মী অলওয়েজ—তাৎপর্য টস জিতে সর্বদা ব্যাটিং করা অবশ্য কর্তব্য। এ উপদেশ সচরাচর আজও সঠিক—সনাতন সত্যর মতো ; টার্ফ-উইকেট সাধারণত প্রথমের দিকে ভাল থাকে, খেলা যত হয়—পিচ-এ হরদম বল পড়া, ব্যাটসম্যানের ফুট-ওয়ার্ক, বোলারেরর ফলো থ্রু ইত্যাদি ইত্যাদির ফলে। উইকেটের ক্রমশ অবনতি হয়। বল কখন বেশী লাফায়, কখন নিচু হয়, ব্রেক বেশী করে, এবং তাতে ব্যাটসম্যানের অসুবিধা বেশী। সুতরাং, সাধারণত, টস জিতে প্রথম ব্যাটিং নেওয়াই বিধেয়।

ম্যাটিং উইকেটে অবনতি হয় না, উন্নতিও হয় না—ভদ্রলোকের এক কথার মতো উইকেট একই রকম থাকে। আর আজকাল বহু টার্ফ উইকেট এমন ভাবে তৈরী হয় যে প্রথম দিনও যে রকম শেষ দিনও (টেস্ট খেলায় পঞ্চম বা

ষষ্ঠ দিন) মোটামুটি একই প্রকার ! এমন ক্ষেত্রেও, সাধারণত প্রথম ব্যাটিং নেওয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রথম ব্যাটিং করে চার পাঁচশ' রান স্কোর-বোর্ডে উঠলে, বিপক্ষ দলের ভেবে-চিন্তে ব্যাট করতে হয় ; ক্রিকেট খেলার কথা, দু' তিনটি উইকেট গোড়াগুড়ি বিশ-তিরিশ রানের মধ্যে পড়ে গেলে, সমূহ বিপদ ! এও সেই ক্রিকেটের সাইকলজী-র কথা ; পাঞ্জা লড়ালড়িতে কে আগে গ্রিপ করতে পারে সেইটাই বড় প্রশ্ন।

আবহাওয়া, বৃষ্টি, উইকেট প্রস্তুতির ত্রুটির জন্য অনেক সময় দৃঢ় ধারণা হয় যে প্রথম বোলিং ও ফিল্ডিং করলে বিপক্ষ দলকে অপেক্ষাকৃত কম রানে নামিয়ে দেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। এমন ক্ষেত্রে উইকেট শুধু বোলারের সহায়ক হলেই ফিল্ডিং নেওয়া সঙ্গত হবে না ; ক্যাপটেনকে প্রথমত দেখে নিতে হবে সেই উইকেটের সম্পূর্ণ সুযোগ নেবার মতো বোলার তাঁর দলে আছে, দ্বিতীয়ত সেই উইকেটের ক্রমশ উন্নতি হবে কী না ব্যাটসম্যানের পক্ষে। এই দু'বিষয়ে ক্যাপটেন যদি নিঃসন্দেহ হন তবেই ব্যাটিং না নিয়ে ফিল্ডিং নেওয়া সঙ্গত হবে।

দু'একটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য সরল করে বোঝাবার চেষ্টা করব। বম্বের ব্রোবোর্ণ স্টেডিয়াম উইকেট সচারচর প্রথম দিন গ্রীন থাকে, অর্থাৎ পিচ এ ঘাস, যথোপযুক্ত অনুকূল হাওয়া থাকলে সুইং ও সীম বোলার যথেষ্ট সাহায্য পান অন্তত প্রথম দিন লাঞ্চ-এর সময় পর্যন্ত ; পরে ক্রমশ ঘাস মরে যায়, উইকেট ব্যাটসম্যানের পক্ষে আরও ভাল হয়, বোলারের যা কিছু সম্ভাব্য সেটা থাকে প্রতিদিন সকালে তাও যদি রাত্রে উইকেট কভার করা না থাকে এবং উইকেট শিশির ভেজা হয়। সুতরাং আক্রমণাত্মক ক্যাপটেনের সুযোগ প্রথম দিনের উইকেটে বিপক্ষ দলকে অপেক্ষাকৃত কম রানে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু ক্যাপটেনকে দেখতে হবে তাঁর দলে এমন উঁচুদরের সুইং বা সীম বোলার শুধু নয়, স্লিপ এবং শর্ট লেগ ফিল্ডসম্যান আছেন কী না, যাঁদের সাহায্যে প্রথম দিন লাঞ্চ-এর আগে বিপক্ষ দলের মাত্র ২-৩টি নয়, ৫-৬টি উইকেট ফেলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ব্যাটিং-এর মাজা ভেঙ্গে দেওয়া নিশ্চিত, তবেই প্রথম ফিল্ডিং নেওয়ার ঝুঁকি নেওয়া সমর্থনযোগ্য। অন্যথায় নয়। ১৯৪৮ সালে ভারত—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট টস করার আগেই তদানীন্তন ভারতীয় ক্যাপটেন ঠিক এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অমরনাথের সাহসী মনোভাব, সতর্কবাণী সত্ত্বেও আলাপ-আলোচনায় আমার মনে হয়েছিল টস জিতলে তিনি ফিল্ডিং নিলেও নিতে

পারতেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গডার্ড টস জেতায় অমরনাথের সমস্যার সমাধান হল; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করেছিল, লাঞ্চ-এর আগে দু'তিনটি উইকেটও পড়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত যত দূর মনে পড়ে প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে ৬৩২ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ডিক্লেয়ার করেছিল।

অনেকের ধারণা বৃষ্টি হলেই উইকেট স্পিন বোলারদের সাহায্য করে। এটা মস্ত ভুল; উইকেটের সয়েল বা মাটি কী পরিমাণে ভিজে, বৃষ্টির পর প্রখর সূর্য কিরণ আছে কী না, এ-সব অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে কোন্ টাইপের বোলার উইকেট থেকে কতটা সাহায্য পাবেন। খুব বেশী ভিজে উইকেট হলে ব্যাটসম্যানের সাহায্যই হয়, বিশেষ করে ইংলণ্ডের উইকেটে। এমন ক্ষেত্রে বল পড়ার সঙ্গে উইকেট 'কেটে' ঘাসের চাবড়া নিয়ে বল যায়, স্লো বলের মাটিতে পড়ে গ্রিপ হয় না ব্রেকও করে না। এক্ষেত্রে যা কিছু আশা-ভরষা পেস বোলারদের এক-আধটা বল বেমক্কা লাফিয়ে বা নিচু হয়ে বিপদ ঘটাতে পারে। কিন্তু এমন উইকেট ব্যাটসম্যানেরই সহায়ক, উইকেট স্লো হওয়ার দরুন পুল ও হুক শট্ বিশেষ কাজে দেয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড-এ (ম্যানচেষ্টার) ইংলণ্ড-ইণ্ডিয়া টেস্টের কথা মনে পড়ে। স্বর্গত পতৌদির নবাব ঠিক উপরোক্ত ভিজে উইকেটে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন, খেলা দেরীতে সুরু হয়েছিল, সারা দিন সূর্যের মুখ দেখা গেল না, উইকেট রইল ইজি-পেসড। মাত্র চার ঘণ্টার কিছু কম ব্যাটিং করে ৪ উইকেটে ইংলণ্ড করল ২৩৫! এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা আজ করছি না, করেছিলাম পতৌদির ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দল মাঠে নামার আগেই। প্রখর সূর্যের তাপ হলে ঐ উইকেটেই হয়তো ভেলকীবাজী হত, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শক্ত মাটির উইকেটে। কিন্তু সে দিন ইংলণ্ডের আবহাওয়ার পূর্বাভাষে ঘোষণা ছিল ক্লাউডী অর্থাৎ মেঘলা। তাই আজকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাষে গুরুত্ব আরোপ করার এই রেওয়াজ—অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলায়।

অবশ্য এমন বহু পরিস্থিতি হয় যখন সব কিছু জেনেশুনেও ক্যাপটেনকে প্রথম ফিল্ডিং নিতে হয়। বিপক্ষ দলের থেকে তাঁর নিজের দল অনেক বেশী শক্তিশালী, বিশেষ অঘটন না হলে মাত্র সময়াভাবে জয়লাভে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা, সে ক্ষেত্রে প্রথম ফিল্ডিং নেওয়াই বিধেয়। অথবা টেস্ট সিরীজে পরিস্থিতি এমন, জয়লাভ করতে না পারলে সিরীজে হার অব্যর্থ, তখন এস্পার-

ওস্পার মনোভাব নিয়ে প্রথম ফিল্ডিং করলে সঙ্গতই হবে। কারণ, কখন ঠিক কোন সময়ে ডিক্লেয়ার করতে হবে সেটাও একটা বিরাট সমস্যা। উপরোক্ত ম্যানচেস্টারের ইংলণ্ড-ইণ্ডিয়া টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের ক্যাপটেন ওয়ালটার হ্যামণ্ড একটু বেশী দেরীতে ডিক্লেয়ার করার জন্য ভারত সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। ৯ উইকেটে হারিয়েও স্বর্গত হিণ্ডলেকার কোনও রকমে শেষ রক্ষা করেছিলেন। খেলা হয়েছিল ড্র।

জয়লাভের জন্য প্ল্যান করার কথা আগে বলছি—সেটা খালি বোলিং ও ফিল্ডিং-এ আক্রমণাত্মক মনোভাবে সম্ভব হবে না, ব্যাটিং-এর সুরু থেকেই সে কথা মনে রাখতে হবে। ভারতের ক্রিকেটে এটার বিশেষ অভাব। উচ্চাঙ্গের ক্রিকেটে ঘণ্টায় ৬০ রান না হলেও অন্তত ৫০ রান করা হবে লক্ষ্য, ক্রমশ যেটা বাড়াতে হবে বোলারদের ক্লান্তির বা অন্য সুযোগ নিয়ে। কারণ শেষ পর্যন্ত রানের ফলাফলে ক্রিকেট খেলার সিদ্ধান্ত হলেও, সময় অনেক সময় বাদ সাধে। সুতরাং ভাল উইকেটে ব্যাটিং-এর প্রথম সুযোগ পেলে রান যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে তুলতে হবে, যার ফলে বিপক্ষ দলকে দু'বার আউট করার সময় থাকে। এক দিনের খেলাতেও কথাটা মূলত একই যদি হারজিতের জন্য বিপক্ষ দলকে একবার আউট করতে হয়। এ ক্ষেত্রে এবং সর্ব ক্ষেত্রেই ডিক্লেয়ার করতে হবে দলগত স্বার্থ সবের উপরে রেখে, অন্য কোনও কারণে নয়—যেমন কাউকে সেঞ্চুরী করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদির জন্য নয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি নতুন বল নেওয়া সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রে ক্যাপটেনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন দিনের খেলা শেষের মাত্র ৩০-৪০ মিনিট বাকী আছে, তাঁর অধীনে নতুন বোলাররা ক্লান্ত তখন ক্যাপটেন কী করবেন? এমন ক্ষেত্রেও কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই যদিও পুঁথিগত নির্দেশ—পরের দিন সকালে নতুন বল নেওয়া যখন দলের ফাস্ট বা মিডিয়াম বোলাররা ফ্রেশ বা তাজা থাকবেন। কিন্তু হয়তো পাঁচটি উইকেট পড়ে গেছে, ব্যাটসম্যান দু'জন নতুন এবং সবে উইকেটে এসেছেন, ভাল খেলোয়াড় হলেও নতুন বলের বিরুদ্ধে কিন্তু তেমন রপ্ত নন। এমন অবস্থায় পুঁথিগত নির্দেশ সত্ত্বেও উচ্চাঙ্গের ক্যাপটেন বিনা দ্বিধায় নতুন বল নেবেন। ব্র্যাডম্যানকে একাধিকবার দিনের শেষে নতুন বল দিয়ে লিণ্ডওয়াল ও মিলারকে ব্যবহার করতে দেখেছি। এ-চালে তিনি সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছেন।

আক্রমণাত্মক ভাবাপন্ন ক্যাপটেন ব্র্যাডম্যান, কিন্তু ১৯৪৮ সালের ট্রেণ্ট-ব্রিজ

(নটিংহাম) টেস্টে কিন্তু দেখেছি, ইংলণ্ডের বোলার বেডসার ও লেকারের বিরুদ্ধে অন্তত সাময়িক ভাবে ডিফেনসিভ ফিল্ড সাজাতে। দু'জনেই মাত্র ভাল ব্যাটিং নয় মারের খেলা খেলছিলেন বলে। তাই আবার বলি ক্যাপটেনের পক্ষে বাঁধাধরা ছক কিছু নেই—সেটা হবে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

তবু স্থুরু থেকেই রান আটকানোর ফিল্ড, লেগে ৬, ৭ বা ৮ জন পর্যন্ত ফিল্ডসম্যান, যাকে লেগথিয়োরী বলা হয়, যেটা আজকে বহুল প্রচলিত হলেও একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই লেগথিয়োরী সম্পূর্ণ নির্জলা ডিফেনসিভ ব্যাটসম্যানের স্ট্রোক মারা প্রায় অসম্ভব (অফ সাইডে তো কথাই ওঠে না।)—এটা আর বেশী দিন চললে ক্রিকেট খেলার পক্ষে হবে সর্বনাশা। বোলিং-এর পরিচ্ছেদে না করে ক্যাপটেনসির পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছি একটি বিশেষ কারণে; দলের অধিনায়কই এই হানিকর লেগথিয়োরী অবসান করতে পারেন যদিও আইন করে এটা বন্ধ করবার চেষ্টা হচ্ছে।

কোন্ রোলার—হেভী, মিডিয়াম বা লাইট্—ব্যবহার কখন করতে হবে, বিশেষ করে বৃষ্টির পর, সে বিষয়ে ক্যাপটেনকে ওয়াকিবহাল হতে হবে, যেটা সম্ভব বহু অভিজ্ঞতার ফলে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের—বস্তুত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ক্যাপটেন এবং খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলার আইন কানুন এবং সেগুলির ব্যাখ্যা বেশ ভাল ভাবে অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করতে হবে। নাম করা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার-দের মধ্যে অনেকের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখে আশ্চর্য হয়েছি, যে কথা বলতে গেলে মহাভারত দাঁড়িয়ে যাবে! অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্য।

ক্যাপটেনকে দলে ডিসিপ্লিন অবশ্যই বজায় রাখতে হবে শুধু মাঠের ভিতর নয়, মাঠের বাইরেও। কেউ বা দলের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে, যেমন জার্ডিন ও ব্র্যাডম্যান; কেউ বা দলের একজন হয়ে ডিসিপ্লিন বজায় রাখেন, যেমন ওরেল এবং বেনো। তবে বেশী দূরত্ব বা অত্যাধিক অন্তরঙ্গতা কোনটাই ভাল নয়। ক্যাপটেনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণের কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে বিশেষ করে বলব দল নির্বাচনের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা, যেটা একান্ত প্রয়োজন। মাঠে তাঁর কড়া নজর রাখতে হবে, তাঁর নির্দেশ মতো ফিল্ডসম্যান যেন সঠিক জায়গায় থাকেন, সব সময় সব ফিল্ডসম্যান বোলার বল দেবার আগে যেন ক্যাপটেনের দিকে নজর রাখেন; অনেক সময় শেষ মুহূর্তে ক্যাপটেন কোনও ফিল্ডসম্যানকে হয়তো

একটু সরাতে চাইতে পারেন। খেলার গতি যেন অবাধে চলে, অকারণ দেরী না হয়, কী ফিল্ড প্লেসিং-এ, কী বা ব্যাটসম্যানের উইকেটে যেতে, ইত্যাদি বহু প্রকারে—যেটা ক্যাপটেনকে বিশেষ করে দেখতে হবে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বিনা প্রশ্নে তাঁর দলের খেলোয়াড়রা মেনে নেন সে বিষয়ে কড়া নজর রাখতে হবে।

মাঠের বাইরে সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারই বিধেয়। দলে কম বেশী অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অধিনায়ক হিসাবে পেটোয়া থাকলে এবং সেটা প্রকাশ্যভাবে দেখালে, সে দলে গাঙ্গন ধরবেই। মোট কথা, ক্যাপটেনকে নিজে ডিসিপ্লিন্‌ড বা নিয়মানুবর্তী হতে হবে, মনে রাখতে হবে মাঠে বা মাঠের বাইরে তাঁর উপর চোখ সদাই, এবং দলের সভ্যদের কাছে ডিসিপ্লিন আশা করতে হলে তাঁর নিজের আচার ব্যবহার যথাসম্ভব ত্রুটিহীন হতে হবে।

সবের বড় কথা, ক্যাপটেনের মনোভাব সদাই যথাসম্ভব আক্রমণাত্মক হতে হবে, জয়লাভই হবে তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু কোনও কারণেই যে পন্থা সামান্য অসৎ, তার কাছেও ঘেঁসবেন না—যেটাকে ইংরাজীতে বলা হয়; ইট্‌ উজন্‌ট ক্রিকেট।

উপসংহার

ক্রিকেট সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছি, কিন্তু তবু মনে হয় বলার অনেক কিছুই বাকী রয়ে গেল। ক্রিকেট খেলা মাত্র সায়েন্স নয়, আর্ট-ও বটে। বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা প্রণালী অনুযায়ী ঠিক একই বলে দুজন ব্যাটসম্যান একই স্ট্রোক মারলেন—ধরুন স্কোয়ার কাট্‌—দু'টি বলই বাউণ্ডারী হল, দুজনেই চার রান পেলেন, কম বেশী নয়। একজন ব্যাটসম্যান ভারতের প্রাক্তন ওপনিং ব্যাটসম্যান পাঞ্জাবী, রান হল বটে কিন্তু মন ভরল না; অন্যজন আব্বাস আলী বেগ, মারলেন সেই স্কোয়ার কাট্‌-ই, কিন্তু দর্শকের মনে জত্তেজনা, আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। শেষোক্ত স্ট্রোক সায়েন্স ছাড়িয়ে আর্ট এর পর্যায় পড়ে। তাই বোধ করি ক্রিকেট খেলার দৃষ্টিভঙ্গীর অন্ত নেই, ক্রিকেট সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে মাত্র কালি কলমে ব্যাখ্যা, সমীক্ষার শেষ নেই—শেষ কথা বলা এক প্রকার অসম্ভব।

তবু, উপসংহারে দু'চারটি কথা বলব, হয়তো বা ক্ষেত্র বিশেষে পুনরুক্তি।

কোচিং-এর প্রয়োজন আছে কিন্তু সে প্রয়োজন হবে সীমাবদ্ধ। যথার্থ শিক্ষক কোচিং-এর তরুণ ছাত্রদের মাত্র মূল, সনাতন, সময় পরীক্ষিত নীতি গুলিই বোঝাবেন। শিক্ষার্থীর ভুল ত্রুটি সংশোধন করে, ঠিক পথে চলার নির্দেশ দেবেন মাত্র ; শিক্ষার্থীর সহজাত প্রতিভায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাঁর নেই, সে চেষ্টাও যেন তিনি না করেন। এমনও দেখেছি, কিশোর শিক্ষার্থী, প্রতিভাবান, সহজাত প্রবৃত্তি বল সজোরে মারার, বল ব্লক করতে বিশেষ নারাজ ; কিন্তু কোচ্ বিরক্ত, কিশোরকে ধম্‌কে ফরোয়ার্ড-ডিফেনসিভ এবং ডেড্ ব্যাটে ব্যাক খেলবার জন্য জোর জবরদস্তি করছেন। এক কথায়, হয়তো এক অসামান্য প্রতিভা গলা টিপে হত্যা করছেন। জগতে এমন ব্যাকরণ সর্বস্ব কোচ্-এরই আধিক্য। কোচিং সম্বন্ধে মাত্র এইটুকুই বলব, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এর মর্ম বুঝতে পারলে, কোচিং-এর বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ থাকবে না, শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বে। গাধা পিটে ঘোড়া করা যায় না, কিন্তু জাত রেস্ হর্স-কে ক্রমাগত শৃঙ্খলিত করে খোপে বদ্ধ রাখলে, সেই সহজাত তেজী ঘোড়া ছ্যাকরাগাড়ীর ঘোড়ারও অধম হতে বাধ্য, এই সহজ কথাটি শিক্ষকদের অন্তত মনে রাখতে হবে।

ক্রিকেট খেলায় সাহসী মনোভাব এবং বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রয়োজন। বুদ্ধির খেলা বলেই, ৯টি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাটসম্যান আউট হতে পারেন, অর্থাৎ বোলার ৯টি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারেন। ব্যাট এবং বলে সংগ্রাম বলছে অনুক্ষণ, সামান্য ভুল, সামান্য ত্রুটির ফল মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে জয় পরাজয় গ্রহণ করতে হবে। এই ৯ রকম আউটের অনেক গুলিই বিশেষ করে নির্ভর করে আম্পায়ারের উপর, তা ছাড়া পিচ্ এবং মাঠ, আলো খেলার উপযুক্ত কী না, এমন অনেক কিছুরই আম্পায়ারদ্বয়ই দণ্ড মুণ্ডের বিধাতা। তাঁদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নেই।

বলা বাহুল্য, আম্পায়ারের গুরু দায়িত্ব ; ব্যাটসম্যানের জীবন মরণ কাঠি তাঁর তর্জনী হেলনে (অবশ্য অঙ্গুলি চালনা করতে হয় ঊর্ধ্বমুখী)। সাধারণত লেগ বিফোর উইকেট সিদ্ধান্তর ব্যাপারেই বিতর্ক হয় বেশী, লেগ সাইডে ক্যাচেও। দু'টি সিদ্ধান্ত করাই কঠিন, কিন্তু এমন আম্পায়ারও দেখেছি, যথা ফ্র্যাঙ্ক চেস্টার বা ডাই ডেভিস যাঁরা কচিৎ কদাচিত ভুল করতেন। সুদীর্ঘ কাল আম্পায়ারিং করার ফলে অভ্যস্ত চোখ, অসামান্য মানসিক

তৎপরতা, একটা উত্তেজনাহীন ধীর স্থির ভাব, নিরপেক্ষ মনোভাব, খেলার আইনের সবকিছু সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং শারীরিক ফিট্‌নেস্‌ ইত্যাদির সমষ্টীতে

আম্পায়ারের সিগন্যাল বা সংকেত প্রণালী
১। আউট ২। লেগ-বাই ৩। বাই ৪। ওয়াইড
৫। নো বল ৬। ওয়ান শর্ট ৭। বাউণ্ডারী-৪ ৮। বাউণ্ডারী-৬

এমন উচ্চাঙ্গের আম্পায়ার। তবু আম্পায়ার মানুষ, ভুলচুক হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ভুল রান আউট দেবার ফলে চেস্টার শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করেন তাও আমার চোখে দেখা।

কিন্তু চেস্টারের জুড়ী আম্পায়ার আমার চোখে পড়েনি, পডবে বলেও মনে হয় না। তিনি নিজে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন, যুদ্ধে একটি বাহু হারান, দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে এত উঁচুদরের আম্পায়ার হতে পেরেছিলেন। ইংলণ্ডের আম্পায়াররা যে জগতের শ্রেষ্ঠ আম্পায়ারদের মধ্যে গণ্য হন, তার কারণ তাঁরা বেশীর ভাগই প্রাক্তন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়, এবং ক্রিকেটের সময় চার-পাচ মাস ক্রমাগত সপ্তাহে ছ'দিন আম্পায়ারিং করেন। প্র্যাকটিশ মেক্‌স্‌ পারফেক্ট—অনবরত অভ্যাসের ফলে প্রায় ত্রুটিহীন হন। প্রসঙ্গত, ভারতে বিজয়সারথী আমার দেখা শ্রেষ্ঠ আম্পায়ার, ইংলণ্ডের আম্পায়ারদের মতো প্র্যাকটিশ পেলে সত্যই উচ্চাঙ্গের হতে পারতেন।

আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ভুল মনে হলেও ব্যাটসম্যানকে বিনা প্রতিবাদে তো বটেই, সহজ সরল ভাবে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসাই খেলোয়াড়ী মনো-ভাবের পরিচায়ক, সেটা তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে। লেগ বিফোর

উইকেট হবার পর অনেক ব্যাটসম্যানকে বলতে শুনেছি, বলটা নাকি অফ্-স্টাম্পের দু'তিন ইঞ্চি বাইরে ছিল ; এমন সূক্ষ্ম বিচার শক্তি যাঁর, তিনি দয়া
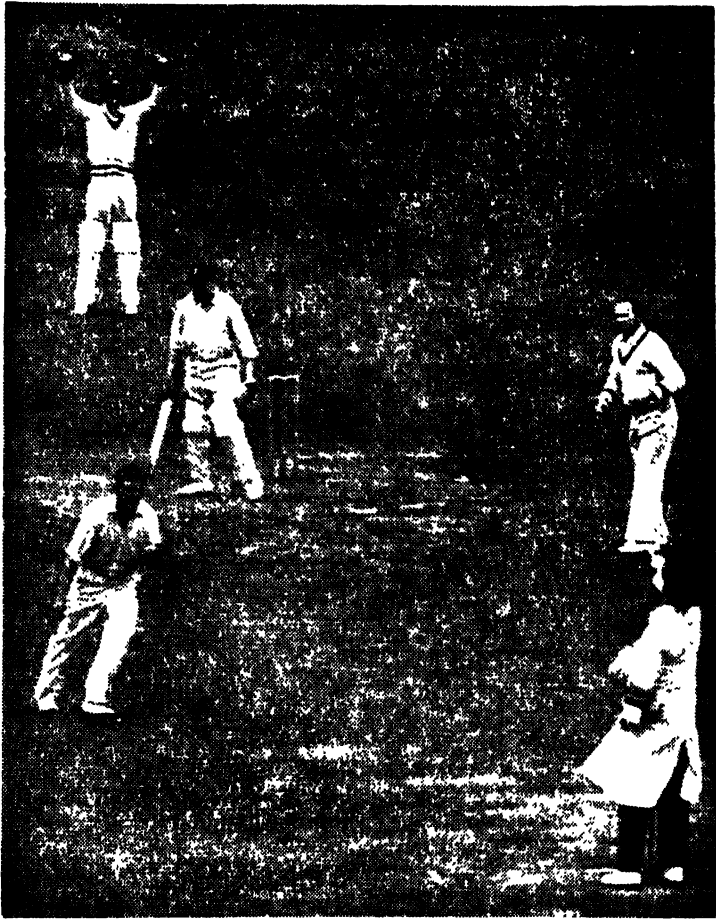
আম্পায়ার এল্ বি ডবল্যু-তে আউট ঘোষণা করলে, লিণ্ডওয়াল ঘুরে দাঁড়িয়ে আপীল করছেন। ওভাল্ মাঠে ১৯৩৪ সনে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা।

করে বলটা ব্যাটে খেললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত! আর, আম্পায়ার যদি সত্যই অক্ষম হন, তাঁর সম্পর্কে ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের কাছে দলের ক্যাপটেনের মতামত পেশ করার অধিকার তো রয়েছেই।

অবশ্য, সেটা পরের কথা ; কিন্তু ব্যাটসম্যানদের সব সময় মনে রাখতে হবে বহু ঘটনা যখন নিজের ধারণায় তাঁরা আউট হয়েছেন, তবু আম্পায়ার

আউট দেন নি। কয়েক বছর খেললেই বোঝা যায় ঐ 'আউট' আর 'নট আউট' শেষ পর্যন্ত কাটাকাটি হয়ে শোধ-বোধ হয়ে যায়। বোলারদের অনর্থক, বাজে আপীল করা, মাটি থেকে ক্যাচ ধরা হয়েছে জেনেও লাফালাফি করে আপীল ইত্যাদি এ-সব তরুণ শিক্ষার্থীদের একেবারে চিন্তার মধ্যেও আনা উচিত নয়, কারণ এ-সবই অখেলোয়াড়ী মনোভাবের চূড়ান্ত অসভ্য নিদর্শন। টেষ্ট ম্যাচেও এমন নগ্ন অসভ্যতা দেখেছি; আবার এমনও দেখেছি আপাতদৃষ্টিতে ওরেল ক্যাচ ধরেছেন, ব্যাটসম্যানও প্যাভিলিয়নের পথে, কিন্তু ওরেল মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন মাটি থেকে ক্যাচ ধরা হয়েছে। ওরেলের দৃষ্টান্তই অনুকরনীয়, আগেরটা নয়।

শিক্ষা পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করেছি; বলা বাহুল্য, শরীর চর্চা করতে হবে, ডাম্বেল ভেঁজে, ওয়েট্ লিফ্‌ট, করে নয়, সাধারণ ফ্রী হ্যাণ্ড একসারসাইজ, স্কিপিং, ওঠ বোস (যাতে কোমরে জোর বাড়ে) দৌড় ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে। শারীরিক ফিট্‌নেস্ না হলে কোনও খেলা সম্ভব নয়, ক্রিকেটও নয়।

ক্রিকেট খেলার বিষয়ে বই, ভারতীয় ক্রিকেটের নয়। তবু দু'চার কথা বলব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের স্থান সম্বন্ধে। আজ বহুবছর ভারতীয় ক্রিকেটের আমি যেন 'সেই পুরাতন ভৃত্য'—ভারতীয় দল যথা, আমিও তথা। ক্রিকেট জগতের প্রায় সর্বত্র অফিসিয়াল বা সরকারী টেস্ট সমীক্ষায় সেঞ্চুরী-র আমি আজ বেশ কাছাকাছি, তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয় টেস্ট। কিন্তু বলতে বাধা নেই টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের খেলা দেখে ক্বচিৎ কদাচিত আমার মন ভরেছে। খেলার ফলাফলের জন্য ততটা নয়, যতটা ভারতীয় ক্রিকেটের ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করে।

এই গ্রন্থের সূচনায় বলেছি যে এমন দিন ছিল যখন ভারতীয় ক্রিকেটের নামে সাড়া পড়ে যেত, তার শেষ নিদর্শন দেখেছি ১৯৪৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরের সময়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে সেই প্রথম ক্রিকেট খেলা, সেটাও অবশ্য একটি কারণ। তখনও আমরা টেস্ট হারতাম এখনও হারি, কিন্তু আমাদের খেলার ভঙ্গী, তার পিছনে আক্রমণাত্মক ভাবের জন্যই ভারতীয় ক্রিকেটকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। সি কে নাইডু, স্বর্গত অমর সিং, নিসার, ওয়াজীর আলী, জাহাঙ্গীর খাঁ, লাল সিং, বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী, অমরনাথ, ভিনু মানকাদ প্রমুখ অনেকেরই খেলা দেখে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট সমালোচক ও দর্শকের হত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আজ ক্রিকেট জগতের চোখে

আমরা ডাল্ ডগস—তাৎপর্য্য, আমাদের ক্রিকেট নিস্প্রাণ, নিস্তেজ, নিরস, নিরানন্দ।

কটু এবং অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্য। যুদ্ধ-পূর্বে আমাদের উইকেট ছিল স্পোর্টিং, ফাস্ট ও স্পিন বোলার তাই যথেষ্ট ছিল; ব্যাটসম্যানরা সাধারণত এ্যাগ্রেসিভ। তখন ভারতীয় ক্রিকেটের আদর্শ ছিলেন নাইডু, দেওধর, জয়, রামজী, অমরসিং, নিসার ইত্যাদি। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের উইকেট হল ডেড; আদর্শ হলেন বিজয় মার্চেন্ট, বিজয় হাজারে যাঁরা দু'তিনশ রান করতে নিতেন ৭—৮ থেকে ১০—১১ ঘণ্টা, ডেড উইকেটের দরুণ ফাস্ট বোলার হল উধাও, মিডিয়াম-পেস বোলারের হল আধিক্য, ভাল স্পিন বোলারের দেখা মিলল ক্বচিৎ কদাচিত।

নাইডুর যুগে আড়াইশ-তিনশ রান ভাল স্কোর বলেই ধায হত। রান ছিল মহার্ঘ, স্পোর্টিং উইকেট, সাধারণত বোলিং-এর 'ধারের' কারণে। মার্চেন্টের যুগে পাঁচ-ছ'শ রান যেন হাত-ধরা, রান সস্তা, আশ্চর্যের কিছু নয় (বিশেষ পশ্চিম ভারতের শান-এর মত উইকেটে)। মার্চেন্ট-হাজারের মতো ব্যাটসম্যান, যাঁদেব টেকনিক নিখুঁত, মারাত্মক ভুল না হলে আউট হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও, অপেক্ষাকৃত বিপজ্জনক স্ট্রোক, যেমন লেট-কাট বাদ দিলেন (নিজস্ব অন্তত ৫০-৬০ রান ও না হওয়া পর্যন্ত্য), অতি সাধারণ বোলিং-এর বিরুদ্ধেও ঘণ্টায় ৩০-৪০ রানও না—তবে ডবল সেঞ্চুরীর পর ডবল সেঞ্চুরী।

যে যুগের যা রীতি, মার্চেন্ট-হাজারে হলেন ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যানদের মডেল। শান-এর মত টার্ফ উইকেট বম্বে-পুণাতে ছিল সীমাবদ্ধ, ক্রমশ বিস্তার করল ভারতের সর্বত্র। কয়ের ম্যাটিং-এ প্রাণ ছিল, কয়ের বাতিল করে জুট ম্যাটিং-এর হল প্রবর্তন। জুট ম্যাটিং শান-এর মতো টার্ফ উইকেটের থেকেও নিস্প্রাণ, নির্জীব (বম্বে পুণার ৫০০-৬০০ রান ছাড়িয়ে ইন্দোরেব জুট ম্যাটিং-এ ৭০০-৮০০-৯০০ রান এক ইনিংসে যেন রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল)।

ব্যাপক ভাবে উইকেট সম্বন্ধে এই নীতি অবলম্বনে, একাধিক ভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রভূত ক্ষতি হল। উইকেটে আউট হবার আশঙ্কা নেই, বল টার্ণ বিশেষ করে না; সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ ব্যাটিংটেকনিক সত্বেও, বলের লাইনে কোন মতে ব্যাট চালালেই হল, বল ব্যাটে আসবেই, যার ফলে বহু অযোগ্য কিন্তু ধৈর্যশীল ব্যাটসম্যান বহু রান করতে সুরু করলেন, চারিদিকে বাহবা পড়ে গেল,

আপাতদৃষ্টিতে ভারতীয় ব্যাটিং-এর উন্নতি হল—যেটা একটা মস্ত ফ্যালাসি—ভুল ধারণা। কিন্তু আউট হবার ভয় না থাকলেও, উইকেট এমন নিষ্প্রাণ,

স্কোর বোর্ড—ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া—১৯৫৯

বল পড়ে এত মন্থর গতিতে আসে, যে সে বলে স্ট্রোকের মতো স্ট্রোক করা দুষ্কর। সকলের কিছু মার্চেণ্ট হাজারের মতো নিখুঁত টেকনিক নয়, সুতরাং এ যুগের ব্যাটসম্যান সাধারণত হলেন টেকনিক-বিহীন, স্ট্রোকবিহীন কিন্তু উইকেটের কৃপায় তাঁরা সেই ফ্যালাসি বজায় রাখলেন, প্রচুর রান করে!

এমন ব্যাটসম্যান যে ভিন্ন উইকেটে, ভিন্ন পরিবেশে থৈ পাবেন না, তার প্রমাণ পেতে দেরী হল না। উইকেটের নিস্তেজতার জন্য যথার্থ ফাস্ট বা স্পিন বোলিং-এ তরুণ ক্রিকেটাররা আর মাথা ঘামালেন না, উৎপন্ন হল সাধারণত একটা মিডিয়ামপেস্ বোলিং-এর গোষ্ঠী, যাঁরা একটুআধটু স্যুইং, একটুআধটু অফব্রেক করার পর লেগ স্টাম্প এ্যাটাক-এ মনোনিবেশ করলেন। ফাস্ট বোলার নেই, সুতরাং ফাস্ট বাম্পার নেই; কালে ভদ্রে যথার্থ ফাস্ট বোলার বা ফাস্ট বাম্পারের (যেমন হল, গিলক্রীস্ট, ট্রুম্যান ইত্যাদির) সম্মুখীন হতে হলে, সচরাচর ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা হলেন পঙ্গু। স্লো স্পিন বোলিং সম্বন্ধেও একই কথা। একই সময়ে ভারতের তিনজন স্পিন বোলার মানকাদ, গুলাম আমেদ এবং সুভাষ গুপ্তে—যাঁরা ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠর মধ্যে, তাঁরাও নিজের দেশ, ভারতের উইকেটে সাধারণত হলেন একান্ত অক্ষম; ভারতের ক্রিকেটের চূড়ান্ত ট্র্যাজেডী! শুধ্ তাঁদের দুর্ভাগ্য নয়, ভারতের ব্যাটসম্যানদেরও

কারণ তাঁরা খেলতেন স্পিনার নয় (ভারতীয় উইকেটের কৃপায়) বিলকুল সোজা বল !

১৯৪৮ সালে ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড টেস্ট, কীথ মিলার ও রে লিণ্ডওয়াল আমাকে বলেছিলেন যে পারতপক্ষে তাঁরা ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে খেলতে রাজী নন, যদি খেলতেই হয় ব্যাটসম্যান হিসাবে, বোলার হিসাবে কদাচ নয়। মিলার বলেছিলেন: হোয়াই, ফর অল আই নো, মার্চেণ্ট উইল হিট এ থাউস্যাণ্ড রানস অফ রে এ্যাণ্ড মী—অর্থাৎ ব্রেবোর্ণ উইকেটে মিলার, লিণ্ডওয়ালের বিরুদ্ধে মার্চেণ্ট এক হাজার রান করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই !

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর নিস্তেজ, নির্জীব উইকেট ভারতীয় ক্রিকেটের অবনতির মুখ্য কারণ, যার জের দুর্ভাগ্যবশত আজও টানা হচ্ছে। নিষ্ক্রিয় ব্যাটিং, উদ্দেশ্যহীন বোলিং, এবং ফিল্ডিং-এ উৎসাহের অভাবের উপর সাধারণত রয়েছে অধিনায়কদের চূড়ান্তভাবে আত্মরক্ষামূলক মনোভাব। সুরু থেকেই ব্যাটিং হয় ডিফেনসিভ, বোলিং, ফিল্ডিংও অনুরূপ। অধিকন্তু অধিনায়কদের কোনও প্ল্যান থাকে বলে মনে হয় না। অত্যধিক মন্থর গতিতে ব্যাটিং-এর কারণে জেতার খেলা হয় ড্র এবং ড্র-এর খেলায় হার এর বহু নিদর্শন দেওয়া যায় কিন্তু প্রয়োজন নেই। বোলিং এবং ফিল্ড সাজানোর ডিফেনসিভ মনোভাবের কথা নাই বললাম।

মোট কথা, নাইডু বা নাইডু-পূব যুগ-এর ভারতীয় ক্রিকেটের একটা যে জৌলুশ বা জাত ছিল, সে জাতও গেল, মার্চেণ্ট-যুগ-এর মার্চেণ্ট হাজারের নিরাপত্তার খেলায় আয়ও এই নতুন যুগের নতুন ব্যাটসম্যানরা করতে পারলেন না, সুতরাং পেটও ভরল না। ভারতীয় ক্রিকেট হল বিস্বাদ বিবর্ণ। অবশ্য কালে ভদ্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়। কিন্তু সেটা সিন্ধুতে বিন্দুসম।

অথচ আজকের ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের প্রায় সব গুণই আছে, নেই সাহসী, আক্রমণাত্মক মনোভাব। এঁদেরও প্রভূত উন্নতি হবে—এবং এঁদের পরের যুগের খেলোয়াড়দেরও যদি সারা ভারতে ব্যাপকভাবে স্পোর্টিং উইকেটের প্রবর্তন করা হয়। বড় খেলা আজ টাকার খেলা, স্পোর্টিং উইকেট চল হবে কী না সন্দেহ, অন্তত বড় খেলায়। কিন্তু মনের উপর অকারণ বাঁধন মুক্ত হওয়া না হওয়া মনের উপর নির্ভর করে। তাই, এই বইয়ের প্রতিছত্রে তরুণ শিক্ষার্থীদের বার বার বলেছি ব্যাটের জন্ম বল মারার জন্য, বলের জন্ম ব্যাট বা ব্যাটসম্যানকে হারাবার জন্য। কিন্তু আবার সেই কারিগরের কথা ওঠে,

তাঁর চিন্তাধারা, মনোভাবের কথা। শিব গড়বেন না বানর, ক্রিকেট সরল, রঙীন ও প্রাণবন্ত হবে না নীরস, প্রাণহীন ও বিবর্ণ, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে কারিগর বা খেলোয়াড়ের উপর। তাই একবার ভারতের তরুণদের এ বিষয়ে মাত্র নির্দেশ, উপদেশ দেবনা, জানাব আবেদন, জানাব মিনতি। কারণ, তাঁদের উপরই নির্ভর করেছে ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যত!

শেষ কথা বলে যদি কিছু থাকে—সেই শেষ কথা বলে এই গ্রন্থ শেষ করব। ক্রিকেট খেলার বহু গুণ, সবের বড় গুণ, বোধ করি, এ খেলা সৌহৃদ্যের প্রতীক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রিকেটের এই দাবির সম্পূর্ণ সমর্থন আমি অন্তত করব। দেশ-বিদেশে, ক্রিকেট জগতের প্রায় সর্বত্র বহুবার যাত্রা সুযোগ আমার হয়েছে, এবং এই ক্রিকেটের মাধ্যমেই, ক্রিকেটের সম্প্রীতির কারণে। যাযাবর আমি—আমারও বহু ঘরে ঠাঁই আছে, কী পোর্ট অব স্পেন, মেলবোর্ণ সিডনী, কী ম্যানচেস্টার কিংস্টন, কী বা জর্জটাউন লণ্ডনে। আদর অভ্যর্থনা পেয়েছি অপরিচিতের কাছে, পেয়েছি আন্তরিকতা, স্নেহ, ভালবাসা। দেশ থেকে বহুদূরে অপরিচিত পরিবেশে, অপরিচিত শয্যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে কবিগুরুর কয়েক ছত্র বার বার মনে এসেছে, বার বার চিন্তা করেছি—ক্রিকেটেরও মতোই ক্রিকেট যাযাবরের উদ্দেশ্যে কী সেই অমর বাণী?

> কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
> দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই॥